ওরা কাজ করে

শ্রীপৃথ্বীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রকাশক : শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়
দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ
৯৯এ তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা ৬

বৈশাখের প্রথম দিবস, ১৩৬৫

দাম পাঁচ টাকা

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
প্রভাত কর্ম্মকার
প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
মোহন প্রেস

মুদ্রাকর :
শ্রীগৌরচন্দ্র পাল
নিউ শ্রীদুর্গা প্রেস
২।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

ব্লক :
সিটি আর্ট প্রডাকশন

বাইণ্ডার :
ফ্রেণ্ডস বাইণ্ডিং কনসার্ন

এই লেখকের লেখা :

সাহিত্যিক
মরা-নদী
বিবস্ত্র মানব
নিরুদ্দেশ
পতিতা ধরিত্রী
দেহ ও দেহাতীত
পৃথিবীর প্রেম
শিল্পী
যৌবনের অভিশাপ
পতঙ্গ
কারটুন
সোনার পুতুল
স্বনির্ব্বাচিত

উদ্ধত বিজ্ঞানযুগে শহর-শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠ্‌ছে তরতর করে। সিমেণ্ট-পীচে তৈরী হচ্ছে শহর, ঝরঝরে তকৃতকে—যেখানে ধরণীর ধূলিকণার লেশমাত্র নেই। সেখানে বাস করে সভ্যমানুষ—আরামে, আনন্দে, বিলাস-ব্যসনে দিন কাটায়। পায়ে লাগে না ধুলো, গায়ে লাগে না ঝড়-বৃষ্টি রোদ। ওরা সভ্য—

আর একদল লোক বাস করে পাহাড়ে, গ্রামে—ধুলোকাদা মাখে, ঝড়-বৃষ্টি-রোদে ওরা কাজ করে নগরে-প্রান্তরে। ওরা অসভ্য কুলি-মজুর—

আমি ওদের দেখেছি নিকট থেকে, দূর থেকে—নিবিড় ভাবে। অদম্য জীবনী-শক্তি নিয়ে ওরা ভোগ করে জীবন,—তাতে জীবন-মৃত্যুর মাঝে সংকোচ সন্দেহ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে না।

তুলাদণ্ডে ওদের বিচার করেছি মনে মনে—প্রশ্ন জেগেছে মনে,—জীবন-মৃত্যুকে কারা জয় করেছে? কোন দিকটা ভারি হ'য়ে ঝুলে পড়েছে?

অন্তরের এই প্রশ্নকেই তুলে দিচ্ছি আপনাদের হাতে—

—গ্রন্থকার—

ভালকুড়ি পাহাড়ের পাদদেশে ছোট্ট গ্রাম ঘোড়ামারা।

ছবির মত গ্রামখানি,—ভালকুড়ি পাহাড়ের উপরে উঠে ঘোড়ামারাকে দেখলে সে-কথা বোঝা যায়। ছোট ছোট দেশলাইয়ের বাক্সের মত ক'খানা বাড়ী,—পলাশ, শাল, বহড়া, পিয়াল গাছের ফাঁকে ফাঁকে। মাঝে মাঝে দু'একখানা লাল টালির ঘর, সবুজের বনে পলাশ ফুলের মত, বা নীল আকাশে লাল তারার মত ফুটে আছে। পাহাড়ের ঘন জঙ্গলের পরে, বনটা একটু পাতলা হ'য়ে গেছে,—তার পরেই গ্রাম। পিছনে একটা কান্দোড়।

সকালে পাখী ডাকে, দ্বিপ্রহরে তিতির, ঘুঘু বনের ফাঁকে ফাঁকে খাবার খুঁজে বেড়ায়, সন্ধ্যায় গাছের অন্তরালে বসে দিবাবসান ঘোষণা করে। পাহাড় থেকে বেরিয়ে একটা পায়ে চলা পথ চলে গেছে গ্রামে, তার পাশে শেয়াকুলের কাঁটা; ছোট ছোট পলাশ গাছ। পথটা পাহাড় ঘুরে গ্রামান্তরে গেছে—তার থেকে দূরে, বহু দূরে—বর্ষায় কান্দোড় পেরোতে এক বুক জল ভাঙতে হয়।

এ গ্রামে বাস করে ওরা—"ওরা কাজ করে নগরে প্রান্তরে"।

বাগদী, বাউরী, ধাঙড়, কুর্ম্মী—অস্পৃশ্য তারা। প্রকৃতির ছেলেমেয়ে,—সমাজবন্ধন শিথিল, সভ্যতার আভিজাত্য নেই, উন্মুক্ত উলঙ্গ উদার তাদের জীবন। পাহাড় গাছ, কালো-পাথর, ধুলাবালি, মাটি ধান, চাষ-আবাদ নিয়ে তাদের জীবন। সভ্যতার আলো সেখানে প্রবেশ করেনি,—সমুদ্রের উপরি-ভাগের মত আলো-বাতাসে আলোড়ন ওঠেনি,—গভীর সমুদ্রের নীচে চিরন্তন অন্ধকারের দেশে তারা বাস করে সরীসৃপের মত,—উদ্দাম উন্মত্ত তাদের জীবন। জীবন-মৃত্যু তাদের পায়ের ভৃত্য,—আত্মীয় মরলে তারা কাজ করতে করতেই কাঁদে, নতুন মানুষ জন্মালে রাত্রের অন্ধকারে মদ ও মাদল নিয়ে মাতামাতি করে। প্রকৃতির সঙ্গে তাদের নাড়ীর টান,—চার দেয়ালে ঘেরা তাদের জীবন নয়,—শীতের তিন মাস তারা গৃহের ভিতর শোয়, নয় মাস উন্মুক্ত আকাশের নীচে—চাঁদের আলোয়, অন্ধকারে। বৃষ্টির দিনে থাকে দাওয়ায়—

সাবিত্রী বাউরিণী—তথা সাবির বাড়ী এই ঘোড়ামারায়—

অশ্রুময় তার জীবন-কাহিনী,—তার পতন ও উত্থানের ইতিহাস।

মিশ্‌কালো তার দেহের রং, যৌবনের উচ্ছল জোয়ারে দেহ কানায় কানায় ভরে উঠেছে। লিকলিকে দেহের গড়ন—ক্ষীণ কটি, বিপুল নিতম্ব, সুউন্নত উরস: মনে হয় কোন নিপুণ ভাস্কর কালো পাথরের উপরে বাটালী দিয়ে যৌবনের রূপ রূপায়িত করেছে। মুখখানি হয়ত গঠন-পারিপাট্যে সুন্দর নয়; কিন্তু কালো মুখের মাঝে সকরুণ সুন্দর দুটি চোখ, আর শুভ্র শক্তিমান দাঁত—সর্ব্বোপরি স্বাস্থ্য ও উষ্ণ যৌবনের একটা স্বাভাবিক লালিত্য মুখখানিকে সুন্দর করে তুলেছে। সাবি সুন্দরী, বর্ণে আর প্রসাধনে সে-সৌন্দর্য্যকে পালিশ করার প্রয়োজন হয় না। কৃত্রিম প্রাচীর-পরিবেষ্টিত শহরের ঘরে কুব্জ মেরুদণ্ড, রক্তহীনতায় শুভ্রাঙ্গী, ভয়েলাবৃত, স্নো-পাউডারে পালিশ-করা দেহে সে সৌন্দর্য্য মেলে না।

শহরে না হোক্, মহুয়া-শাল-পিয়াল-ঘেরা পাহাড়ের পাদদেশে এই ঘোড়ামারা গ্রামে বাগদী-বাউরী-ধাঙড়-কুর্ম্মীদের, চাষী-মুজুরের গ্রামে সে সুন্দরী। হাঁটু পর্য্যন্ত ঠেঙো মোটা কাপড় পরে সে ধান পোঁতে, স্বল্পবস্ত্রাবৃত উন্নত বুক ফুলিয়ে পাহাড় হ'তে দেড়মণ কাঠের বোঝা মাথায় করে অক্লেশে

দ্রুতগতিতে নেমে আসে। মুজুর খাটতে গিয়ে বাবুদের ছাদ পিটতে পিটতে, না হয় ইঁট বইতে বইতে গান করে। সারাদিন কাজ করে—সন্ধ্যায় আরো দু'জনের সঙ্গে দু'ক্রোশ দূরে গ্রামান্তর থেকে রাত্রিতে বাড়ী ফেরে। পাহাড়ের উপরে যখন বাঘ ডাকে তখন তারা দূরের রাস্তা দিয়ে গান করতে করতে বাড়ীতে আসে। প্রায় বারমাসই সে কামিন খাটে। উজ্জ্বল দেহ, পরিশ্রমে সুডৌল সুন্দর, নির্ভয় নিরঙ্কুশ তার জীবন।

সন্ধ্যার পরে কখনও কখনও গান ও নাচের আসর বসে. পচুই মদ খেয়ে ... পুরুষের মাদলের তালে তালে নাচে, মাতাল হ'য়ে হাসে, গড়াগড়ি দেয় পৃথিবীর ধুলাময় বুকে। শীতগ্রীষ্মে তার একই বস্ত্র, ন'হাতি লাল পেড়ে শাড়ী। শীতে আগুন জ্বালিয়ে ঘরের মাঝে পুরাতন কাপড়ে সেলাই-করা মোটা কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকে,—ভোরে উঠে কাজ করতে যায়। গ্রীষ্মে বাহিরে চার-পাইয়ে বিনা বিছানায় মুক্ত আকাশের নীচে ঘুমোয়। গরু চরায়, ঘুঁটে সংগ্রহ করে। ক্ষেতে সার দেয়, খেজুরের পাতা দিয়ে 'তালাই' বুনে গ্রামান্তরে বিক্রি করে। নেহাত যখন কিছুই থাকে না, তখন পাহাড় থেকে শালপাতা এনে, শালপাতা গেঁথে হাটে বিক্রি করে। একহাজার পাতা প্রায় দু'টাকায় বিক্রি হয়। কখনও বা পাহাড়ের বহড়া হরিতকী আমলকী সংগ্রহ করে হাটে নিয়ে যায়, তাতেও নুন-তেলের দাম হয়।

এমনি করে প্রকৃতির কোলে ধুলো-কাদা মেখে, শীতগ্রীষ্মে দেহকে মজবুত করে সে আঠার বছরে পা দিয়েছে। প্রয়োজন তাদের সামান্য—বছরে দু'খানি কাপড়, নুন তেল আর পেট-ভর্ত্তি ভাত—সামান্য পঁচুই,—উৎসবে ব্যসনে।

ভাগ্যটা সাবির ভাল নয়।

নয়-দশবৎসর বয়সে গ্রামান্তরে তার বিয়ে হয়েছিল, স্বামীর ঘরও সে করেছিল কিছুদিন বালিকা-বয়সে। স্বামী কোন কোলিয়ারীতে মুজুর হ'য়ে গিয়েছিল—আর ফেরেনি। এদিকে তার বাবাও জ্বরে ভুগে মারা যায়। ...র এক বুড়ী মা, কাজেই তাকে গ্রামে ফিরে এসে উভয়ের ভরণপোষণের ভার নিতে হ'ল। দু'বিঘে জমি তাদের আছে; অন্যকে দিয়ে সে চাষ করায়, নিজেই ধান পোঁতে, নেড়ায়, কাটে। বাকীটা কামিন খেটে রোজগার করে। সাবি জানেনা সে সধবা না বিধবা; তবে এ-কথা সে জানে যে, সে যৌবনে পা দিয়েছে—সে যুবতী। এ কথা গ্রামের যুবকরা প্রতিনিয়তই বুঝিয়ে দেয়—

এই-ই সাবির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

শীতের শেষ, ফাল্গুনের হাওয়ায় বন-মন সচকিত হ'য়ে উঠেছে। পাহাড়ের কোলে কোলে পলাশ গাছে আগুন রঙের ফুল ফুটেছে—মনেও আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে। দুপুরের হাওয়া উষ্ণ, দেহকে পুড়িয়ে দেয়। ঊষর প্রান্তর আর উত্তপ্ত পাষাণের উপর দিয়ে বয়ে এসে, হাওয়া উষ্ণতর হ'য়ে ওঠে। কিন্তু সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়ায় গায়ের মাঝে শিরশির করে। ভোরের দিকে শীতে সঙ্কুচিত হ' য়ে বস্ত্রাঞ্চল মুড়ি দিতে হয়।

ধানকাটা, ঝাড়া—শেষ, এখন কোন কাজই নেই।

সেদিন সকালে সাবির মা বললো,—হাঁরে সাবি, শালপাতা লিয়ে আয় কেনে, কাজত কিছু নেই রে। হাজার দু'টাকা বিকোচ্ছে হাটে—

সাবি দুঃখের সঙ্গে বললো,—বনটা ত কোন ছোটনোক সরকার বাবু লিয়ে লিয়েছে। বনে সব গাড বাবু এয়েছে, কাঠ লিতে দেয় না, পাতা ভাঙতে দেয় না—

—এতবড় বনটা গাডবাবু দেখছে কিনা? এ-ধারকে যাবি ওধারকে বেরুবি, কোন গাডবাবু ধরবেক। ছ-পুরুষ বনের পাতা ভাঙছি, শালপাতা করতে লেগেছি, এখুন আবার কোথা থেকে গাডবাবু এসেছে—পাতা ভাঙবে না বললেই হ'ল বটে!

যুক্তিটা সাবির মনে ধরেছিল। এতবড় বনে মাত্র দু'জন গার্ডবাবু পাতা ভাঙা বন্ধ করবে! নিরলস দ্বিপ্রহরে একবোঝা পাতা আনতে পারলে জোছনা-রাতে উঠানে বসে পাতা তৈরী করা যায়। কুঁচিকাঠি ঘরে তোলাই আছে। মা ও মেয়ে তিনদিনেই হাজার পাতা তৈরী করে রেখে দিতে পারবে, সামনের হাটে পাতা বিক্রি করে দু'টাকা হবে।

বেলা প্রহরেক পরে পান্তাভাত খেয়ে একটা কাটারা ও জালঘেরা একটা ঝাঁকা নিয়ে সাবি শালপাতা আনতে বেরিয়ে পড়ল। দুপুরের গরমে গার্ডবাবুরা প্রায়ই থাকে না, অতএব সেইটাই প্রকৃষ্ট অবসর। সাবি চুপড়ি মাথায় ও কাটারী হাতে যাচ্ছিল। পাহাড়ের পাদদেশে শেয়াকুলের কাঁটার ঝোপ,—মাঝে মাঝে দু'একটা বড় পলাশ ও মহুয়ার গাছ, আর সবই ছোট ছোট পলাশের ঝোপ,—তার মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা। সেই ফাঁকা জায়গাটা দিয়েই পায়ে চলা পথ—সরু, অস্পষ্ট। সাবি আনমনে যাচ্ছিল, কে যেন ডাকলে,—সাবি, কোথাকে চলেছিস্?

সাবি ফিরে দেখে সাধু বাউরী। গরুগুলিকে তৃণহীণ ডাঙায় ছেড়ে দিয়ে পলাশের ছায়ায় বসে 'চুটি' খাচ্ছে। কাটারী দিয়ে গাছের শুকনো ডাল কেটে জড়ো করেছে। সে পুনরায় প্রশ্ন করলো,—কোথাকে চলেছিস্, সাবি?

—উই বনকে যাবেক, পাতা ভাঙ্গবেক—

—হোথা যাস্নি, গাডবাবু রোঁদে বাইরেছে রে—

সাধু বছর বাইশের যুবক,—জোয়ান মরদ। সাবি তার দিকে ফিরে বললো,—গাডবাবু কি করবেক? এতেবড় বনটি, এক গাডবাবু কেমনে সামলাবেক্, বল্-না—

—তুকে ধরে লিয়ে যাবেক।— সাধু একগাল হেসে পরিহাস করলো।

—হাঁ বটে! ধরে লিয়ে যাবেক,—বাপ-পিতেমোর কাল থেকে পাতা ভাঙ্গছি। তা কে ঠেকাবে? সরকার বাবু, না কে গাড বসিয়েছে, গরীব মানুষ করে খাবেনি? কি খাবেক?

—উ সব শুনবে নি; তু আয় হেথা। গান করি, তু লাচবি—

সাধু পথে ঘাটে মাঝে মাঝে এমনি পরিহাস করে, আহ্বান করে। কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল তার। ভাল মাদল বাজায়, বাঁশীও বেশ বাজাতে পারে। জোয়ান সে, সাবিকে কতদিন কত কথা বলে—কিন্তু সাবি তাকে প্রশ্রয় দেয়নি। সে বললো,—ই, তু বস্ কেনে। এক বোঝা পাতা লিয়ে আসি।

—ও বাবা! সে ত তিন লহর রে?

সাধু হাসলো, সাবিও হেসে উঠলো, তার পর সে ধীরে ধীরে পাহাড়ের পাদদেশের জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলো। পাহাড়ে উঠবার রাস্তা সংকীর্ণ, পাথরের উপর দিয়ে পায়ে চলা পথ এঁকে-বেঁকে গাছপাথর ঘুরে ঘুরে উপরে উঠেছে। পাহাড়ের গায়ে ঘনসন্নিবিষ্ট শালগাছ, মাঝে মাঝে আমলকী, পলাশ, হরিতকী, বহড়া। তার ফাঁকে ফাঁকে শেয়াকুল-বাবলার কাঁটা গাছ—কাটারী দিয়ে কেটে পথ করে নিতে হয়—পাহাড়ের কঠিন বুকেও কাঁটাগাছের বৃদ্ধি যথেষ্ট। দু'দিন পথে মানুষ না গেলেই তারা হাত বাড়িয়ে পথ বন্ধ করে দেয়।

সাবি পাহাড়ের কিছুটা একদমে উঠে গেল, পথে একটা শেয়াকুলের কাঁটা তার আঁচল টেনে ধরে উন্নত বুকখানিকে বিবস্ত্র করে দিল। সে ফিক্ করে একটু হাসলো, কেন তা সেই জানে। তারপর কাটারীর এক কোপে ডালটা কেটে ফেলে বললে,—বেইজ্জত করতে লেগেছে, আঁটকুড়ো—

তারপরে নির্জ্জন বনের মাঝে অত্যন্ত ধীরে সুস্থে কাপড়খানা ভাল করে প'রে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিল, যাতে দ্বিতীয়বার কাঁটা লেগে কাপড় না

ছিঁড়তে পারে। কাপড় অবশ্য ছেঁড়েনি, হাত-পা ছড়লে তার দুঃখ নেই, সেটা সেরে যাবে; কিন্তু কাপড় ছিঁড়লে বড় কষ্ট, কাপড়ের দাম অনেক—

সে এদিক ওদিক তাকিয়ে পাহাড়ের মাঝে একটা সমতল জায়গায় অনেকগুলো কচি আহরণ-যোগ্য শালপাতা দেখে সেদিকে গেল, কাটারী দিয়ে পথ করে নিয়ে। সামনের পাতা কি অন্য সকলের জন্যে পাবার উপায় আছে! লাল পাতার নীচে সবুজ ডাঁটো পাতা, সেইটেই ভাল,—পাতা ভাল হয়, জুড়তেও সুবিধে।

সে চুপড়ীটা রেখে পাতা ভাঙতে আরম্ভ করলো। চুপড়ী ভর্ত্তি হল, তার পর ঝাপের দড়িটাও পাতার চাপে ক্রমশঃ ফেঁপে উঠতে আরম্ভ করলো। শালগাছের ছায়ায় পরিশ্রম গুরুতর হওয়ার কথা নয়, তবুও সাবির মুখে কপালে ঘামের নোলক ঝুলছে।

চুপড়ী জাল পাতা দিয়ে ভরতে বেলা পড়ে গিয়েছে, বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর। কাঁচা পাতার ভারে চুপড়ীর ওজন প্রায় মণে দাঁড়িয়েছে। সাবি হাঁটু দিয়ে পাতায় চাপ দিয়ে জালের মুখের দড়িতে জোর টান দিয়ে বাঁধলো। পাতাগুলি সঙ্কুচিত হয়ে জালের মাঝে স্বল্পায়তনে দাঁড়ালো। কাটারীটা পিঠের দিকে কোমরে গুঁজে চুপড়ীটা একাই মাথায় তুলতে চেষ্টা করলো— তুলতে সে পারবে, তবে কষ্ট হবে। একটা শালগাছের কাণ্ডে ঝাঁকাটা লাগিয়ে মাথায় তুলতে যাবে—হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন বললো,—কে রে? তুই কে?

সাবি চেয়ে দেখে ফরেস্ট-গার্ড। সে বোঝাটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো। গার্ড গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলো,—তোর নাম কি?

—সাবি—

—তোরা কি?

—বাউরী।

বাউরী! বাউরী শুনে গার্ডসায়েব হয়ত একটু উৎসাহিত হ'য়ে থাকবেন। কিংবদন্তী হিসাবে বাউরী জাতির নীতিজ্ঞানহীনতার কথা তিনি হয়ত শুনে থাকবেন। তিনি সদম্ভে বললেন,—সরকারী বন থেকে পাতা ভাঙলি কেন?

—পাতা লুব, তা কি হইছেন। গাছ ত কাটি নাই—

—পাতা, কাঠ, গাছ কিছু ভাঙতে পাবিনে। ঢোল-সহরতে সব জানানো হয়েছে। চল, তোকে আফিসে যেতে হবে সায়েবের কাছে।

সাবি ভীত হয়েছিল, তবে তার সরল বিশ্বাস ছিল বাপ-পিতামহের আমল থেকে বনে তাদের যে আইনগত অধিকার আছে তা কোনমতেই লুপ্ত হতে

পারে না। সে নির্ভীকভাবে বললে,—যাবেক কেনে? বরাবর ভাঙছি, শালপাতা বিক্রি কচ্ছি। কোন সরকার বাবু বাগান লিয়েছে—ছোটনোক বটে?

—কাকে ছোটলোক বলছিস্?

—তুর বাবু ছোটনোক বটে। পাতা ভাঙবে তার আবার বারণ কি? গরীব নোক খাবে কি করে?

—ওসব শুনছিনে, চল থানায় যেতে হবে।

—কেনে যাবেক? যা, আসবুনি আর তোর ছোটনোক বাবুর বনকে—

সাবি পাতার বোঝা পুনরায় তুলতে যাচ্ছিল, গার্ডবাবু পা দিয়ে পাতার ঝাঁকাটা চেপে ধরে বললে,—কোথায় যাবি? তোকে থানায় যেতে হবে।

—মোর গাঁকে যাবেক, থানায় যাবেক কেনে?

—তবে পাতার দাম দে,—দে একটাকা।

—দাম?—সাবি হি-হি করে হেসে বললে,—টাকা লিয়ে পাতা ভাঙতে এসেছি বটি?

গার্ডবাবু এতক্ষণ সাবির তীক্ষ্ণ, তন্বী, যৌবনোচ্ছল দেহের পানে অত্যন্ত লুব্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন—দৃষ্টি ভোগ করছিলেন। চারিদিকে নিবিড় বন, কোথায়ও কেহ নাই—অনন্ত নিঃশব্দতা পাহাড়ের বুকে অন্ধকারের মত বাসা বেঁধেছে। শালগাছের তলায় স্বল্পান্ধকার,—গার্ডবাবুর সাম্‌নে সাবি দাঁড়িয়ে আছে, তার লীলাচঞ্চল দেহ নিয়ে তন্দ্রাগত বনের মাঝে।

পাদদেশে পলাশের ফুল ফাগুনের রঙীন হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। দ্বিপ্রহরের গরম হাওয়া হঠাৎ যেন ঠাণ্ডা আমেজ এনেছে শালগাছের ছায়ায়। চারিপাশে নিবিড় বন। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে শালের কোঁড়া বেরিয়েছে। এই নিঃশব্দ নিবিড় নির্জ্জনতার মাঝে, শাল-পলাশের ছায়ায়—স্বল্পান্ধকারে সাবি দাঁড়িয়ে আছে তার উত্তপ্ত উষ্ণ যৌবনশ্রী নিয়ে, স্বল্পাবৃত দেহখানা যেন বিপুল বেগে একটা আকর্ষণে গার্ডবাবুর দেহরক্তকে আত্মহারা করে দিল। কোথায়ও কেহ নাই,—দূরে দেখা যায় ঘোড়ামারার ছোট ছোট কুঁড়েঘর। পাহাড়ের উপর থেকে সেগুলো পুতুলের খেলাঘরের মত মনে হয়।

গার্ডবাবু আর একটু এগিয়ে এসে ডাকলেন,—সাবি, কি দিবি বল, নইলে থানায় নিয়ে যাবো। সাবি হি-হি করে হেসে বললে,—থানায় যেচ্ছে কে? কে লিয়ে যাবে বটে?

—কেন? আমি নিয়ে যাবো—

সাবি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে,—হ, তু লিয়ে যাবি—লিলেই যাচ্ছি,—

সাবি তার শালপাতা-বোঝাই ঝাঁকাটা তুলতে যাচ্ছিল, গার্ডবাবু হঠাৎ তার হাতখানি ধরে ফেলে বললেন,—শোন সাবি, আমার কথা যদি শুনিস্ তবে কিছু বলবো না, রোজ পাতা ভাঙবি, কাঠ নিয়ে যাবি—

এই নির্জ্জনতায়, পাহাড়ের বুকের উপর গার্ডবাবুর কথা সে স্পষ্টই বুঝেছিল, কিন্তু তবুও সে একটু হেসে বললে,—তুর কি কথা ? টাকা লিয়ে পাতা ভাঙ্গছি বটে—

—টাকা নয়, টাকা নয়,—শোন—

সাবি একটা ঝটকা টানে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সরে দাঁড়ালো। একটু হেসে বললে,—ইঃ, মরদ তু বটে! মেয়েছেলে একা পেয়ে তু কি বলছিস্ ?

গার্ডবাবুর বুকের রক্ত চঞ্চল হ'য়ে নাচতে শুরু করেছে,—তিনি আত্মহারা হ'য়ে আর একটু এগিয়ে গিয়ে মিনতির সুরে ডাকলেন,—সাবি শোন—

—কি শুনবেক ?— সাবি কোমরের পিছন থেকে কাটারীখানা টেনে তুলে হাতে নিয়ে বললে,—হাত ধরবি ত কাটারী দিয়ে চুটিয়ে দেব। হ, বনের গাডবাবু হইছে—

গার্ডবাবু বললেন,—আমার কথা শোন, নইলে পুলিশ দিয়ে তোকে চালান করে দেব সদরে।

সাবি একটু পিছিয়ে এসে বললে,—বলছি ত আর আসবেক নাই। তুর বাবুর বনকে আর আসবেক নাই।— সাবির ধারণা জমিদার-পরিবর্ত্তন হওয়ায় নতুন জমিদার এই আইন প্রবর্ত্তন করেছেন। সরকার যে বন-সংরক্ষণ দ্বারা দেশের মাটি রক্ষা করছেন, এত সংবাদ সে জানে না।

—আজ এলি কেন ?

—কে জানছে, তুর পাতার দাম এত বটে!

গার্ডবাবু দুই-এক পা এগিয়ে এসে বললেন,—তবে চল থানায়—

সাবি তার কাটারী উদ্যত করে বলল,—মু ভদ্দর নোকের বেটি বটে, যে ভয়ে আছাড় খাবেক—কাটারী দিয়ে মুণ্ডু চুটিয়ে দেবেক—

উদ্যত কাটারী দেখে গার্ড একটু ভীতভাবে মিনতির সুরে যা নিবেদন করলো তা না-হয় উহ্যই থাক্। শেষের দিকে এসে বললে,—আমার কথা শোন, তোর ভাল হবে। পাতা ভাঙবি, কাঠ নিবি—টাকা দেব—

সাবি কোন কথা না বলে পাতার বোঝাটা এক ঝাঁকিতে মাথায় তুলে নিল। সে পাহাড় থেকে নামবার পথের দিকে এগুতে, গার্ডবাবু পথরোধ

করলেন। পাশে পথ নেই, কাঁটার জঙ্গল। সাবি ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত হিংস্র ভাবে একবার চেয়ে বললে,—তু পথ ছাড়—

গার্ডবাবু তথাপি শেষবারের মত আবেদন করছিলেন, সাবি রণরঙ্গিণীর মত দু'পা এগিয়ে এসে বললে,—তু পথ ছাড়। এক লাথিতে পাহাড়ের তলাকে গড়িয়ে দেবেক—

উদ্যত কাটারী আর সাবির সক্ষম শক্তিমান দেহের ক্ষিপ্রতা দেখে গার্ডবাবু ভীত হয়েছিলেন। তিনি একটু সরে দাঁড়ালেন। মনে মনে তাঁর সন্দেহ হয়েছিল, এতবড় বোঝাটা যে দু'হাতে তুলে নিলে, যেরকম ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে এল—তাতে শারীরিক ক্ষমতায় হয়ত এঁটে ওঠা যাবে না। এই অরণ্যের অন্ধকারে যদি মুণ্ডুটা সত্যই চুটিয়ে দেয়! অবশ্য হাতে লাঠি আছে, কিন্তু তার ব্যবহারের পূর্ব্বেই ও নেকড়ে বাঘের মত টুঁটি কামড়ে ধরবে—এ কথা ঠিক। যদি প্রবল একটা ধাক্কাও দেয় তবে গড়িয়ে নীচের খাদে পড়তে হবে, তাতেও বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা নেই। মাথার বোঝাটা গায়ের উপর ফেলে দিলেও গড়াতে গড়াতে খাদে পড়তে হবে।

সাবি পাতার বোঝা মাথায় করে, গার্ডবাবুকে একপ্রকার ধাক্কা দিয়েই সরিয়ে দিয়ে হু-হু করে পাহাড়ের সরু রাস্তা দিয়ে নেমে গেল—লঘুপক্ষ প্রজাপতির মত অক্লেশে। কিছুক্ষণ বাদেই সে পাহাড়ের জঙ্গলের অন্তরালে চলে গেল,—গার্ডবাবুরও সাধ্য নাই এত দ্রুত এই পথে চলার। তিনি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন—

সাবি মাথায় বোঝা নিয়ে একনিশ্বাসে পাহাড়ের পাদদেশে নেমে এসে পিছন পানে চেয়ে দেখলো, পিছনে কেউ আসছে কিনা। না কেউ নেই, সে ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলো,—কপাল থেকে ঘামের বিন্দুগুলি ডান হাতের তর্জ্জনী দিয়ে মুছে ফেলে দিল, তার পর আর একবার পিছনে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ীর পথ ধরলো।

তখন অপরাহ্ণ। ধূসর পশ্চিমাকাশে উত্তপ্ত সূর্য্যদেব ধূলিজালে যেন অনেকটা স্তিমিত। পলাশগাছের মাথায় পাহাড়ের ছায়া পড়েছে, ফুলগুলোও যেন বিবর্ণ। পায়ের নীচে ঊষর মৃত্তিকা, বিশুষ্ক তৃণ, পাণ্ডুর পলাশের চারা। তামাটে ধুলোয় গাছের পাতাও রক্তাভ। সাবি আনমনে পথ দিয়ে চলছিল—

পলাশ-তলায় সাধু তেমনিই বসে আছে। কাজের মধ্যে শুকনো গাছের ডাল ভেঙে বনের লতা দিয়ে বেশ ভাল করে বেঁধেছে—পুরুষের এক বোঝা হবে। সাধু ডাকলো,—সাবি, বোঝাটা তুলে দে রে—

সাধুর বোঝা তুলতে এসে সাবি নিজের বোঝাটা নামিয়ে পলাশের ছায়ায় শুষ্ক তৃণের উপর বসে পড়ল—কতকটা ক্লান্তিতে, কতকটা আশ্রয়ের সন্ধানে। সাধুর হৃদয় রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো—সাধু বসে ছিল সাবিরই প্রতীক্ষায়, সাবি এসেছে, এমনি করে তার ডাকে কোনদিন আসেনি, তার পাশে বসেনি। চিরদিন উপেক্ষার হাসি হেসে চলে গেছে নিজের কাজে—তাই—সাধু প্রশ্ন করলো,—তুর কি হ'ল বটে ?

সাবি একটা নিশ্বাস ফেলে বললো,—গাডবাবু ধরলেক,—পালিয়ে এনু বটেক। বলে, থানাকে চল,—নচ্ছার ব্যাটা—

—কাটারী দিয়ে চুটিয়ে দিলি নাই কেনে ?

—না, সরকারী নোক, তাই পালিয়ে এনু বটেক—

—হোথা বনকে কে দেখছে—হেয়ালে খেয়ে লিত—

সাধু একটা চুটি বের করে চকমকি ঠুকে ধরাল, তার পর কিছুটা টেনে টেনে পুড়িয়ে বললে,—লে, খেয়ে লে—

সাবি চুটি মুখে দিয়ে ধুম উদ্গিরণ করে বললে,—এতে কাঠ কোথাকে পেলি ?

—হেথা, গাছে। এতক্ষণ বসে বসে ভাঙচি না ?

সাধু তৃষিত সকরুণ চোখে সাবিকে দেখছিল। সাবির তন্বী যৌবনোচ্ছল দেহের উপর দিয়ে একটা দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সে অকস্মাৎ প্রশ্ন করলো,—তুঃ সাঙ্গা করবি না ?

—কেনে ? তুর কি ?

সাধু এবার সাবির মুখ ও দেহখানা ভাল করে দেখছিল,—সে যেন দৃষ্টি দিয়ে ওর সফেন দেহপাত্র নিঃশেষে পান করছিল ! চোখে চোখ পড়তেই সাবি হেসে বললে,—কি দেখছিস্ ?

সাবি বুকের কাপড়টা টেনে প্রান্তভাগ শক্ত করে কোমরে গুঁজে দিল।

সাধু বললো,—তুকে দেখছি রে ?

—কেনে ?

—তোকে দেখতে কি রে ! মুরগীর মত পেখম ধরেছিস্ রে ?

সাধুর এই উপমার অর্থ সাধুভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়। সাবি সুন্দর, সে যেন আজ যৌবনের রঙীন পক্ষ মেলে, চঞ্চল মরালীর মত চলছে। নিরক্ষর গ্রাম্য সাধুর সৌন্দর্য্যপ্রকাশের ভঙ্গি এমনি গ্রাম্য ও প্রাকৃত। সাধু এমনি করেই জানায় তার প্রশংসাবাদ।

সাবি হাসলো—ক্লান্ত কালো মুখের মাঝে শুভ্র দাঁতগুলি চিকচিক করে উঠলো। সাধু উৎসাহিত হ'য়ে বললে,—খোঁপাকে ফুল গুঁজে লে—

সাধু এক লাফে একটা পলাশগাছে উঠে একটা পলাশগুচ্ছ নিয়ে এসে সাবির অসংবৃত খোঁপায় গুঁজে দিল। কালো চুলের মাঝে লাল পলাশ যেন সহসা জ্বলে উঠলো—সাবি বাধা দিল না, প্রতিবাদ করলে না। সাধু সাবির মুখের দিকে চেয়ে পুনরায় প্রশ্ন করলো,—তু সাঙ্গা করবি না?

সাবি হেসে বললে,—কেনে? তু সাঙ্গা করবি? তু বিয়া করিস্ না কেনে?

সাধু ধরা গলায় বললে,—তু সাঙ্গা করলে, বিয়া করবেক নাই। তুকে আমি চাই রে, সাবি—

সাবি সাধুর অকৃত্রিম প্রেম-নিবেদনে হয়ত পুলকিত হয়ে থাকবে। সে হেসে বললে,—মোর ত মুনিষ রইছে রে সাধু—

অর্থাৎ তার স্বামী এখনও বেঁচে আছে, তার পক্ষে পুনর্ব্বার বিবাহ তথা সাঙ্গা করা ত সম্ভব নয়।

সাধু, যুক্তি আছে এমনি ভাবে বললে,—হঃ, মুনিষ আছে! খাদকে গিয়ে কোন কামিন সাঙ্গা করেছে বটে। পাঁচ-ছ'বছর ঘরকে আসে নাই কেনে রে? আছে কি লেই কে জানছে?

—হুঁঃ, তু জানছিস্ বটে, চ' গাঁকে যাই—চল্—

নির্জ্জন অপরাহ্ণ। সূর্য্য ভালকুড়ি পাহাড়ের আড়ালে কিন্তু আরক্তিম হয়নি। পলাশগাছের ছায়ায় আলোর প্রাচুর্য্য ধীরে ধীরে কমে এসেছে। সাধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে একবার সাবির মুখের দিকে তাকালো। তার যৌবনশ্রী তাকে যেন মাঝে মাঝে উন্মাদ করে দেয়। এই নির্জ্জনতার মাঝে সাধুর অন্তর যেন তারস্বরে চীৎকার ক'রে উঠল। সে চেয়ে রইল—

সাবি হেসে বললো,—তু কি দেখছিস্ রে সাধু—

—তুকে দেখছি আর শ্বাস ফেলছি—

সাবি পুনরায় ব্রীড়াভঙ্গি সহ হেসে বললে,—পরের কামিন দেখে শ্বাস ফেললেক তু—

সাধু প্রতিবাদ করিল,—হুঁ, পরের কামিন—

—না, তুর বুঝি?

সাধুর অশিক্ষিত মনে কত কথা পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠলো, কিন্তু তারা কণ্ঠের নীচে ভীড় করেই রইল, জেল-কয়েদীর মত কণ্ঠপ্রাচীরের বাধা অতিক্রম করে বেরিয়ে আসতে পারল না। সাধু তাই নীরবে উঠে দাঁড়ালো।

সাবি তাড়া দিল,—গাঁকে যাবি না ?

সাধু মুখে একটা শব্দ করিতেই, গরুগুলি একসঙ্গে এসে সাধুকে ঘিরে দাঁড়ালো—সে মনে মনে তাদের গুণে দেখলো সবই ঠিক আছে। সাধু আপন মনেই বলল,—হ, ঠিক আছে বটে—

সাবি তার কাঠের বোঝা মাথায় তুলে দিল এবং নিজের পাতার বোঝা মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। গরুগুলি আগে আগে লাল ধূলি উড়িয়ে চলল গ্রামের দিকে, তার পর যাচ্ছে সাবি তার বোঝা নিয়ে, আর তার পিছনে অস্তরাকাশকে আরক্তিম করে চলেছে সাধু—

সে কত কি ভাবছিল, হঠাৎ বলে উঠলো,—তু সাঙ্গা করবি না ত, মু বিয়া করবেক নাই।— অর্থাৎ সাবিত্রী যদি তাকে সাঙ্গা না করে, তবে সাধু সারাজীবন বিবাহ করবে না।

সাবি আপন মনে একটু হেসে কি যেন ভাবলো। তার পর হঠাৎ পিছন ফিরে সাধুর মুখের দিকে চেয়ে বললে,—কেনে, তু তরীকে বিয়া কর কেনে। সেটা ত ডাগর হইছে, ভাল বটি—

গরুর পায়ে পায়ে লাল ধুলায় আকাশ ছেয়ে গেছে, সাধুর মুখখানিও আরক্তিম হয়েছে—সমস্ত রক্ত যেন মুখে এসে আশ্রয় নিয়েছে। সে কম্পিত কণ্ঠে বললে,—মু তরীকে জানছি না, ডাগরটি দেখছি না, মু ত সাবিকে জানছি, আমার মন বটি, কেনে তু—

সাধু হঠাৎ থেমে গেল,—বেগবান হৃদয়ের ভাষা প্রকাশিত হল না, ভিজা কণ্ঠে সে যেন থেমে গেল। সাবি আগে আগে মাথার বোঝা ছেড়ে দিয়ে দু'হাত দোলাতে দোলাতে যাচ্ছিল, ঋজু সরল দেহের উপরে সে অনায়াসে বোঝার ভারসাম্য রক্ষা করেছে। সে চলতে-চলতেই বললে,—তু কি বলছিস্। পাগলা বটি ? মু ত মরদের কামিন বটি ?

সাবি কথাটা শেষ করে ফিরে দাঁড়ালো—চেয়ে দেখলো কাষ্ঠভার-পীড়িত সাধুর বিষণ্ণ মুখের মাঝে চোখ-দুটি অশ্রুময় হ'য়ে ছলছল করছে,—সে জবাব দিল না।

সাবি আবার চলতে শুরু করলো—নিয়মিত দৃঢ়-পদক্ষেপে।

দুই-তিনদিন পরে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সাধু এসে বলল,—সাবি, কাল কামিন দিবি ?— সাধুর একখানা ডাঙা-জমিতে কিছু মাটি কেটে গভীর

করতে হবে এবং চওড়া করে আল দিতে হবে, তাই কয়েকজন কামিন মুনিষ চাই।

সাবির মা তাদের কুটীরের বারান্দায় বসে শালপাতা গাঁথছিল; সে বললে,—কি দিবি? নগদ না চাল দিবি?

সাধু বললো,—চাল,—দু'সের দেব—জলখাবার মুড়ি দেব মাঠকে—

—ক'টা কামিন লিয়েছিস তু?

—চারটা, মনিষ একটা—

পরদিন সকালে সাবি চা-মুড়ি খেয়ে সাধুর জমিতে কামিন দিতে গেল। সকালে পাহাড়ের হাওয়ায় গা-টা শিরশির করে, কিন্তু বেলা প্রহর না হতেই আগুনের মত হাওয়া বইতে থাকে। কাজেই বেলা দুটোর পরে ছুটি—কিন্তু কাজ আরম্ভ হয় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই। মানুষের ছায়া যখন দীর্ঘ হ'য়ে আসে তখন তারা মাঠ থেকে ফিরে আসে। মাঠে ক্ষেত্রস্বামী জলখাবার দেন একসের মুড়ি—ওজনের নয়, সের মাপের। সাবি ঝুড়ি কাঁকালে করে সাধুর জমির দিকে চলেছে,—দূর থেকে দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে পলাশ আর শিমুল ফুল অনুদিত সূর্য্যের আলোকে ঝলমল করছে—পলাশের সবুজ পাতা আরক্তিম হ'য়ে উঠছে। সাবি ভাবছিল সাধুর কথা,—সাধুর কথা কয়েকটি শুনে কাল থেকে যেন তার প্রাণ চঞ্চল হয়েছে,—যে তারটা এতদিন অত্যন্ত ঢিলে হ'য়ে ছিল, তাকে আঘাত করলে শব্দ হতো না, সেই তারটা যেন কে টেনে টনটনে করে দিয়েছে,—তাতে একটু হাত দিতেই ঝনঝন করে ওঠে। সাবির মনের তার সাধুর কথায় যেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে—কিন্তু সে বিবাহিতা। স্বামী নিরুদ্দেশ, হয়ত বেঁচে আছে, হয়ত ফিরবে—

*

ভালকুড়ি পাহাড়ের পিছনে একটা কাঁন্দোড়, তার পুবে ডাঙার গায়ে সাধুর জমি। জমিটা সমতল নয়—একপাশে উঁচু, তাই তাকে সমভূমি করতে হবে, নইলে জল দাঁড়ায় না। জমিটা একটু গভীর হলে জল দাঁড়াবে। তা ছাড়া উঁচু আল দিলে অনেক জল ধরবে এবং জমিটা সহজেই বহু রস সঞ্চয় করতে পারবে। তাতে ফসল ভাল হবে এবং ফসলের মারও নেই।

সাধু আর তার মনিষটি মাটি কেটে ঝুড়ি বোঝাই করে দিচ্ছিল আর সাবি, তরী প্রভৃতি কয়েকজন কামিন মাটি বহন করে দূরে আলের উপর রেখে আসছিল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে রহস্য-পরিহাস চলছিল। সাবি প্রথম তরীকে লক্ষ্য করে বললে,—তরী ত জোয়ান হইছে বটে!

তরী উদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরী, সে সলজ্জ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে,—তুর তাতে কি?

—বাঃ রে, বিয়া হবে, মোরা রস খেয়ে লাচবো—

বিবাহের কথা শুনে তরী হেসে ফেললো,—তাঁর সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে বললে,—ইঃ!

সাধুর সহিত যে মনিষটি কাজ করছিল—সে বিবাহিত, সাধুর চেয়ে বয়সে বড়। তার নাম নগেন, কিন্তু ঘোড়ামারায় তারা সকলে বলে 'লগেন'। লগেন রসিকতা করলে,—বিয়া শুনে খুব মজা হইছে বট—

তরী ভ্রূ কুঞ্চিত করে রাগতঃ ভাবে বললে,—ঘরকে চলে যাবো, উসব বলবি ত—

—হ, ঘরকে যাবি ত বটে, কার ঘরকে যাবি? সাধুর ঘর বড় বটি—

সকলে হেসে উঠলো। তরী মাটি-বোঝাই ঝুড়িটা মাথায় করে ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে চলে গেল। মনে হ'ল, সে যেন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হ'য়েছে। কিন্তু সে হাসছিল অন্তরীক্ষে।

বেলা প্রহর পার হতেই সকলে আলের উপর জলযোগ করতে বসে গেল; সাধু আঁচলে একসের মুড়ি, কিছু পেঁয়াজ লঙ্কা ও বেগুনী দু'খানা করে দিয়ে দিল। কলসীতে এক কলসা জল এসেছে। সাধু দু'খানা বেগুনী সাবির কোলে বেশী ফেলে দিয়ে বললে,—লে, খেয়ে লে—

পেঁয়াজ-লঙ্কাই সাধারণ ভাবে দেয়, বেগুনী পেয়ে সকলেই খুশী। সাধুর এই সৌজন্য ও আতিথেয়তাকে ধন্যবাদ দিতে বর্ষিয়সী কামিনী বললে,—বেশ হইছে বটে সাধু, বেগুনী দিয়েছে বটে—হাঁ—

সে লক্ষ্য করছিল, সাবির কোঁচড়ে দুর্লভ বেগুনী দু'খানা বেশী পড়েছে, সে তাই বললে,—সাবিকে আর দুটো বেগুনী দিয়ে দে,—ডপ্‌কা হইছে বটে—কামিনী হি-হি করে হেসে উঠলো।

সাধু বললে,—বাটা করে দিলেক, আর লেই—কাজ কর ভাল খাওয়াবেক্—

কামিনী হেসে বললে—হ, ভাল খাওয়া কেনে, সাঙ্গাকে খাওয়া কেনে! হাঁরে সাবি, সাধু ভাল বটি, উকে সাঙ্গা কর কেনে—

সাবি চট্ করে বললে,—উঃ, তোর বড় ভাবনা বটে!

কামিনী বললে,—হ, ভাবনা ত বটি, তুর কি হবেক? দেহটা ত পেখম ধরেছে রে—কে এখন তুকে সাঙ্গা করবে বল?

সাবি ধমক দিয়ে বললে,—আপ্‌না ভাবনা ভাব কেনে? মোর মনিষ লাগবেক নাই—

কামিনী পরাস্ত হয়েও বললে,—হ, মরবেক নাই,—ত—দেখবেক ত মনিষ লাগে কি নাই।

ভোজনান্তে চুটি খেয়ে পুনরায় কাজ সুরু করলে সকলে। তখন সূর্য্যদেব প্রায় মাথার উপরে উঠেছেন। সোজাসুজি রোদ এসে ত্বকের উপরিভাগ পুড়িয়ে দিচ্ছে। পাহাড়ের কোলে শূন্য ডাঙাটার উপর উত্তাপ উনুনের উপরের বাতাসের মত কাঁপছে। দূরের গাছপালা ঝিমিয়ে এসেছে। কোন্ দূরের বটগাছের ফাঁক থেকে একটা ঘুঘু তারস্বরে তার সাথীকে ডাকছে—

কাজের ফাঁকে ফাঁকে পরিহাস চলছিল। মাটিপূর্ণ ঝুড়িগুলি সাবির মাথায় তুলে দিতে দিতে সাধু তার ক্লান্ত, রৌদ্রপীড়িত, স্বেদাক্ত মুখের দিকে বার বার তাকাচ্ছিল। সাবি তাই হেসে একবার বললে,—তু ত বড্ড নচ্ছার বটে,—কি দেখছিস্?

সাধু ঝুড়িটা তুলে দিতে দিতে বললে,—তু ত নচ্ছার করলি রে, সাবি—

—আমি কেনে?

—তুর দেহটা এমনি পেথম ধরলে কেনে? বল—

অন্য কর্ম্মিগণের কানে একথা যায়নি, তবে তারা লক্ষ্য না করেছিল এমন নয়। সৃষ্টির প্রাক্কাল থেকে নারী-পুরুষে এমনি নৈকট্য হ'য়েছে, অক্ষম বৃদ্ধরা তাকিয়ে দেখে যৌবনের দিন স্মরণ করেছে,—যৌবন রেখে গেছে তার উচ্ছ্বাস গানে, গিরিগুহায় চিত্রবিদ্যায়—গল্পে—কথায় কাব্যে। যুগে যুগে মানুষ ক্ষমা করেছে যৌবনের প্রগলভতা, অবিবেচনা—সকলে তাই সাধুর পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করলেও, বলেনি কিছু,—তাদের ঘিরে বরং তারা একটা মধুর স্বাদ গ্রহণ করেছে—

মানুষের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে প্রায় দেড়গুণ হ'ল। কামিনী বললে,—হারে, সাধু, সময় হয়নি—দেখ কেনে ছায়া বড় হইছে—

সকলেই ক্লান্ত, তারা কাজ ছেড়ে গৃহের দিকে ফিরলো। আর একদিন মাটি কাটলেই সাধুর জমিটা ভাল হ'য়ে যায়। বর্ষায় জল ধরবে, এবং চাষের সুবিধা হবে।

সাবি পথেই, বাঁধের জলে স্নান সেরে ভিজা কাপড়ে বাড়ী ফিরে এল। তখন বেলা প্রায় শেষ,—দেহ ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত। বাড়ীতে এসে কাপড়

ছাড়তে ঘরে গিয়ে দেখে তার মা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। সে প্রশ্ন করলো,—তুর কি হ'ল,—মারে ?

—জ্বর হইছে বটে। হাড়ে কাঁপুনি লাগছে রে—

—রাঁধিস্ নি ?

—না, তু গেলি, জ্বরও ধরলে বটে।

সাবি কাজে চলে যাওয়ার পরেই তার মায়ের জ্বর হ'য়েছে, সারাদিন উঠতে পারেনি। সাবি মায়ের কপালে হাত দিয়ে দেখে জ্বর অনেক। সে বলল,—বেজায় জ্বর হ'ল বটে!—সাবি ব্যস্ত হয়নি—বুড়ো মানুষ, এমনি জ্বর হ'তেই পারে।

—চা, মুড়ি খেয়েছিলি বটে ?

—না, উঠতেই লারলাম।

তখন সন্ধ্যা প্রায় সমাগত। সূর্য্যদেব ভালকুড়ি পাহাড়ের পিছনে ঢলে পড়েছেন। দেরী করবার উপায় নেই। সে তাড়াতাড়ি পাতা-কুটা সংগ্রহ করে উনুন জ্বালিয়ে ভাত তুলে দিলে। সারাদিনের পরিশ্রমান্তে দুটি ভাত ত খেতেই হবে, নইলে কাল আবার কামিন দিতে যাবে কি করে? সে ভাত তুলে দিয়ে এসে মাকে প্রশ্ন করলো,—তু কি খাবি রে মা ?

—কিছু না, একটু জল দে—

—চা মুড়ি খাবি না ?

—হাঁ খাবো, ভাতটো নামিয়ে নে—

সন্ধ্যার পরে সাবি ভাত ও শাকপাতা দিয়ে একটা তরকারী তৈরী করে নিল। মা'র জ্বরটা তখন কিছুটা কমেছে, তার মা উঠে বিছানায় বসেছে। সাবি বললে,—চা মুড়ি খাবি মারে ?

—হ, দে এবেলা খেয়েনি—

সাবি এক গ্লাস চা তৈরী করে মুড়ি সহ মাকে দিয়ে নিজে খেয়ে নিল। বুড়া মাকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বললে,—তু শো কেনে, মা। বিহানে জ্বরটা ছাড়বেক—লয় ?

—হ, ছাড়বেক! দেহটা জারা জারা হইছে, রোগের সঙ্গে কি আটতে লারবেক আর ?

—কেনে লারবেক না! কাল কালোমেঘ খাবি—

—মা শুয়ে পড়ল। সারাদিন জ্বর ভোগের পর শরীর তার অত্যন্ত দুর্ব্বল। রাত্রে চা মুড়ি খেয়েও দুর্ব্বলতা দূর হয়নি—সাবির মা বৃদ্ধা, সে শুয়ে বললে,—

হাঁরে? বুড়া হইছি, কবে ডাক পড়বেক। সে নকুড় ত খোঁজ লিলে না,—এত বছর গেল। তু সাঙ্গা কর, সাবি—

নকুড় বাউরীর সঙ্গে একদিন শুভলগ্নে সাবির বিবাহ হ'য়েছিল, সেদিন সাবির বয়স ছিল দশ। সেদিনের কথা অল্প অল্প মনে পড়ে, নকুড়ের ঘরে সে কয়েক মাস বাসও করেছিল; কিন্তু তার পর নকুড় কোথায় গেল কাজ করতে, আর ফেরেনি গাঁয়ে। সাবির মনে পড়ে সেই বিবাহ-দিনের কথা। মাদলসহ খুব নাচ-গান হ'য়েছিল, সে সাজানো গাড়ীতে চড়ে গিয়েছিল শ্বশুরবাড়ী।

সাবি নীরবেই বসে ছিল। মা বললে,—তু সাঙ্গা করবি না?

—করবেক নাই কেনে? জামাই কি মরেছে বটে?

—হ, এতে বছর খবর লিলে না,—তার জামাই কিসে? ছাড় ত হইছে, তু সাঙ্গা কর—

সাবি হেসে বললে,—হঁ, মনিষ কোথা? কাকে সাঙ্গা করবেক? গাছ না পাথর?— সাবি হিহি করে হেসে উঠে চুপ করলো।

—কেনে উ সাধু সাঙ্গা করবে বলেছে। উ পাড়ার মঙ্গল বলেছে—

—তুকে বলেছে! তু ঘুম দে—জ্বর হইছে, ভুল বকছিস্, মা—

—হঁ, ভুল বকছি—

মা পাশ ফিরে শুয়ে কি যেন বললো। সাবি তার কোলের কাছে খেজুরের তালাইতে শুয়ে পড়লো—

সে ভাবছিল অতীতের কথা। দূরের নির্জ্জন পাহাড়ের পাদদেশে শেয়ালকুল প্রথম প্রহর ঘোষণা করছে। একটা ফেউ ডেকে বেড়াচ্ছে দূরের মাঠে—হয়ত তার পিছু পিছু বাঘ আছে। দূরে কোন গাছে একটা রাতের পাখী ডাকছে—টি—টু, টি—টু—। শেয়ালের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে তিতিরগুলো ডেকে উঠেছে সমবেত ভাবে—তিতিরের ডাককে ওরা বলে, চাকৃ পাকিতা—অমনি করেই পাখীগুলো ডাকে—কলরব করে একসঙ্গে।

সাবি চোখ মেলে চালের দিকে তাকালো,—কৃষ্ণপক্ষের সদ্যোদিত চাঁদের আলো ফুটো চালের ভিতর দিয়ে ঘরে এসে পড়েছে। কালবৈশাখীর ঝড়ে ঘরখানা হয়ত খাড়াই থাকবে না। যা সামান্য খড় সে পেয়েছে তা ঘরে লাগালে গরুটা উপোস করবে; গরুটাকে খাওয়াতে গেলে, বর্ষাটা ঘরে বসে ভিজতে হবে—

সাবির চোখ জড়িয়ে আসছিল ঘুমে,—তার মধ্যে তার মনে পড়ে সেই নকুড়ের গৃহকোণ। পরমাদরে তারা তাকে নিয়েছিল, তার পরে বিবাহের পর

আত্মীয়-স্বজন চলে গেল। নকুড়ের মাসি এসেছিল, সেও চলে গেল। বুড়ে বাপ আর নকুড় ছিল,—দু-একবার সেও গেছে। সেবার ধান হয়নি তাই নকুড় গেল খাদে কাজ করতে, তারপর আর ফেরেনি। লোকে বলে খাদেই কোন কামিনকে সাঙ্গা করে ধাওড়ায় আছে। আর আসবে না; তার বুড়ো বাপ কিছুদিন পরে অসহায় ভাবে মারা গেল। সাবি রয়ে গেল মার কাছে ঘোড়ামারা গ্রামে। সে দুর্ভাগ্যটা তখন সে ঠিক বুঝতে পারেনি, —আজ যৌবনে পা দিয়ে সে বুঝেছে তার দুর্ভাগ্যের কথা। জীবনের অপরিপূর্ণতাটা সে আজ বোঝে, যৌবনের নিঃসঙ্গতা তাকে পীড়া দেয়। সাধু তাকে কি যেন বলতে চায়,—সাধু তাকে সাঙ্গা করতে চায়—কিন্তু যদি নকুড় ফিরে আসে? যদি সে বলে, ছাড় ত হয়নি—

ক্লান্ত সাবি সাধুর কথা ভেবেই ঘুমিয়ে পড়ল—

*

ভোরে পাখীর ডাকের সঙ্গে সাবির ঘুম ভাঙলো,—চারিদিকে নিবিড় কুয়াশায় ভরে গেছে,—কোন দিকে কিছু বোঝা যায় না। ভালকুড়ি পাহাড়ের সবটাই মুছে গেছে পৃথিবী থেকে,—সূর্য্যোদয় হয়নি, হলেও সহসা দেখা যাবে না। সাবি ঘরের পিছনের চালা থেকে গরুটা বের করে উঠানে এনে বাঁধলো, তার পরে এক আঁটি খড় দিয়ে বললে,—খেয়ে লে—

মুরগী ক'টাকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিলে,—তারা পুবের মাঠের পানে আহার-অন্বেষণে চলে গেল। শুকনো পাতা দিয়ে কড়াইতে জল গরম করতে দিয়ে সে ডাকলো,—মা,—মারে—

মা সাড়া দিল। বললে,—বিহান হ'ল বটে!

—হা, বড্ড কুয়াসা হইছেন বটে—তুর জ্বরটা ছাড়লেক—

—হ, ছাড়লেক বুঝি!

তার মা ধীরে ধীরে এসে দাওয়ায় বসলো। বললে,—শরীরটা পাতলা হ'ল বটে। জ্বরটা আর আজ লেই—

সাবি উষ্ণ জলে চা ছেড়ে দিল, এবং খানিকটা গুড় তার মধ্যে দিয়ে সিদ্ধ করে নামাল। মাকে মুড়ি চা দিয়ে নিজে এক পাত্র নিয়ে বসে মুড়ি চিবোতে-চিবোতে বললে,—কালামেঘ লিয়ে আসি, তু খেয়ে লিবি। কামিন দিয়ে এসে রাঁধবেক—

—তু টি রাঁধবেক,—দেখি ত—

মুড়ি খেয়ে সাবি কালোমেঘের পাতা সংগ্রহ করে এনে তার রস করলো।

একটা লোহা আগুনে দিয়ে লাল ক'রে, ছ্যাঁক করে তার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে বললে,—লে খেয়ে লে, মা রে—জ্বরটা যাবেক—

সাধারণ জ্বরে এইটাই তাদের ওষুধ,—অন্য ওষুধ খাওয়ার পয়সাও তাদের নেই, নিকটে পাওয়াও যায় না। তিন ক্রোশ তফাতে হাতুড়ে ডাক্তার আছে,—তার ফি দুইটাকা। এই ওষুধ খেয়ে তারা বেঁচে থাকে,—বেঁচে আছে। রোগ-ব্যাধি তাদের কমই—বুড়ো হ'লে ওষুধে ভর করে তারা বেঁচে থাকতে চায় না, বাঁচেও না। তারা কামনা করে আবার ফিরে আসতে নতুন দেহ নিয়ে। জীর্ণদেহে বেঁচে থাকার মত বিড়ম্বনা তাদের আর নেই,—জীবনের মূলধন তাদের দেহ, সেটা জীর্ণ হ'লে বাঁচা চলে না—মরতেই হয়। অতএব মৃত্যুটা তাদের কাছে শোকাবহ কিছু নয়, সেটা নিষ্কৃতি রূপে দেখা দেয়। জীবনকে তারা বড় আপনার করে জড়িয়ে ধরে না, তাই ছাড়বার সময় চিত্ত হাহাকার করে কেঁদে ওঠে না—মৃত্যু আসে তাদের জীবনে চির-সুন্দরের মূর্ত্তি নিয়ে—খুব স্বাভাবিক ভাবে।

সাবি তাড়াতাড়ি তৈরী হ'য়ে নিতেই সাধু এসে হাঁক দিল,—সাবি, কি হল রে? যাবি না—

সাবি ঝুড়ি নিয়ে উঠানে দাঁড়িয়ে বললো,—মা রে, তু শুয়ে থাক একলাটি,—এসে রাঁধা করবেক,—তু রাঁধা করবি না—

সাবি তাড়াতাড়ি চলে গেল মাটি কাটতে, সাধুর জমিকে চৌকস ও সমতল করতে। তারা যখন মাঠে এসে পৌঁছিল তখনও কুয়াশা কাটেনি, তবে কুয়াশা পাতলা হ'য়েছে, সূর্য্যদেব পূব আকাশে অনেকখানি উঠেছেন কিন্তু কুয়াশার ভিতরে তাঁর প্রকাশ হয়নি।

নিত্যকার কাজ আরম্ভ হল। সাধু মাটি কেটে ঝুড়িতে বোঝাই করছে আর কামিনরা সব সেই মাটি বহন করে নিয়ে যথাস্থানে রেখে আসছে। লগেনও মাটি কাটছে, সেও তুলে দিচ্ছে কামিনদের মাথায় মাটির ঝুড়ি। লগেন পরিহাস করলে তরীকে,—মাটি বেশী হইছে বটে, কম ক'রবেক?

—না, দে কেনে কত দিবি—

মাটি-বোঝাই বেশী-কম উভয়ই হতে পারে, লগেন ইচ্ছে করেই কিছু কিছু বেশী মাটি চাপিয়েছে তরীকে জব্দ করতে, কিন্তু তরী কিছু বলেনি। লগেন তাই বললে,—তু পারবি?

—হ, আমি খুকী বটি?

লগেন কোদালের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে,—হঁ, জোয়ান বটে,—হা. ডপ্‌কা হইছিস্‌ বটে—

তরী ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে,—তুর তাতে কি ?

—মোর আর কি ? সাধুকে বিয়া কর কেনে—

তরী জবাব দিল না, কিন্তু ফিক্‌ করে হেসে মাটির ঝুড়ি মাথায় করে চলে গেল। লগেন বললে,—সাধু, তরী তুকে বিয়া করবেক রে ?

সাধুর সামনে দাঁড়িয়ে সাবি, সাবির মুখের দিকে তাকাতেই, সাবি হেসে বললে,—বিয়া কর কেনে সাধু,—রস খাবেক, লাচ করবেক।

সাধু বললে,—বিয়া করবেক নাই, সাঙ্গা করবেক—

লগেন সঙ্গে সঙ্গে বললে,—হ, তু সাবিকে তবে সাঙ্গা কর কেনে—তরীকেও বিয়া কর কেনে—দুটা কামিন লিয়ে ধান পুতবি—

সকলে হেসে উঠলো এই পরিহাসে। বিগতযৌবনা কামিনী দূর থেকে দেখে সম্ভবতঃ তার যৌবনের দিনগুলি স্মরণ করলে; ছুটে এসে প্রশ্ন করলে --তুরা সব হাসছিস্‌ কেনে !—আশনাই হইছে বটে—

ঠাট্টা-তামাশার ভিতর দিয়ে কাজ চললো, বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত। মাঝে জলপানের সময় সাধু আজ পেঁয়াজী দিয়ে সকলকে সমাদর করেছে—তাতে সকলেই খুশী এবং তার পরিবর্ত্তে একঘণ্টা বেশী কাজ করিয়ে জমির মাটিকাটা শেষও করে নিয়েছে। জমিটায় এবার গড়ান-জল জমবে এবং চাষেরও সুবিধে হবে—

*

ঘোড়ামারা গ্রামের পশ্চিম-দক্ষিণে ভালকুড়ি পাহাড়। দক্ষিণ-পুর্ব্বে মাঠ—ভালকুড়িরই একটা উঁচু পাঁজরার উপরে ঘোড়ামারা গ্রাম; দক্ষিণের মাঠ নীচু হ'য়ে গেছে বহুদূর, তারপর আবার উঁচু হ'য়েছে, দূরে জগৎপুরের ডাঙায়, তার ওধার থেকে এসে মাঠের মাঝ দিয়ে গেছে কাঁদড় অর্থাৎ উঁচু ডাঙার জলনিকাশের প্রণালী। জগৎপুরের ডাঙার দক্ষিণে কাঁকুড়গাছি—সেখানে হাট-বাজার আছে। ওরা সেই হাটেই যায়,—তেল নুন কিনতে আর শালপাতা ফলমূল বিক্রি করতে। কাঁকুড়গাছির পুর্ব্বে কোলিয়ারী আছে, সেখানকার খাদেও দুই-একজন কাজ করে—

তৃতীয় প্রহরের পরে স্নান সেরে এসে সাবি দেখে, মা ভাত তুলে দিয়েছে আর খুঁটি হেলান দিয়ে বসে শালপাতা [illegible] বুনছে। সাবি বললে,—মারে, জ্বরটা ছাড়লেক ?

—হুঁ, ছাড়লেক বটে, দেহটা ভালই রইছেন—ভাতই খাবেক—

—তু সর, তরকারী মু রাঁধবেক—

—তরকারী কোথা ?

—ঐ ত কুমড়োর ডগা রইছেন, আলু পোস্ত রইছে—

সাবি পুনরায় প্রশ্ন করলে,—গরুটা ছেড়ে দিলি মা ?

—হ, উধার ভালকুড়ি পানে গেছে—

সাবি তরকারী রান্না করলে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ওরা খাবে,—ঐ একবারই। ভাতের মাড় ওরা ফেলে না, এমন পরিমিত জল দেয় যে, মাড়টা ভাতের গায়েই শুকিয়ে যায়। মা আর মেয়ে দু'খানা এনামেলের সান্‌কিতে ভাত বেড়ে নিয়ে সঙ্গে একটু তরকারী নিলে। তার সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ আর লঙ্কা। দুজনে মহা তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগল—

ওরা ঐ খায়, কিন্তু একমণ বোঝা নিয়ে চলতে ক্লান্ত হয় না, রোগব্যাধি যা আসে তা সহজাত শক্তিবলেই পরাজিত হয়—কালমেঘের পাতার রস খেয়েই জ্বর ছেড়ে যায়।

সাবির মা বললে,—সাবি, তুর ত বয়স হ'ল। সাঙ্গা কর কেনে—কবে মরবেক—

—মরবি কেনে ?

—বাচবেক কোন্ সুখে ? গতর লাই—কাজ করতে লারি, রোগে ভুগ্‌তে বাচবেক নাই—তু সাঙ্গা কর, মোর ছাড় হবেক, সুখে মরবেক—

সাবি উত্তর দিল না, সে পরিতৃপ্তির সঙ্গে কুমড়োর ডগা চিবোচ্ছে।

জীর্ণ বার্দ্ধক্য নিয়ে, অক্ষম দেহ নিয়ে তার মা বেঁচে থাকতে চায় না। মৃত্যুকে এদের ভয় নেই। পৃথিবীতে এদের সঞ্চয় নেই, তাই ইহকালের মোহও নেই যে, সঞ্চয়কে ফেলে যেতে হৃদয় হাহাকার করে উঠবে। এরা মৃত্যুকে বরণ করে হাসিমুখে—তাই সাবির মা বললে,—গতরে যখন বল লাই তখন বাঁচবেক কিসে, ওষুধ খেয়ে ? তু সাঙ্গাটা করলে, দেখে যাই—

সাবি কুমড়োর ডাঁটাটা ফেলে দিয়ে বললে,—মনিষ কোথায় যে সাঙ্গা করবেক ?

—কেনে ? সাধুকে যেন কেমনটি দেখছি রে।

—হুঁ, তু দেখছিস্ ? সাধু বিয়া করবেক নাই ?

—বিয়া কিসের ? তুকে সাঙ্গা করবেক, তু বল কেনে ?

—মু বলবেক ? কেনে তুর জামাই নেই—

—জামাই কোথা মরেছে কে জানছে—

সাবির মায়ের ইচ্ছা সাবির সাঙ্গা হয়, তা হ'লেই সে নিশ্চিন্তে মরতে পারে। সাবির স্কন্ধে ভর দিয়ে, অশক্ত অকর্ম্মণ্য দেহ নিয়ে বাঁচতে চায় না। সাবির মা এঁটো কুড়িয়ে থালায় তুলতে তুলতে বললে,—কাল হাটকে যা, পাতা একহাজার হইছে বটে। মুন তেল লিয়ে আয়—

আহারান্তে সাবি পাহাড়ের দিকে যেয়ে গরুটাকে নিয়ে এল, মুরগীগুলোকে ঘরে তুলে দিল। দক্ষিণ থেকে গরম হাওয়া বইছিল, হঠাৎ সেটা থেমে গিয়ে পশ্চিম থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর শিরশির করে উঠেছে। সাবি তাকিয়ে দেখে পলাশের গায়ে নতুন লাল লাল কচিপাতা উদ্গত হয়েছে ; অস্তায়মান স্ূর্য্যের আলোয় পলাশ-ফুলগুলি আগুনের মত জ্বলছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে শালিক-গুলো পাকুড় গাছে বসে কিচির-মিচির করছে—দূরের বনে তিতির ডাকছে—

সাধু এসে জানালো,—সাবি, লাচ-গান করবি না আজ রাতকে? রস খাওয়াবো—

সাবি ফাল্গুনের ছোঁয়ায় পুলকিত পৃথিবীর পানে চেয়ে বললে,—রস খাওয়াবি ?

—হ্ বটে—

—হ, তবে লাচ-গান করবেক নাই কেনে—

রাত্রে আজ পাঁচুই-মদের সঙ্গে সাধুর গৃহপ্রাঙ্গণে নৃত্যগীত হবে। ফাগুনের হাওয়ায় পঞ্চশরের তীক্ষ্ণসায়ক আজ চঞ্চল হয়ে উঠেছে ঘোড়ামারায় ! —সাবি বললে,—তরী যাবেক নাই—

—হ—যাবেক বটে।

*

সন্ধ্যার পরে উন্মুক্ত গৃহপ্রাঙ্গণগুলি ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় অর্দ্ধস্বচ্ছ হ'য়ে উঠেছে। গাছের নীচে ঘননিবিড় ছায়া—পথের পাশে অশ্বত্থগাছের ছায়া তার নিবিড় কায়া দিয়ে পথের বালি-কাঁকরকে ঢেকে দিয়েছে। পশ্চিম থেকে একটা হিমেল হাওয়ায় শরীরের মধ্যে শিরশির করছে—মৃদু হাওয়ায় কৃশ বাঁশগুলির শীর্ণ ডগাগুলো হেলে দুলে বেড়াচ্ছে—দূরের বনে ডাকছে শেয়াল, রাত্রের পাখী—

সাধুর গৃহাঙ্গনে মাদল বেজে উঠল। পাড়ার অনেকেই আছে। সাধুর বাবা রস খেয়ে দরজায় বসে বুঁদ হয়ে হুঁকো টানছে। পাড়ার দু'চারজন বুড়া-বুড়ীও আছে—

কিছু পাহাড়ী আমড়া নিয়ে বললে,—মা, নুন তেল আর কি সদা করবেক বল—

—পেঁয়াজ, আলু, দেশলাই, পোস্ত, পান—

সাবি ও অন্যান্য নারীগণ দ্রুত হাটের দিকে রওনা দিল। ভালকুড়ি পাহাড় ছেড়ে বাঁ-হাতে আধ ক্রোশ গেলে জগৎপুরের ডাঙা,—সরকারদের বড়-বাঁধের কোলে বিরাট বটগাছ ছাতার মত দাঁড়িয়ে আছে। ফিরবার পথে ওরা ওখানে বিশ্রাম করে। জগৎপুরের ডাঙায় তারা যখন এসেছে তখন সূর্য্যোদয় হল। তরী বললে,—বেলা হল বটে, সদা বিকোবেক না—

—হ, বিকোবেক না,—দোকানকে দিয়ে দেব—

—হারামীরা কম দেবেক—

অর্থাৎ যদি হাটে বিক্রয় করতে পারে তবে তারা যা পাবে, দোকানে [illegible] করতে গেলে দর কম হবে এবং সেই দোকান থেকেই তাদের সওদা [illegible]তে হবে এবং তার দর যাচাই করা চলবে না। তাই লোকসানের কথা। তরী দ্রুত পা চালিয়ে দিল—সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেই।

সড়াকুড়গাছি গ্রামের বাইরে একটা ইস্কুল, তার প্রাঙ্গণ দিয়ে যেয়ে গ্রামের প[illegible]শ পার হয়ে তবে হাটতলায় পৌঁছতে হয়। পথের দু'দিকেই কয়েকটা [illegible]নের দোকান, অথাৎ মুদী-দোকান। তার মধ্যে অমূল্য সউ-এর [illegible]কান বড়।

ওরা যখন ছুটতে ছুটতে দোকানের সামনে এসে পড়েছে তখন অমূল্য [illegible]াকলে,—এই—শালপাতা দিয়ে যা—

সাবি বললে,—দর কি ?

—দেড় টাকা—

—হ, দু'টাকায় দিচ্ছে কে ?

—দু'টাকাই দেব, দিয়ে যা। কত আছে—

—হাজার আছে বটে—

এদেশে মুদি-দোকানে কাগজের ঠোঙার প্রচলন নেই, শালপাতার ঠোঙায় [illegible]নিস দেওয়া হয়। দোকানীরা তাই বড় খদ্দের। তরীর দিকে চেয়ে অমূল্য [illegible],—তোর কত আছে ?

[illegible]রে কুড়ি কুড়ি— অর্থাৎ চারশো।

—[illegible] পাতাগুলি নিয়ে দোকানে তুলে দিয়ে বললে, ফিরবার মুখে সওদা বলি—তে[illegible]

—কেনে, তু দাম বেশী লিবি।

—হাটতলায় দাম জেনে আসবি। তোদের সঙ্গে এত ভালবাসা—তোদের ঠকাব? অমূল্য মিটিমি হাসলো।

সাবি তরী হি-হি করে হেসে উঠে আবার চলল, হাটের দিকে। কামিনী বললে,—অমূল্য মনিষ ভাল লয়, কেমনে তাকাচ্ছে বটে—

তরী বললে,—উ কি করবেক? উয়ার চোখকে তু ডরাচ্ছিস্!

—হ, মু ত বুড়ী বটি, তোরা জোয়ান—

তরী আর সাবি হাসলো। হাসিটা তাদের বয়সের ধর্ম্ম, তারা অকারণেই হাসে। ওরা হাসতে হাসতে এসে হাটের মাঝে বসলো আমড়া বিক্রি করতে।

আমড়া পয়সায় চার গণ্ডা। দরদস্তুর হল, ঠিক হল পাঁচ গণ্ডা করে দেবে। বিক্রি চললো। সাবি বললে,—ফুটো পয়সা লিবেক নাই।

ফুটো পয়সার চলাচল নিয়ে বচসা হল। ঘোড়ামারার ওরা ফুটো পয়সা নেবে না। নিলেও না।

বেলা এক প্রহর হ'তে তাদের ধামার আমড়া হরিতকী বিক্রয় হ'য়ে গেল—সাবি বিক্রয়-লব্ধ পয়সা গুণে দেখলে সাড়ে পাঁচ আনা হ'য়েছে। হাটে ভিনগাঁয়ের পরিচিত হু'চারজনের সঙ্গে দেখা হল, তারা পরস্পর কুশল প্রশ্ন করলে। কদমতলার সুখলাল বাউরী ওর শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে সম্পর্কিত; সে সাবির সঙ্গে আলাপ করে বললে,—নকুড় ত আর ফিরবেক নাই, তু সাঙ্গা কর কেনে—

দু'একজন বাবু লোক,—বিদেশে কোলিয়ারীতে, না-হয় ফ্যাক্টরীতে চাকুরী করেন, তাঁরা সাবিকে প্রশ্ন করলেন,—তোর বাড়ী কোথা? তরীকেও অনুরূপ প্রশ্ন দু-চারজন করলেন। তারা বললে,—ঘোড়ামারা—

—আরে, ওখানে শিকার আছে? তিতির, হরিয়াল?

সাবি বললে,—উ পাহাড়কে আছে বটে—কে জানছে—

আর-একজন প্রশ্ন করলেন,—অন্য শিকার আছে—

কথাটির অর্থ ওরা বোঝেনি; তরী বললে,—হ, রইছে বটে, পাহাড় চড়তে হবেক—

তারা শেষের দিকে বললে,—তোদের গাঁকে যাবো—

সাবিরা এই আত্মীয়তায় হেসে উঠলো! ওরা খুশী হ'য়ে চলে গেল—

হাট ধীরে ধীরে ভেঙে এসেছে। সাবি বললে,—চল, গাঁকে যাই,—বেলা হল বটে—

তরী বললে,—হু, চা পাঁপড় খাবেক নাই—

এটা ওদের বিলাস—হাটে আসলে ওরা দোকান থেকে পাঁপড় চা, না-হয় বেগুনী চা খেয়ে যায়। তথাকথিত সভ্যজগৎকে ওরা এখানে দেখে যায়। কখনও কখনও রঙীন কাচের চুড়িও কেনে, তবে সেটা মেলাতেই বেশী।

হাটের কোণে তোলা-উনুনে হারু তাঁতী তেলেভাজার দোকান করে; ওদের পরিচিত। ওরা দরদস্তুর করে পাঁপড় তেলেভাজা থাউকো দরে কিনে খেতে খেতে চা'র দোকানে বসলো। তাদের জন্যে দোকানের বাইরে একখানা নড়বড়ে বেঞ্চ আছে—সেখানা রোদে তখন তপ্ত হয়েছে। ওরা তাতে বসে চা খেয়ে নিলে। দোকানী একটু পরিহাস করলে ওদের যৌবন আর দেহকে কেন্দ্র ক'রে—ওরাও টাটকা জবাব দিলে।

দোকানী চা দিয়ে বললে,—হু, তোরা ঘোড়ামারার বটি?

—হু—তোদের গাঁকে সবই ছুঁড়ি বটে? কামিন খাটিস না—

তরী ফস করে বললে,—পরের ধানকে যাবি না, খোয়াড়ে লিয়ে যাবে—

এরকম পরিহাস একটু-আধটু চলে। যৌবনের ধর্ম্মই এই। তবে দোকানী প্রৌঢ়; সে বললে,—ধানকে যাবার বয়েস নেই রে—

ওরা খিলখিল করে হেসে উঠলো সকলে।

অমূল্য সাউ-এর দোকানে এসে ওরা সওদা কিনতে বসলো। অমূল্য বললে,—পাতা ত হাটে আজ একটাকা বার আনা গেছে রে—

সাবি ক্রুদ্ধ হয়েছিল; সে বললে, হু, হাটকে তু গেছিস? দু'টাকা দু'আনা দর দিয়ে পাতা পেলে নাই—

পাতার দাম নিয়ে কিছুক্ষণ গেল। অমূল্য পাকা দোকানদার। সে ভাবলো, সওদা দিয়ে সে পাতার দাম একটাকা বার আনা করে নেবে—তা নিয়েও বচসা হ'ল। এমনি করে বহুদিন এরা এই অশিক্ষিত মেয়েদের ঠকিয়েছে, কিন্তু ঠকে-ঠকে এরা এখন সেয়ানা হ'য়েছে। এরা অন্য দোকানে দর শুনে এসেছে, কাজেই অমূল্যর দরে কোন সুবিধে হল না। তার পরে ওজনে অবশ্য সে একটু মেরে নিয়ে ঠকালো। ওরা ওজনের কারসাজিটা ঠিক ধরে উঠতে পারেনি। সওদা ধামায় সাজিয়ে নিয়ে ওরা দেখলে সব জিনিষ হ'য়েছে কিনা।

অমূল্য বললে,—ওরে সাবি না তোর নাম, এই নে বিড়ি। সকলের হাতে এক একটা বিড়ি দিয়ে চকমকি পাথরটা এগিয়ে দিয়ে সে বললে,—সামনের হাটে পাতা আমাকে দিয়ে যাবি। মাল যা দিলাম খেয়ে দেখ গিয়ে, সব ঝাড়া মাল—ফাষ্ট ক্লাস—

তরী বললে,—ফাষ্ট কেলাশ—

সকলে হি-হি করে হেসে উঠলো। অমূল্য নখের ডগায় একটু সরিষার তেল নিয়ে সাবির হাতে ঘষে দিয়ে বললে,—ছাখ, শুঁকে দেখ. এমনি তেল তুই পাবি? এই কাঁকুড়গাছিতে নয়—

সাবি তেলটা শুঁকে দেখে সন্দিহান ভাবে বললে,—ভাল বটে?

—হাঁ—ফাষ্ট ক্লাস—

ওরা আবার হেসে সওদার ধামা মাথায় তুলে বেরিয়ে এল—

গ্রামের প্রান্তেই স্কুলের ভিতর দিয়ে একটা সোজা পায়ে-চলা পথ আছে, তবে তা দিয়ে যাওয়া সাধারণত নিষিদ্ধ। কেহ কোথায়ও নেই দেখে ওরা স্কুলের ভিতরেই ঢুকলো। স্কুলের ভিতরে ইন্দারা আছে—হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে রওনা হওয়া যাবে—

হেডমাষ্টারবাবুর বাসাও এরই মধ্যে। তিনি বারান্দায় চেয়ার-টেবিলে বসে কি যেন লিখছিলেন। ওরা একটু ভীত হ'য়েছিল, হয়ত মাষ্টারবাবু প্রশ্ন করবেন, এ পথে কেন যাচ্ছে তারা। সাবি তাই ইন্দারাটার দিকে যাচ্ছিল—

মাষ্টারবাবু ডাকলেন,—এদিকে শোন্—

সাবি প্রমাদ গণলে। হয়ত মাষ্টারবাবু বকবে, তাই সে এগিয়ে যেয়েই বললে,—জল খাবেক।

—জল খাবি. তা কি হয়েছে, দড়ি-বালতি ত রয়েছে। তোদের বাড়ী কোথা?

—খোড়ামারা।

—সামনের হাটে আসবি? রবিবারের হাটে?

—তা আসবো—কেনে?

—দু'গোছা কুচিকাঠি নিয়ে আসতে পারবি?

—লিয়ে আসবো। দু'আনা দাম—

—তা দু'আনাই পাবি। কিন্তু ঠিক-ঠিক রবিবার আসবি ত?

—হ্যাঁ. দিয়ে যাবো।

—শোন্, আমি যদি না থাকি, বাসায় দিয়ে যাবি। বাসা জানিস ত?

মাষ্টার-গৃহিণী দরজার ফাঁকে দাঁড়িয়ে বললেন,—সরু কাঠি নয়, ভাল কাঠি নিয়ে আসতে বল—

—শুনলি, ভাল কাঠি নিয়ে আসবি, আর ওর কাছে দিয়ে দু'আনা নিয়ে যাবি—

সাবি বললে,—দিয়ে যাবেক,—ভাবছিস কেনে ?

তারা ইন্দারার জল খেয়ে সওদার ধামা মাথায় করে দু'হাত দুলিয়ে, ইস্কুলের পিছনের আমবাগানের ভিতর দিয়ে জগৎপুরের ডাঙার দিকে সোজা রাস্তায় নেমে পড়ল।

সাবি যেতে যেতে বললে,—মাষ্টার লোক ভাল বটি,—কত লিখা পড়া জানছে, হেই ইংরাজী লিখছে, হেই বাঙ্গলা লিখছে—এ-সব বাবুরা উয়ার ছাত্তর বটি—

তরী বললে,—উঃ, মাষ্টারের বউ বটি ? অমনি কেনে ? প্যাকাটি। হাড্ডি ঠক-ঠক করছে—

সাবি বললে,—উঃ বদ্ধ ঘরকে খাঁচায় রইছে, রোদ বাতাস ত লাগছে নাই, সে দেহটা বাড়বে কিসে ?

ওরা জগৎপুরের ডাঙায় সরকার-পুকুরের পাড়ে বিরাট ছত্রাকার বটমূলে আবার বসলো একটু বিশ্রাম করতে। হাটে আজকার দেখা নতুন বস্তু নিয়ে আলোচনা হল, পরিহাস হল। সাবি রাগ করে বললে,—অমূল্য সউকে। দু'শো ছেঁড়া পাতা দিয়ে দেবেক,—বড্ড ঠেটা বটে—

তরী বললে,—ঠেটা ত তুর সঙ্গে, আশনাই করবেক—

সাবি ওষ্ঠ উল্টে বললে, —হুঁ, আশনাই করবেক ? মুণ্ডু চুটিয়ে দেবেক নাই ?

ঘোড়ামারায় গাঁয়ে ঢুকতেই সাবি হঠাৎ সচকিত হয়ে ফিরে দাঁড়ালো। তরী বললে,—কি রে ?

—মৌমাছির শব্দ লয় ?

—হাঁ বটে—

—মৌয়া ফুটলে বুঝি ?

সকলেই সচকিত হ'য়ে উঠলো। মহুয়া-ফুল ওদের একটা প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু। চাষ-আবাদের সময়ে গরুকে খাওয়াতে হবেই, নইলে কাদায় আর লাঙল টানবে না। ঘরে মজুত রাখতে হবে গরুর খাদ্য ও নেশা রূপে, তা ছাড়াও সংবৎসরের মদ তৈরীর একটা বিশেষ উপাদান মহুয়া। মহুয়ার মদের মত সুস্বাদু রস ওদের আর দ্বিতীয় জানা নেই।

মহুয়া ফুল ফুটেছে,—বসন্ত এসেছে এদের দ্বারে, তারা তাই সচকিত হ'য়ে উঠেছে।

সাবি বললে,—তরী, কাল বিহানে মৌয়া কুড়োতে যাবেক, তু যাবি ?

—হুঁ—যাবেক। তুকে ডেকে লিবে—

মহুয়া-ফুল নিয়ে কাড়াকাড়ি চলে—যে যত জোগাড় করতে পারে তারই লাভ। গ্রামের মহুয়াগাছের মালিক আছে, কুড়োতে দেয় না, তবে পাহাড়ের পাদদেশে যে গাছগুলি আছে তার মালিক সরকার, সেখানে ফুল কুড়োতে বারণ নেই। তাই সেই গাছের ফুল নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে। যে যত ভোরে উঠে যেয়ে আনতে পারে। কিন্তু বিপদও আছে। অনেক সময় ভালুক বসে থাকে মহুয়া-ফুলের মধু খেয়ে—নেশাখোরের মত গাছতলায় পড়ে থাকে।

সাবি বাড়াতে এসে সওদা নামিয়ে মাকে হিসাব বুঝিয়ে দিলে। হিসাব মিললো—সব ঠিক-ঠিক এসেছে। সাবি ঐ পায়েই গরুটাকে দেখে এসে দাওয়ায় বসলো। তার মা রান্নার ব্যবস্থা করে রেখেছে। শাক আর ভাত—কড়াই ছিল ঘরে। তার ডালও রান্না করা যাবে।

সাবি গাঁয়ের কান্দোড়ের পাশে বাঁধে স্নান করতে চলে গেল। তার পর রান্না ক'রে খেয়ে গরু-ছাগলগুলি দেখলে, আর পাহাড়ের পাদদেশ থেকে শুকনো গাছের ডাল সংগ্রহ করে ফিরলো।

*

এমনি করে চলে এদের জীবন। সভ্য জগতের সঙ্গে সংযোগ নেই,—সভ্য মানুষ এদের বলবে পশু জীবন, আহার-বিহার-নিদ্রা এই কি মানুষ-জীবন? কিন্তু বিরাট অতৃপ্তি, দুরাকাঙ্ক্ষা এদের জীবনকে বিড়ম্বিত করেনি—এরা সুখী। এরা কিছু চায় না জীবনে, তাই সবই এরা পেয়েছে। চেয়েছে অল্প তাই পাওয়ার আনন্দ এদের জীবন ঘিরে—অটুট স্বাস্থ্য নিয়ে এরা জীবন ভোগ করে।

শনিবার সন্ধ্যার দিকে আকাশটা মেঘলা হ'য়ে উঠলো,—মনে হয় রাত্রে বৃষ্টি নামবে। সাবি গরু-ছাগলগুলো গোহালের ভিতরে বেঁধে রেখে এসে রাত্রের আহারাদি শেষ করে যখন শুয়ে পড়লো তখন উঠানের অদূরে গাছের পাতায় পট্‌পট্‌ করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে—একটু শীতও পড়েছে। পাহাড়া দেশে সূর্য্য না থাকলেই ঠাণ্ডা পড়ে—

সাবি বললে,—মা রে, কাল ত হাট্‌কে যাওয়া লাগে—

—কেনে? পাতা লাই, সদা লাই, কেনে যাব?

—উ মাস্টারবাবুকে বলেছি ত সামনের হাট্‌কে কুচিকাঠি দেবেক। উরা ত মোর করে আশা করবেক বটে—

—হুঁ, কথা দিলি কেনে—

—উরা বললেক—

—হুঁ, তবে ত যাওয়া লাগেই বটে—বিহানে ঘোরটা কাটবেক নাই ?

অর্থাৎ সকালে হয়ত-বা বৃষ্টি নাও থাকতে পারে। কিন্তু তাদের এ-আশা সফল হয়নি। সকালেও অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল—সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। রাত্রে বেশ একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে,—গাছের পাতা আর বিশুষ্ক মৃত্তিকা থেকে একটা নূতন সোঁদা গন্ধ ছাড়িয়ে পড়েছে।

সাবি টোকাটা নিয়ে তরী, কামিনী, লগেন, সাধু সকলকে দেখে এল—ওরা কেউ হাটে যাবে না। কোন সাথী নাই, বেলাও বাড়ছে। সাবি মাকে বিষণ্ণভাবে বললে,—উরা কেউ ত যাবেক নাই, মা রে—কি করবেক ? কথা দিলেক—

—তু যা তবে—কথা যেখন দিছিস—

সাবির দ্বিতীয় কোন কাজ ছিল না। সে কুচিকাঠি দু'আঁটি নিয়ে, টোকা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ওদের এক ক্রোশ অর্থাৎ তিন মাইল রাস্তা, জগৎপুরের ডাঙা হ'য়ে যেতে হবে। সাবি ত্বরিৎ পদেই হাঁটছিল, তবুও বৃষ্টির ছাটে কাপড়ের অনেকখানিই তার ভিজে গেছে—

হেডমাস্টারবাবুর বাসা ইস্কুল-সংলগ্ন; বাসায় স্থানাভাব ব'লে ইস্কুলের বারান্দায় মিত্তিরমশায় ও ডাঃ বসুকে নিয়ে বাদল-দিনে, তার পর এই ছুটির দিনে, চা সহযোগে আড্ডা হচ্ছিল। হাট আজ ভাল বসেনি, তবুও হাট হ'য়েছে। হাটের পরে বসে এই আড্ডা জমেছে—চলবে এগারটা পর্য্যন্ত।

মাস্টারবাবুর বড় মেয়ে এসে বললে,—বাবা, কুচিকাঠি পাওনি হাটে ? মুড়ি ভাজবে কি করে—

—হাটই বসেনি, তার কুচিকাঠি কোথায় পাবো ? মুড়ি এখন কিনতে হবে আর কি ? এক বেটিকে বলেছিলাম, কিন্তু এই বৃষ্টিতে কে আর কুচিকাঠির জন্যে হাটে আসবে—

আড্ডা চলতে চলতে হঠাৎ ওরা চেয়ে দেখেন, সাবি ভিজে-ভিজে কুচিকাঠি নিয়ে এসেছে। সে বললে,—মাস্টারবাবু, তুর কুচিকাঠি লে,—দু'আনা দাম—

—হাটে আসিস নি ?

—না। বাদল বটে—

—তবে সামনের হাটে আনলেই হ'ত,—আমার কাঠির জন্যে ভিজে ভিজে এতদূর এলি কেন ?

মিত্তিরমশায় বললেন,—বেকুব, নইলে দু'আনার কুচিকাঠি দিতে তিন মাইল হেঁটে এসেছে এই জলে।

পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য

হেডমাস্টার পয়সা বের করে দিলেন। বললেন,—বোকার মত জলে ভিজে এলি কেন, পরের হাটে দিলেই হ'ত ?

—হ, কথা দিলেক নাই ? তাই ত আসা লাগলেক—

মিত্তিরমশায় বললেন,—হ কথা দিয়েছে,—স্রেফ বেকুবী—ওরা অমনিই অশিক্ষিত বেকুব, ভালমন্দ জ্ঞানই নেই—

সাবি এতগুলি শুদ্ধ বাংলা-কথা বোঝেনি, তবুও সে ভাবার্থ না-বুঝেছিল এমন নয়; সে বললে,—হুঁ, কথাটার দাম লাই ?—না এলে ছোটলোক বলে গালাগালি পাড়বেক নাই ?

—কথাটাই বড় হল রে ? সেটা শব্দ আর জলটা বাস্তব, তাতে শরীর ভিজে যায়—জ্বর হয়—

সাবি তথাপি প্রতিবাদ করলো,—কথা দিলেক, তাই আসা লাগলেক।

হেডমাস্টার কথাটার মাঝে যতি টেনে দিয়ে বললেন,—তোর ত সব ভিজে গেছে। শীত করছে না ?

—হুঁ, জাড় লাগছে বটে—

—চা খাবি ?

—দে না একটু, খেয়ে লি—

চা এলে, সাবি চা পান করে বাটিটা ধুয়ে উপুড় করে রেখে বললে,—চল্‌লেক—তু মাস্টারবাবু কেমনে বলি, একটো বিড়ি দে—

—হ্যাঁ, যা—

মাস্টারমশায়ের কাছ থেকে একটা বিড়ি নিয়ে, সেটাকে টানতে টানতে সাবি চলে গেল—সাবির যৌবন শ্রীর দিকে চেয়ে মিত্তিরমশায় ইঙ্গিত করলেন,—চা-টা সৎপাত্রে পড়লো যা-হোক,—এর পরে—

রসিকতাটা কেহই গ্রহণ করলেন না। মাস্টারমশায় চুপ করে থেকে বললেন,—আমরা যে শিক্ষা দিচ্ছি, তা সত্যিই নিষ্ফল।

—কেন ?

—লেখাপড়া-জানা, তথা সভ্য জগতের কোন প্রাণী কেবলমাত্র কথা রক্ষার জন্য দু'আনার কুচিকাঠি দিতে এই তিন মাইল বৃষ্টি ভিজে আসতে পারতো ? এ সততা, এমনি নিজের প্রতি সম্মান জ্ঞান আশাই করা যায় না—এই পৃথিবীতে।

মিত্তিরমশায় বললেন,—এটা ত একান্তই আহাম্মুকী—

—হ্যাঁ, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে তাই—নেহাৎ বেকুব, কিন্তু

ওরা কাজ করে

এই সততাঙ্গটা ছমছম করে উঠলো—

নিজের উপ মেলে একবার মৃতকল্প এই স্তব্ধ পৃথিবীর পানে চেয়ে দেখলো। একটা ঘ স্থির নিঃশব্দ পৃথিবীর রূপ তার কাছে ভয়াবহ মনে হল,—মনে হাটে পঁবন বিরাট বিশ্বের অনন্ত সিন্ধুর গভীরতম প্রদেশে পথহারা জলজন্তু। গেল। য়াল এই প্রকৃতির পানে মুগ্ধবিস্ময়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল,—এও তাই ব রর রূপ, চেয়ে চেয়ে দেখতে ভাল লাগে—

এ ভয়ে ভয়ে ডাকলে,—মা রে ? রাত আর কতটা আছে ?

সরল হরখানিক আছে বটে,—তু শো কেনে—

ওষুধ গোয়া কুড়াবেক,—

ডকে দেবেক, তু শো—ঘুম কর কেনে—

আর আবার শুয়ে পড়লো, সে ভয়ে ভয়ে আবার একবার তাকালে।

সপ্তাস্তে গৃহপালিত কুকুর ডেকে উঠলো। উঠানের উপর দিয়ে কি যেন বিড়ি নায়ার চলে গেল,—বোধ হয় শেয়াল। সাবি বারান্দায় শুয়ে আকাশের পাকি কিয়ে রইল—ওটা একটা পরম বিস্ময়—তারা, ছায়াপথ, তার নীচে এই কল পৃথিবা,—পৃথিবীর এই রূপ সে কোনদিন দেখেনি। এ যেন প্রকৃতির কা রহস্যময় অভিব্যক্তি, সিলিউট-ফটোর মত একটা ইঙ্গিত মাত্র। বিরাট ত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে ঘুমন্ত গাছগুলি তাদের দীর্ঘ স্তিমিত শাখা মেলে—

দূরের তারা জ্বলছে আকাশের বুকে, কোটি কোটি মাইল দূর থেকে আলো এসেছে পৃথিবীর বুকে, সেই আলোর ইঙ্গিতে যেন এরা এই কালো নিরবয়ব গাছগুলি, মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—কালো মেঘের মত। সাবির মনে অমনি কোন জ্যোতিষ্কের ইঙ্গিতের মত কালো কামনার মেঘ ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছে। গারা বুকের প্রাচীর ছাপিয়ে উর্দ্ধ আকাশে উঠ্‌তে চাচ্ছে—

সে ভাবছে সাধুর কথা,—সাধু বিয়ে না করে তাকে সাঙ্গা করতে চায় বা সে সাধুর কথা ভাবতে ভাবতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল—বনের মাঝে উঠছেন সহসা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বটগা

*

ভোরের আলোয় দূর আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে—

বারান্দায় ঘুমন্ত সাবির নিরবয়ব দেহখানি স্পষ্টতর হয়েছে,—কালো মেঘের ত বৃক্ষশ্রেণী যেন সহসা আকৃতি নিয়ে জেগে উঠেছে। পাখী তখনও ডাকেনি —ভোরের তারা নিষ্প্রভ হ'য়ে বিলীয়মান হয়েছে। ওরা এসে ডাকলে,—

ও সাবি, উঠ্, মোয়া কুড়োবেক নাই—

সাবি ধড়মড় করে উঠে বসলো। সে বললো,—তরী, তু ?

—হ—বেলা হইছেন বটে—

ভোরের আর্দ্র বাতাসে সাবির নগ্ন দেহ শিরশির করে উঠলো ; সে উঠে বসে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে একটা ঝাঁকা আর তালপাতার কাঠির তৈরী ঝাঁটা বের করে নিয়ে আসলো। বললে,—চল্ চল্, শিগগির—

ওরা দুজন ছুটলো পাহাড়ের কোলে মৌয়া-গাছের দিকে। তখনও পথ স্পষ্ট দেখা যায় না, গাছের ডালে পাখীর ডানা-ঝাপটার শব্দ হচ্ছে, কিন্তু তারা ডাকেনি। পথের পাশ থেকে কি যেন একটা বন্যজন্তু হুড়মুড় করে চলে গেল। তরী ভীতভাবে বললে,—সাবি, বরা বটে—ডর লাগছে নাই—

সাবি বললে,—বরা কেনে, উ শশো হবেক। ভয় কিসের ?

বন্যবরাহ কিনা সে-বিষয়ে সাবিও নিশ্চিন্ত ছিল না, তবে তরীকে সাহস দিতে সে বললে—ওটা শশক মাত্র।

তাদের পায়ের নিচে শিশির-সিক্ত শুকনো ঘাস, পায়ের সঙ্গে তাই কুটোকাঁটা জড়িয়ে যাচ্ছিল ; তরী পা দুটো একটা জায়গায় মুছে নিয়ে বললে, —উই ডাঙ্গাটায় চল কেনে,—হোথা বেশী মৌয়া—

তারা এসে যখন মহুয়াগাছের তলায় পৌঁছল, তখনও মৌমাছি এসে পৌঁছয় নি। কিন্তু গাছের নিচে যে ফুল পড়েছে তা যথেষ্ট নয়। তারা ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁড় দিয়ে ফুলগুলি একত্রিত করতে লাগলো। তিন-চারটি তলা ঝেঁটিয়েও ঝুড়ি ভর্তি হল না। নিরাশ হ'য়ে তরী বললে,—মৌয়া ত এখনো হয়নি—ফুল ঝরলেক নাই—

—দু-তিনদিন বাদ ঝুরঝুর করে ঝরবেক, গাছটো দেখ কেনে, ফুল তেমনটি আসে নাই— সাবি পরিহাস করলে,—তুর মত আধা ফুটলেক বটি—

তরী বললে,—হ, তুর মত ফাট্‌লেক নাই বটে—

দুজনে হিহি করে হেসে উঠলো। সাবি ফুল-কুড়ানো শেষ করে মহুয়া-গাছের গোড়ার কাণ্ডটিতে ঠেস্ দিয়ে বসে পড়ল। তরী বললে,—বসলি কেনে রে ?

—বস্, বেলা উঠুক, ভালকুড়ির মাথাকে রোদ লাগলে দেখবি কেমন মজা—

—হ, তুর মনে রং লাগ্‌বেক বটে—

সাবি হঠাৎ বলে উঠলো,—তুর লাগলেক বটে,—সাধুকে তুর ভাল লাগলে বটে ?

—সাধু ত তুকে সাঙ্গা করবেক—

—না তুকে বিয়া করবেক—

তরী যেন তার বেদনার্ত্ত চোখ দুটি হঠাৎ সাবির দিকে মেলে ধরলো, তার পর ধীরে ধীরে বললে,—তুকে বলেছে···

সাবি বললো,—বল্‌বেক কেনে ; উ ত দেখতে লাগছি রোজ—

—হ, তাই তুকে বেগুনী খাওয়ালেক্—তুকে ভালবাসলেক্—

তরী সেদিন সাধুর পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করেছিল,—সেই পক্ষপাতিত্বের অন্তরালে সাধুর যে দুর্ব্বলতা ছিল তাকে অনুভব করেছিল। তার কিশোরী বুকের মাঝে যদি কোন ক্ষীণ আলো জেগে থাকে তবে তা প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছে তাই তরী এই উপহাসে হাসে নি, ব্যথিত হ'য়েছে—

—মোর ত মুনিষ রইছে, তু বিয়া কর কেনে—

—বিয়া করবেক নাই,—ভালবাসা লেই তার বিয়া কিসের—

তরী ছেলেমানুষ, তার মনের দুর্ব্বলতা সাবির কাছে হাতে-হাতে ধরা পড়ে গেল। সাবি তাই চুপ করে রইল, পরিহাস আর করলো না।

দিনের প্রথম সোনালী আলো পড়েছে ভালকুড়ি পাহাড়ের শীর্ষদেশের আমলকী গাছে,—শিশির-ভেজা পাতায় তরল সোনার রং লেগেছে,—পলাশ আর শিমুলের ফুলে যেন আগুন লেগেছে। সাবি সেই গলিত স্বর্ণের প্লাবন দেখছিল তাকিয়ে তাকিয়ে—কিশোরী তরী তাকিয়ে ছিল সাবির মুখের পানে।

তরী বললে,—চল্, ঘরকে যাই—

সাবি বললে,—চল—

তারা মহুয়া-ফুলের ঝুড়ি মাথায় করে নিল,—ফুলের গন্ধে দু'একটি মৌমাছি এসে গেছে ঝুড়িতে।

হঠাৎ তারা শুনলে একটা পদশব্দ, তার পরে গুণগুণ করে একটা গান—কারা যেন এদিকেই আসছে। সাবি ও তরী ধীরে ধীরে চলতে লাগলো—

পিছন থেকে লগেন ডাকলো,—তরী, সাবি,—দাঁড়া কেনে, মোরাও ঘরকে যাবেক—

ওরা ফিরে দেখে তারা পরিপূর্ণ মৌয়ার ঝুড়ি নিয়ে আসছে পিছন পিছন। ওরা অবাক হ'য়ে গেল, এত ফুল ওরা কোথায় পেল! সাবি বললে,—এতে মৌয়া কোথা পেলি ?

—বলবেক নাই।— সাধু বললে।

লগেন বললে,—তুরা পারবেক নাই, উ পাহাড়ের উ বগলে,—

—মৌয়া ফুটলেক খুব ?

—হ, তুর মত ফুটলে।— সাধু হিহি করে হাসতে আরম্ভ করলে। সাবি রেগে বললে,—উ বলবি না। তুর ভাল হবেক নাই—

—বড় ভাল করতে লেগেছে,—কি মন্দটা আর করবেক বল্ না—

লগেন বললে,—সাবি, বড় মন্দটাই করলি বটে—সাধু ত পাগল হবেক রে!

—কিসের তরে ?

—তুর তরে ?

তরী শুনছিল কথা, সে ধীরে চলতে সুরু করলো। সাধু বললে,—উ তরী, চলছিস্ বটে—

—কি করবেক ? তুর আশনাই শুনবেক—

—তু আয় না কেনে, আশনাই করবেক—

তারা চলতে সুরু করলো। তখন দূরের চক্রবালের উপরে সূর্য্য রক্তিম হ'য়ে উঠেছে। পথের ধারে কিসের একটা বুনো লতায় সাদা ফুল গুচ্ছ গুচ্ছ ফুটে রয়েছে। সাধু আর লগেন একসঙ্গে ফুলের গুচ্ছ তুলে নিয়ে বললে,—দাঁড়া কেনে তুরা—

—কেনে ?—সাবি আয়— তরী বললে।

সাধু ফুলের গুচ্ছ নিয়ে সাবি আর তরীর খোঁপায় গু'জে দিলে। সাবি হাসলো, তরী ফুল খুলে নিয়ে দূরে ফেলে দিলে। সাধু বললে,—উঃ মোর ফুল লিবেক নাই, লগেনদা তু দে—

লগেন বললে,—দাঁড়া তরী, ফুল গুঁজে দি কেনে—

তরী তাদের কথায় কর্ণপাত না করে আগে আগে চলতে লাগলো। সাধু তার কারণটা অনুমান করতে পারলে না বটে, তবে সাবি সবটাই বুঝেছিল। মেয়েদের এই বুদ্ধিটা স্বভাবজাত। সাবি তাই বললে,—তরী তুকে ভালবাসে রে সাধু—

—হ, ভালবাসছে বটে—

লগেন বললে,—উঃ। তুর কাজটো কি! তরীকে বিয়া কর, সাবিকে সাঙ্গা কর। যা দুটো কামিন লিয়ে ধান পুঁতবি—

সাধু হেসে উঠলো। সাবি তার সরু কোমরে হাত রেখে দ্রুত চলতে আরম্ভ করলো।

*

এই এদের জীবন,—ভালকুড়ি পাহাড়, এই জঙ্গল-মাঠ-কান্দোড় তাদের জীবনের অঙ্গীভূত। এই মাঠের হাওয়া—এই আকাশের রোদ তাদের সঙ্গী, তাদের জীবনপ্রবাহকে প্রবহমান রেখেছে। এ বিনা এরা যেন জানে না চলতে। এর থেকে দূরে গেলে যেন জীবন-প্রবাহ্ থেমে যায় সহসা। এদের জীবনের বড় বিলাস—হাটে যাওয়া, কখনও। কখনও মেলায় যাওয়া,—সেখানে সুরাপান করে এক-দুইদিন হৈ-হুল্লোড় করা। এ সমাজে এর বাধা নেই।

গাছে গাছে প্রচুর মহুয়া ফুটেছে,—নিত্য সকালে তারা ফুল কুড়িয়ে নিয়ে আসে। রোদে শুকিয়ে সঞ্চিত করে গৃহে। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে বর্ষার জন্যে, এখন বনের শুকনো পাতা সংগ্রহ করে ধান সিদ্ধ ও রান্না করে। শুকনো শাল, পলাশ আর মহুয়ার রলা এরা ভেঙে নিয়ে এসে গোহালের মাচায় রেখে দেয়—

শালপাতা ভাঙবার সাহস সাবির আর নেই। আবার যদি গার্ডবাবু ধরে! কিন্তু শালপাতা-তৈরী তাদের একটা চিরন্তন ব্যবসা,—না চললে, সংসারও অচল। সরকার পাতা ভাঙতে নিষেধ করেছে, কিন্তু প্রয়োজন সে-নিষেধ মানতে চায় না। সাবির মা তাই বললে,—রবিবারের হাট্‌কে পাতা লিবি না—

—পাতা ভাঙ্গতে দিলেক নাই যে!

—হু, দিলেক নাই!

সাধু খবর এনে দিল গার্ডবাবুরা বেলা দ্বিপ্রহরের পরে খেতে যায়, আর বনে আসে না। এ সংবাদটা সাবির মা সংগ্রহ করেছিল। তাই সাবিকে বললে, —তিন পহর বাদ্‌কে যাবি, গাডবাবু ত খেতে যাবেক, আর আসবেক নাই।

—তু জানছিস্,—

—হ, জানছি, সাধু বল্‌লেক—

—বটে!

—হু।

শালপাতা তৈরী করে বিক্রি না করলে তাদের চলে না। সাধুদের জমি আছে, তারা অবস্থাপন্ন; তাদের চলে। কিন্তু সাবিরা গরীব। সাধুর মা একা সংসার রক্ষা করতে সময় পায় না, পাতা-তৈরীর অবসর তার নেই—প্রয়োজনও নেই।

সাবি ঠিক করলো, অপরাহ্নে বনে যাবে, অতি সংগোপনে পাতা সংগ্রহ করে আনবে।

পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য

অপরাহ্নে ফাল্গুনের খররৌদ্র স্তিমিত হয়ে এসেছে—ভালকুড়ি পাহাড়ের ছায়া দীর্ঘতর হ'য়ে পূবের মাঠের অনেকখানি উত্তপ্ত পাংশু মৃত্তিকাকে কথঞ্চিত শীতল করেছে। ছায়াঘন সেই পাদদেশের শালগাছগুলি ছোট,—এক সময়ে শালের রলা কেটে বিক্রি হ'য়েছিল। এখন সেই সমস্ত মূল ও কাণ্ড থেকে নতুন গাছ বেরিয়েছে—পাতা ছোট হলেও, ভাল। স্থানটাও নিরাপদ—লোকজনের পায়ের শব্দ পেলে, মাঠের দিকে নেমে সোজা জগৎপুরের ডাঙায় চলে যাওয়া যায়—বন ঘনসন্নিবিষ্ট নয়, মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা। একঝুড়ি পাতা সংগ্রহ করতে সময় লাগবে অনেক—

সাবি নিঃশব্দে এসে পাতা ভাঙছিল—শঙ্কাকুল হরিণীর মত। জীবিকার জন্যে এই চুরি আজ একান্ত অপরিহার্য্য হ'য়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক দেখছিল,—বনটা এক-মানুষের গলা পর্য্যন্ত, মানুষ এলে দেখা যাবেই—

ঝুড়িটার অর্দ্ধেক বোঝাই না হ'তেই সূর্য্য ভালকুড়ি পাহাড়ের আড়ালে অস্তমিত হ'য়ে উঠলো। পাহাড়ের পাদদেশে ধীরে ধীরে অন্ধকার তার কালো পাখা মেলে নেমে এল,—তখনও দূরের মাঠে জগৎপুরের ডাঙায়, বটগাছের মাথায় সোনালী আলো।

সাবি চম্‌কে উঠলো, কি যেন একটা মাঠের দিক থেকে ছুটে এসে বনে ঢুকলো—একটা শশক পাহাড়ের মাঝে তার গৃহে ফিরে এল। সুন্দর শুভ্র ভীরু পশু—

জন্মাবধি ভালকুড়ি পাহাড়ে সে আসছে, কিন্তু আজকার মত এমন ভীত চঞ্চল হয়নি সে কখনও। থেকে থেকে সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল—যেন অশরীরী কে একটা তার পিছু নিয়েছে আজ—

হঠাৎ দেখে, কে একজন তার দিকে আসছে—সাবি ভয়ে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। মানুষটি নিকটবর্ত্তী হতেই সাবি চিনলে—সাধু।

সাধু বললো,—হারে সাবি, পাতা ভাঙ্গা করলেক ?

—ভাঙ্গচি বটে,—ঝুড়িটো ত ভরলেক নাই—

সাধু অত্যন্ত কাছে এসে দাঁড়ালো ;—সাবি বিস্মিত দৃষ্টি মেলে বললে,—তু হেথা এলি কেনে ? সাধু তার হাতখানা খপ্‌ করে ধরে ফেলে বললে,—তুর তরে। তু বল, সাবি, মোকে ভালবাসবি—তুর তরে মু যে ঘরছাড়া হলেক—

সাবি বললে,—মু কি করলেক ? তুকে ডাকছি বটে—

—ডাকছিস্, চার হাতকে ডাকছিস্—

সাধু হঠাৎ সাবিকে টেনে এনে বুকের মাঝে চেপে ধরে বললে,—তু বল সাঙ্গা করবি?

সাবির সমস্ত দেহ যেন বিরাট সরীসৃপে ধীরে ধীরে গিলছিল, পায়ের থেকে একটা অব্যক্ত কম্পন, একটা অপূর্ব্ব শিহরণ সমস্ত দেহকে বিবশ করে দিয়েছিল সাপের বিষের মত। সে প্রতিবাদ করলে না, চোখ বুজে কেবল বললে,—মোর ছাড় হলেক নি, মনিষ ছাড় করলেক নাই, সাধু—কেমনে তুকে সাঙ্গা করি?

সাধুর উষ্ণ রক্তস্রোত পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ছুটোছুটি করে তার দেহের উত্তাপ বাড়িয়ে দিয়েছে—সাবির বিবশ দেহের ভার তার দেহের স্পন্দনকে উন্মত্ত করে তুলেছে। সে মাতালের মত বললে,—তু সাঙ্গা করবি বল কেনে? ভালবাসলি বল কেনে—ছাড় মু করিয়ে লিবেক। সাবি সাবি—বল কেনে—

উন্মত্ত সাধু প্রলাপ বকতে সুরু করল বিবশ সাবির কানে কানে।

ক্ষুদ্র এতটুকু বীজ মাটীতে পড়ে, তার পরে তা অঙ্কুরিত হ'য়ে অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে আলো-বাতাসের দিকে হাত পা মেলে জাগতে থাকে, উঠতে থাকে উর্দ্ধে। সৃষ্টি হয় মহীরুহ, বিরাট বটবৃক্ষ। আবার যুগ-যুগান্ত পৃথিবীর আলোয় দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়,—সৃষ্টির প্রেরণা থেমে যায়, অনন্ত জিজ্ঞাসা নিভে আসে। সে হাত গুটিয়ে স্থবির হ'য়ে যায়। মানুষ এমনি করে অনন্ত ক্ষুধা অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে ধরণীর বুকে চোখ মেলে দাঁড়ায়,—দু'হাতে ছেলেমানুষের মত পৃথিবীকে ধরতে চায়, বিরাট পৃথ্বীর বুক চিরে দেখতে চায় তার মাঝে কোন্ রহস্য রয়েছে,—পৈশাচিক উন্মাদনা নিয়ে সে বুক চিরে দেখে,—তারা পৃথিবীর বুক চিরে নিয়ে আসে খনিজ দ্রব্য,—নগর সৃষ্টি করে। শিশুর মত দু'হাতে পুতুলকে নেড়ে, চেটে চুষে পান করে তার সৌন্দর্য্য, তার পরে পুতুল যায় ভেঙে, শিশু কেঁদে ওঠে তারস্বরে, ভাঙা পুতুলের দিকে চেয়ে। হয়ত একদিন মানুষও ইমারৎ-অট্টালিকাময় পৃথিবীর দিকে চেয়ে হা-হা করে কেঁদে উঠবে,—মনে হবে, এ ভাঙা পুতুল। সে নিজেই তার বুক চিরে দেখতে গিয়ে তাকে ভেঙে দিয়েছে—শিশুর মত কাঁদবে সে—

সাধু হঠাৎ চেয়ে দেখে সাবি ভাঙা পুতুলের মত তার বুকের মাঝে জড়ের মত নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে। তার দেহে যেন স্পন্দন নেই। সাধু বললে,—সাবি, বাড়ীকে যাবি না—

সাবি জবাব দিল না।

সাধু আবার বল্লে,—সাবি বাড়ীকে যাবি না—

তখন বনানীর অন্তরালে নীরন্ধ্র অন্ধকার বাসা বেঁধেছে, শুধু পাহাড়ের উপরের আকাশটুকু রক্তিম আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

সাবি ধীরে ধীরে বললে,—চল্, ঝুড়িটা মাথাকে তুলে দে—

সাধু অর্দ্ধপূর্ণ ঝুড়িটা মাথায় তুলে দিয়ে বললে,—আয়, ডর কি?

সাবি নিঃশব্দে সাধুর পিছন পিছন ঘোড়ামারার পথ ধরলো—সাধু পথে আর কিছু বলেনি, সে আগে আগে চলেছে নির্ব্বাক ভাবে, সাবি পিছনে চলেছে নিঃশব্দে—

গাঁয়ের মাঝে বটতলায় এসে সাধু বললে,—যা ঘরকে—

সাবি ভিন্ন-রাস্তা ধরে গৃহে ফিরে এসে দেখে সন্ধ্যাদীপ জ্বালবার সময় হয়েছে। তার মা গরুটাকে বেঁধেছে, মুর্গীগুলো নিজেরাই ঘরে ঢুকেছে—

সাবি পাতার ঝুড়ি নামিয়ে রেখে ডাকলে,—মা, দীপ জ্বালাস নি—

*

সন্ধ্যার পরে সাধুর গৃহপ্রাঙ্গণে মাদলের বাজনা সুরু হল—

সাধু ডাকলো সাবিকে তাদের ওখানে নৈশ-উৎসবে যোগ দিতে—সাবি বললে,—তু যা, সাধু। খাওয়া করে মু যাবেক—

খেয়ে উঠে সাবি বললে,—মা, তু ঘুমা কেনে,—সাধু গান করতে ডাক্‌লেক—

—না, মু হেথা বারান্দাকেই থাকবো বটে—

সাধুর গৃহপ্রাঙ্গণে তুষে কেরোসিন দিয়ে একটা আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাধু আর মতি দুজন মাদল বাজাতে সুরু করেছে, লগেন একটা সুরের যন্ত্র বাজাচ্ছে, পাড়ার তরী প্রভৃতি যুবতীগণ সমবেত হয়েছে। সাবি যেতেই মাদলে বড় বড় আঘাত দিয়ে সাধু এগিয়ে এল—

নাচ সুরু হল,—তার ফাঁকে ফাঁকে পচুই-পান চলতে লাগলো—

রাত্রি প্রহরেক পরে আলো জ্বলে জ্বলে নিঃশেষিত হল,—মাদকের উত্তেজনা অবসাদে পরিণত হল—গানের সুর ক্ষীণ হল, মাদলের বাজনা মন্থর হল—

সাবি বললে,—চল্, ঘরকে যাই—

সাধু মাদল নিয়ে শুয়ে পড়েছে। কেউ জবাব দিল না। তরী শুধু বললে,—সাধু তুর সঙ্গে যাবেক? উ-ত পড়েছে রে আজ—

—তু চল কেনে, তরী—

—চল্,—

আজ তরী সাবির সঙ্গে আসলো এগিয়ে দিতে, কিন্তু সে একা যাবে কি করে, সে-কথা সে ভাবেনি। সাবি বললে,—তু যাবি একলাটি কি করে, তরী—

—মু, যাবেক—ডর কি ? গাঁয়ের বাট বটে—

তরী আসতে আসতে হঠাৎ সাবির হাতটা ধরে বললে,—সাবি, তু সাধুকে সাঙ্গা কর কেনে ?

—কেনে, তু বিয়া কর কেনে,—মু সাঙ্গা করবে কেনে, মোর মনিষ ত রইছে—

তরী বললে,—উ ত বিয়া করবেক নাই, সাঙ্গা করবেক তুকে—

সাবি সস্নেহে তরীর হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে বললে,—তু সাধুকে ভালবাসলি বটে !

—হ, ভালবাসছি—

—হ, ভালবাসলি বটে, মু জানছি ! তা বিয়া কর কেনে ?

তরী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। কোন কথা বললে না। সাবি বললে,—মতি তুকে বিয়া করবেক বললে—

—উ ত বলছে বটে—

সাবি হিহি করে হেসে উঠলো, তরীর মনের কথা সুস্পষ্ট সে বুঝে ফেলেছে। সে সাধুকে বিবাহ করতে চায়, যদি সাবি তাকে সাঙ্গা না করে—

তরী হঠাৎ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুট দিল অন্ধকার গাঁয়ের পথে—সাবি আপন মনে হেসে চলে এল—

মহুয়ার ফুল থেকে ফল হ'য়েছে,—সে ফল ছাড়িয়ে নিয়ে হাটে বিক্রি করা যায়—সেও একটা ব্যবসা। শিবরাত্রি এসে পড়েছে, বক্রেশ্বরে বিরাট মেলা। একমাস কাল সে মেলা থাকে, দূর দূর দেশ থেকে লোক আসে। এতদ্দেশে এর চেয়ে বড় মেলা আর নেই—গান, সারকাস্, ম্যাজিক, তর্জ্জা, লেটো, ঝুমুরী সর্ব্বপ্রকারের গান ও আমোদ আমদানী হয়। প্রচুর দোকানপাট,—এক-মাইল ব্যাপী স্থান নিয়ে মেলা বসে। ওদিকে বক্রেশ্বর নদীর ধার, এদিকে ডাঙা—দেশ-বিদেশের গরুর গাড়ীতে মাঠ ঘাট আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়।

মেলায় যাওয়া এবং দু'একদিন নিরঙ্কুশ জীবন যাপন করা এদেশের লোকের একটা বিরাট এবং অপরিহার্য্য ব্যসন। কেহ জুয়া খেলে, কেহ গান শুনে, কেহ মদ খায়,—দেশ-বিদেশের লোকের সমাগমে স্থানটি বিচিত্র হ'য়ে ওঠে—

সাধু সেদিন সহসা প্রস্তাব করলে,—সাবি বক্কেশ্বর মেলাকে যাবি ?

সাবি বললে,—টাকা কোথা ?

—কেনে, কত টাকা লাগছে বটে !

সাবির মা প্রশ্ন করলো,—কে কে তুরা যাচ্ছিস্ বটে ?

—মু, লগেন, তরী, মণি, কামিনী, উপাড়ার কালী ধাওড়, তার বৌ, হরির বেটী, উর নামটা বাসিনী,—কেতে লোক যাবেক—

সাবি বললে,—মোর ত টাকা নেই রে সাধু—

—কেতে টাকা, লাগবেক বল কেনে—

সাবির মার ইচ্ছা ছিল, এমনি মেলায় যাওয়া, একত্র কাজ করার ফাঁকে যদি সাধুর সঙ্গে সাবির প্রণয় জন্মে এবং সাঙ্গা হয় তবে ওর একটা বোঝা নেমে যায়। নিটোল-যৌবনা সাবির দিকে চেয়ে মায়ের মন বেদনায় ফেটে পড়ে। সাবির মা তাই বললে,—যা কেনে মেলাকে—বক্কেশ্বরকে ঠাকুর রইছেন—জাগ্‌গত। সাতটা কুণ্ডু রইচেন—পাপহরা গঙ্গা রইচেন—

সাবি বললে,—অনেক দূর বটে—

—কেতে দূর? আট কোশ হবেক, উ ত দু'পহরকে যাওয়া করবেক—চল কেনে? মোর ত টাকা রইচেন—

সাবি বললে,—মা ত বুড়া হইছে—গরু রইছে, মুর্গী রইছে—

সাবির মা বললে,—উঃ ত মু দেখছি বটে—উর তরে ভাবনাটা কি?

ইউরোপীয় দেশের মত তরুণ-তরুণীর সমাবেশের মাঝে পূর্ব্বরাগের পালা উদ্‌যাপন করাটা এই বাউরীদের প্রথা। মেলায় এমনি যুবক-যুবতীর যাওয়া সমাজে নিষিদ্ধ নয়, বরং সেটা সামাজিক প্রথা। এই নৈকট্যের মাঝেই প্রণয় জন্মে—প্রণয় থেকেই পরিণয় হয় এবং ভাঙে। সাবির ভয় করেনি; সাবি স্বাধীন, সে জানে সাধু বা কোন পুরুষেরই সাধ্য নাই—তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছাকে চাপিয়ে দিতে পারে। চিরাচরিত এই মেলামেশার মাঝ দিয়েই তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সুরু হয়, আর্য্যযুগ থেকেই হয়ত এমনি চলেছে তাদেব সমাজে—

উপস্থিত সমাজের এমনি প্রথা নতুন করে চলতে সুরু করেছে, তবে সেখানে তরুণীরা সাবির মত স্বাধীন নয়, এমনি করে প্রকৃতির কোলে স্বাভাবিক ভাবে তারা বেড়ে ওঠেনি। নিরুদ্ধ পৃথিবীর কৃত্রিমতার মাঝে যারা বড় হ'য়েছে তারা আত্মরক্ষা করতে শেখেনি—তাই সেখানে পদস্খলনের সম্ভাবনা আছে,—সাবিদের সমাজে এটা নিতান্তই স্বাভাবিক, সেখানে স্খলন-পতনের প্রশ্ন নেই; তারা সতীত্বের মুখোস পরে ভালবাসেনা,—তাদের জীবন নগ্ন, মনও নগ্ন। এ নগ্নতাকে তারা ক্ষমা করে বয়সের ধর্ম্ম ব'লে, যেমন ইউরোপীয় দেশে করে। দেহের পবিত্রতার প্রতি সন্দেহ করে বিবাহের সময় ফিরে আসে না। তারা বিবাহ করে, প্রয়োজনবোধে 'ছাড়' করে, পুনরায় সাঙ্গা করে—তার জন্যে

উদাস পরিতাপ করে করে জীবনকে মৃতকল্প করে না—উদার আকাশের নীচে উন্মুক্ত তাদের জীবন।

সাবি অনেক ভেবে শেষে বললে,—কবে যাওয়া করবি—

—পরশু, সোমবারকে। চাল দু'সের আর মুড়ি দু'সের লিবি, নুন লঙ্কা লিবি—ব্যস। মেলাকে ত সবই মিলছে। মিঠাই পাপড় সবই মিলছে বটে—

অতএব স্থির হল সোমবার প্রত্যুষে তারা বক্রেশ্বরের মেলায় যাবে।

*

সোমবার প্রত্যুষে সকলে বক্রেশ্বর যাবার জন্য প্রস্তুত হল—দু'দলে তারা যাবে। একদল আগেই বেরিয়ে পড়েছে—তারা ও-পাড়ার। এ দলে যাবে সাবি, তরী, নগেন, সাধু, কামিনী—এরা। কিছু বস্ত্র, চাউল-মুড়ি নুন-লঙ্কা দিয়ে তারা নিজস্ব পুঁটুলি বেঁধেছে।

ভোররাত্রি থেকে ডাকা-ডাকি হাঁকাহাঁকি চলেছে তৈরী হতে কিছু সময় গেল। তারপর সূর্য্যের প্রথম রক্তিমাভা যখন ভালকুড়ির শীর্ষদেশের আমলকী গাছগুলোকে আরক্তিম করে দিল তখন তারা রওনা দিল,—জগৎপুরের ডাঙা দিয়ে, কাঁকুড়গাছি ডাইনে রেখে তারা যাবে লাউবেড়ের ডাঙায়—সেখানে তারা সকালের খাবার খেয়ে আবার চলবে—

শিবরাত্রি চলে গেছে,—কিন্তু মেলাটা তারপরেও প্রায় একমাস থাকে। ফাগুনের রোদের মিষ্টতা নেই, রোদ সকালেই প্রখর হয়ে উঠেছে। ওরা সারি দিয়ে চলেছে, সাধু লগেনের হাতে পাকা বাঁশের লাঠি, মাথায় কাপড়ে বাঁধা এক-একটা পোঁটলা, সাবিদের মাথায় শুধু পোঁটলা—তারা দু'হাত দুলিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে—এমনি বহু লোক মেলায় যায়। ফিরতি লোকের সঙ্গেও পথে দেখা হ'ল। তারা বলে গেল,—মেলা খুব জমেছে এবার, নতুন সব খেলা এসেছে—জুয়া চলছে যথেষ্ট—

কয়েক ক্রোশ চলতে বেলা বেড়ে উঠলো,—রোদ তপ্ত হয়ে উঠেছে, পথের বালি-কাঁকর উত্তপ্ত হ'য়েছে। তাদের সামনে এখন একটা ধূসর ঊষর মাঠ, তৃণ শুষ্ক হ'য়ে বিবর্ণ হ'য়েছে—কেবল কাঁন্দোড়ের পাশে দেখা যায় একটা সবুজ ঘাসের রেখা। গরুগুলো পাথর চেটে ক্ষুধা-নিবৃত্তির চেষ্টা করছে—

লগেন দূরের ডাঙাটির দিকে চেয়ে দেখলে সেখানে একটা বিরাট বটগাছ। সে বললে,—উ লাউবেড়ের বটগাছটো লয় রে, সাধু—

—হ বটে—

—হোথা ত ভাল দোকান রইছেন—

অর্থাৎ ওখানে ভাল পচুই-মদের দোকান আছে। সাধু বললে,—হ, দোকান ত রইছে বটে।

নগেন বললে,—হোথা জিরিয়ে খেয়ে লি—

—হ, চল কেনে,—উ বটতলায় খেয়ে লিবে—

গ্রামের বাইরে ডাঙার উপরে একটা বটবৃক্ষের তলায় লাউবেড়ের মদশাল। খড় আর তালপাতায় ছাউনি ঘরে—সামনে বটতলার পরিষ্কার প্রাঙ্গণ, সেখানে ইতস্ততঃ কতকগুলি পাথর পড়ে আছে। ক্রেতাগণ এই পাথরে বসে রস পান করে। মদশালের বারান্দায়ও সামান্য একটু জায়গা আছে, তার কোণে কয়েকখানা ভাঙা মোড়া রয়েছে সম্মানিত অতিথির জন্যে। সকালের দিকে তেমন ক্রেতার ভিড় হয় না, বৈকালেই লোক আসে বেশী।

সাধু নগেন সকলে এসে বটতলায় তাদের পুঁটলি নামিয়ে বসে পড়লো। নগেনের বৌ দাসী একটু বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, সে পাথরটাকে বটগাছের কাছে নিয়ে গিয়ে হেলান দিয়ে বসলো। বারান্দায় মোড়ার উপর বসে ছিল একটি বৃদ্ধ। সে নেশায় বুঁদ হ'য়ে বসে চুটি খাচ্ছিল। চুটি কেবলই নিভে যাচ্ছে আর সে চকমকি ঠুকে তাকে ধরাচ্ছিল—

বৃদ্ধ দন্তহীন, জিহ্বা দিয়ে মুখে কেমন একটা শব্দ করে বললে,—কোথাকে যাবি তোরা

—নগেন বললে,—বক্রেশ্বর—

—হ, ডপকা কামিন নিয়ে মেলাকে যাবি? হোথাকে সাঙ্গা করবি—লয়—

বৃদ্ধ নেশার ঘোরে হেসে উঠল,—হ সেবার মু ত উ ডালিমকে লিয়ে গেলাম—কত মজা রইছেন হোথা, তা উ ডালিম সাঙ্গা করলেক নাই। খেয়ে লিয়ে, ফিতে কাঁটা, চুড়ি লিলে, তারপর সাঙ্গা করলে উ এককড়েকে—বড় খচ্চর বটে উ—

—মদের নেশায় জীবনের একটা বিষাদার্ত্ত অধ্যায়ের কথা সে উল্লেখ করে নিজেই হেসে উঠলো। তারপর টেনে টেনে চোখটাকে খুলে বললে,—উ বক্রেশ্বর যাবি? উ ত উই হোথা—

হঠাৎ সাবির দিকে চেয়ে বৃদ্ধ নড়ে-চড়ে বসলো, তার পর ভাল করে চেয়ে চেয়ে বললে,—উ জোয়ান কামিনটো কে বটে? কোথা ঘর তুদের—

সাধু জবাব দিলে,—উঃ ঘোড়ামারা, কামিনটো গাঁ'র বটে—

—হঁ, সাঙ্গা করবেক, তাই সেখানে লিয়ে চলেছিস্ হাঁরে জোয়ান?

—সাঙ্গা করবেক কিনা, কে জানছে ?

—করবেক, করবেক নাই কেনে ?

বৃদ্ধ আবার একটু চোখ বুঁজে চুটি টানলো। দোকানী বললে,—কতটুকু করে নিবি সব ?

সাধু বললে,—আধ সের দে—

পাশেই মুড়ি, পেঁয়াজী, বেগুনীর দোকান আছে, সে বললে,—বেগুনী খাবি না পেঁয়াজী খাবি ?

লগেন বললে,—বেগুন কোথা, ডিংলে দিবে। দে পেঁয়াজী দু'গণ্ডা—

সকলেই তাদের পোঁটলা থেকে এক একটা জামবাটী বের করে নিয়ে বসলো,—আধসের করে পচুই দোকানী তাতে ঢেলে দিল। ঘর থেকে আনা মুড়ি আর দু'গণ্ডা পেঁয়াজীর সঙ্গে তারা রস পান করলো। এটা তাদের জীবনের ব্যসন। পথ-চলার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

তখন বেলা বেড়েছে। রাস্তা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিশুষ্ক পাণ্ডর মাঠের তপ্ত হাওয়া বটগাছের ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে—গায়ে যেন সেঁক দিচ্ছে হাওয়ার। তখনও অত্যুষ্ণ হয়নি, তবে পথ-চলার পক্ষে সেটা খুব তৃপ্তিকর নয়।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ বাদে আবার তেমনি একটা শব্দ করে বললে,—বেশ বেশ, তিত্তস্তান, ডবকা কামিন নিয়ে যাচ্ছিস—মদ খেয়ে লে,—উ লোকপুরের জঙ্গলটা আছে হোথা ঘরবেক। সেবার পটলার মার সঙ্গে উ জঙ্গলেই রয়ে গেলুম সারা দুপুরটা— বৃদ্ধ হাসলে—

ক্ষণিক পরে চোখটা টেনে টেনে বললে,—উ জোয়ান কামিনটো তুর বটে ?

সাধু কহিল,—গাঁয়ের বটে ?

—হ—হ, সাঙ্গার তরে মেলায় লিয়ে চলেছিস্ ? হ—অমনি কত লিয়ে গেছি জোয়ান কালে— তরীর কিশোরী দেহের পানে চেয়ে বৃদ্ধ বললে,—উ কে বট ?

লগেন বললে,—উ গাঁয়ের বটে, ভাইঝি হল—

—হ—

বৃদ্ধ নেশার ঘোরে চোখ বুজলো। কি যেন নিজে নিজে বিড়বিড় করে বকলে, মুখের উপর মাছি এসে বসলো কিন্তু তা তাড়িয়ে দেওয়ার শক্তি বা ইচ্ছা তার নেই—

সাধু দোকানীকে প্রশ্ন করলে,—উ কে বট ?

—গাঁয়ের মোড়ল বটে,—হরেকিষ্ট বাউরী। পাঁচগেরামী মোড়ল বটে—

সাধু ও নগেন সমীহ সহকারে বৃদ্ধের দিকে একবার চেয়ে দেখলো—ওই বৃদ্ধ পাঁচ গ্রামের নেতা, কর্ণধার।

বৃদ্ধ নেশায় ঝিমিয়ে এসেছে ; চোখ খুলে সহসা বললে,—জোয়ান কামিনটার নাম কি রে ?

সাধু বললে,—সাবি—

—হু, সাবিত্রী ! হু বটে ! লোকপুরের জঙ্গলে পথ হারাসনি সাবি, ঐ জঙ্গল বড় খারাপ হবেক,—পথ হারালেক ত মরলেক।

বৃদ্ধ হেসে আর কি যেন বলল ঠিক বোঝা গেল না। তারপর আবার ঝিমিয়ে পড়ল।

খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে সাধুরা উঠলো। পুঁটুলির মাঝে লাঠিটা গলিয়ে দিয়ে কাঁধে ফেলে সাধু বললে,—উঠ্ উঠ্—সব চল—বেলা পহরখানেক হল বটি—

সকলে উঠে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হল। মদশালের মালিক পয়সা মিটিয়ে নিলে, পেঁয়াজীর দোকানদার দাম নিলে। ওরা রওনা দিল—

দ্রব্যের ক্রিয়া সুরু হয়েছে, ওরা নিঃশব্দে পথ চল্‌তে সুরু করলো। নাকড়াকোন্দার স্কুল-ডাঙা পার হয়ে লোকপুরের জঙ্গলে প্রবেশ করল। শালবনটা পার হলে বারাবনী, তারপর আরও কয়েক ক্রোশ গেলে তবে বক্রেশ্বর। লোকপুরের জঙ্গলে বড় বড় শাল গাছ। রাস্তাটা ছায়াচ্ছন্ন। এখানে রোদের তাপ নেই, পরিষ্কার সুন্দর রাস্তা। মেলার থেকে ফিরতি গরুর গাড়ী আসছে, বড়লোকের বৌ-ঝিরা গাড়ীর থেকে উঁকি মেরে ওদের দেখছে—কেউ হয়ত বলছে,—আজ দোমহনীর তর্জ্জা হবে, চলে যা জোর পায়ে—

সাধু সহসা একটা শালগাছের তলায় পুঁটুলিটা ফেলে বসে পড়ল। লগেন বললে,—কি রে সাধু, হেথা বসলি কেনে ?

—বস্ লগেনদা, ঠাণ্ডায় একটু জিরোবেক নাই। সাবি-তরীর কষ্ট হবেক নাই এতোদূর হাটতে—

সাবি বললে,—হু, এখুনি জিরোবে কেনে ? কেতে পথ রইছে—

সাধু সাবির হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে বললে,—বোস্ হেথাকে। শীতল হয়ে লিয়ে যাওয়া করবেক—

সকলে ছায়াশীতল পথের প্রান্তে শুষ্ক তৃণের উপর বসল। সাধুর নেশা বেশ হ'য়েছে, সে সাবিকে কাছে টেনে এনে বসালো। সাবি বললে,—উ, কি করছিস্, সাধু ?

—তু মোর কাছটিতে বস্ কেনে, শীতল হবেক। তু কি করবি, সাবি—

সাবি লজ্জিতভাবে বললে,—মেলাকে যাবেক—এতগুলি লোকের সামনে সাধুর এই প্রশ্ন তাকে বিব্রত করেছিল। তরী একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওদের দিকে। সাবি ডাকলো,—তরী এ-ধারকে আয় তু—

—কেনে ? তু শীতল কর কেনে,—মোর দেহে আগুনের আঁচ রইছে বটে, উ সাধু ডরাবেক—

দাসু এতক্ষণ নীরবেই ছিল, কিন্তু সে আর কথা না বলে থাকতে পারলো না। সে বললে,—উ দখিনে সাবি শীতল করবেক, তু যা কেনে উত্তরে গরম করবি—

লগেন হিহি করে হেসে উঠল এই পরিহাসে। লগেন বললে,—হ, তরীকে বিয়া কর, সাবিকে সাঙ্গা কর—

সকলেই হেসে উঠল। সাধু হাসতে হাসতে গায়ে ঢলে পড়ে মাতালের ভঙ্গিতে বললে,—শুনছিস্ সাবি ? বিয়া করবেক তরীকে, সাঙ্গা করবেক তুকে—

সাবি বললে,—যা, তুর নেশা হইছে বটে—

সাধু নির্লজ্জের মত বললে,—পয়সা দিয়ে মদ খাওয়া করলেক, নেশা হবেক নাই—

সাধু চুটি বের করে চকমকি ঠুকে ধরালে, তার পর সাবিকে দিয়ে বললে,—লে, খেয়ে লিয়ে তরীকে দিবি,—উ ত মোরই বটে—

লগেন বললে,—হ তুরই বটে।

তরী ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত বললে,—মু যাবেক নাই, ঘরকে ফিরে যাবেক—

সাধু বললে,—কেনে রে ? তু বিয়া করবি না ?

তরী মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল, সে সাধুর দিকে ফিরেও চাইল না।

*

বক্রেশ্বরের মেলায় তারা যখন এসে পৌঁছল তখন বেলা সামান্যই আছে। মেলার অদূরে একটা মহুয়া গাছের অনিবিড় ছায়ায় তারা তাদের আস্তানা ঠিক করে নিয়ে পোঁটলা খুলে চাদর বিছিয়ে নিল। এই বৃক্ষতলেই তারা যাপন করবে তাদের প্রবাসকাল।

একে একে তারা পাপহরা গঙ্গার কবোষ্ণ জলে স্নান সেরে এল। মেলায় নতুন হাঁড়ি পাওয়া যায়, চাঁদা করে তার একটা কিনে তাতেই ঘরের চাল ডাল চাপিয়ে দিলে। পথে প্রবাসে সহজ খাদ্য এই, সহজ পাচ্য এবং সংক্ষেপ। শালপাতা কিনলে একশো—তাতে কোনমতে খাওয়া সেরে নিলে।

আহারান্তে সকলে মুখ হাত ধুয়ে তাদের গৃহে প্রস্তুত চুটি ধরালে, এখন মেলা দেখতে যাবে তারা। সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, ক্রমেই লোকসমাগম বাড়ছে, নানাবিধ খেলা গান এখনি আরম্ভ হবে। উচ্চাবচ এই ভূমিটায় স্তরে স্তরে আলো জ্বলে উঠেছে। সাবি তরী ওরা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল—এত বড় মেলা তারা দেখেনি।

সারি সারি দোকান—মনিহারি, মিঠাই, লোহা, ফল সব-কিছুই আছে। কোথাও গ্যাসের আলো, কোথাও আধুনিক হ্যাজাক্-ডেলাইট জ্বলছে। পাঁপড়-ভাজা আর তেলেভাজার দোকানে ভীড় লেগে আছে, চা'র দোকানেও যথেষ্ট ভীড়। দোকানের মাঝে সংকীর্ণ পথে কত অজানা স্ত্রী-পুরুষের ভীড়। সাবি আর সাধু একসঙ্গে চলছিল, ওরা ছিটুকে পড়েছে ভীড়ে অন্যদিকে। কথা আছে—মেলা দেখে সকলে মহুয়াগাছের আশ্রয়ে তারা সমবেত হবে।

একটা তাঁবু পড়েছে, বাইরে একটা লোক সং সেজে নাচছে আর মাঝে মাঝে একটা আগুন খেয়ে সমবেত লোকজনকে অবাক করে দিচ্ছে। আর বলছে,—আসুন—দু'আনা—

ভিতরে তিন-চারটা ডেলাইট জ্বলছে। সাবির অপরিসীম কৌতূহল, ওর ভিতরে কি আছে? সাবি প্রশ্ন করলে,—সাধু, উর মাঝে কি রইছেন—

—উঃ খেলা। দু'আনা টিকিট, যাবি?

—দু' আ—না?

—হ, দেখবি সাবি, চল।

নিম্নতম টিকিট দু'আনা—সাধু দরদস্তুর করে দেখলে, কিন্তু তাদের দাম বাঁধা। অবশেষে দু'আনার টিকিট কিনেই তারা ভিতরে ঢুকে পড়লো। মাটিতে খড় বিছানো, সেইটেই দু'আনার আসন। তারা খড়ের উপর বসে সবিস্ময়ে চারিদিকের ঐশ্বর্য্য দেখছিল—

গৃহ পূর্ণ হ'লে খেলা আরম্ভ হ'ল। নারী-পুরুষ মিলে বহু বিচিত্র খেলা দেখালে। তারের উপর দিয়ে হাঁটলো,—ছোরা নিয়ে খেললো। শূন্যে দোল খেলে—সাবি রুদ্ধনিশ্বাসে দেখলে। এমন সে কখনও দেখেনি—

খেলা ভাঙলে একটা পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে সাবি বেরিয়ে এল। বললে,—বড় মজা বটি! হাঁরে সাধু, উ সব কি করে করলে রে? অতবড় ছুরিটা গলার মাঝে, পেটকে দিলে কেমনে—

সাধু বললে,—উ সব মন্তর-তন্তর বটে। আমি কেমনে জানছি—তুকতাক করলেক, নজরবন্দী করলেক—

মেলার জনশ্রেণী মেঘনার স্রোতের মত উজান-ভাঁটি করছে, তারা সেই স্রোতে মিশে মানুষের ধাক্কায় ধাক্কায় চলছে। দোকানপাটের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে—তারা দেখবে, কিনবে না,—সে মূলধন তাদের নেই। সাবি তাই বিস্মিত দৃষ্টিতে মেলার সমারোহকে পান করছিল। সাধু তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে বললে,—রাত দু'পহর হলেক, সাবি, আয় চা-পাঁপড় খেয়ে লি—

গরম পাঁপড় আর চা খেলে তারা একটা নড়বড়ে ভাঙা বেঞ্চিতে বসে। ক্লান্তি অনেকটা কমলো,—সারাদিন হাঁটা, তার পর এই দু'পহর রাত্রি তারা মেলার এধার ওধার বানের জলে তৃণের মত ভেসে বেড়িয়েছে।

সাধু বললে,—সাবি, ওদিকে লেঠো হইছে বটে—তর্জ্জা রইছে বটে—

—চল কেনে—

সাবির ক্লান্তি নেই,—মেলার রহস্য দেখতে দেখতে সে অবাক হ'য়ে গেছে, এত বিচিত্র দ্রব্যের সমাহার সে দেখেনি কখনও একসঙ্গে। গ্রামের মাঠঘাট, বন-পাহাড় সে দেখেছে অনেক, কিন্তু এত উজ্জ্বলতা এত আকর্ষণ এত বিচিত্র লোকের সমাবেশ সে দেখেনি। বক্রেশ্বর নদীর দিকে একটা খোলা জায়গায় তর্জ্জা হচ্ছে, সেদিকে তারা যাচ্ছিল—হঠাৎ একটা গন্ধ তাদের নাকে গেল। তারা থম্‌কে দাঁড়ালো। এ গন্ধ তাদের জানা, জীবনের সঙ্গে জড়িত। সাধু বললে,—রস খাবি, সাবি—

—তু খা কেনে?

—তু খাবি না,—সারাটি দিন হাটলি বটে!

—চল,—

তারা প্রশ্ন করে সেখানে জানলে মদ—চোলাই-করা মদ পাওয়া যায়। এ পচুই নয়, খাঁটি দেশী মদ, মহুয়ার মদের মত। ওরা খানিকটা খেয়ে নিলে,—দেখতে দেখতে দেহে তার ক্রিয়া আরম্ভ হল। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে দেখে তেলেভাজার দোকান,—দু'গণ্ডা পেঁয়াজী কিনে খেয়ে নিলে। সাধু বললে,—হাঁরে সাবি, তরী লগেন দাসু উরা কোথা গেলে বটে?

—কে জানছে,—চল ডেরাকে যাই—উরা সব ঘুরছে লয়?

—হ, পয়সা দিয়ে রস খেলেক, এখুন ডেরাকে যেয়ে ঘুমুবেক—

পয়সা খরচ করে নেশা করেছে, এখন ঘুমিয়ে নেশার মজাটাকে নষ্ট করতে সাধু নারাজ। তারা একপায় দু'পায় মেলার প্রান্তে এসে পড়ল,—বাঁ দিকে ডেলাইট জ্বেলে তর্জ্জা হচ্ছে। ডাইনে নদীর প্রায় কিনারে, আমবৃক্ষের ঘন

ছায়ার মাঝে কয়েকটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলছিল,—দূর থেকে দেখা যায় কতকগুলি লোক প্রেতের মত অন্ধকারে কিলবিল করছে। সাবি বললে—উ, কি সাধু—

—হোথা ঝুমুরী বটে, যাবি ?

—চল কেনে—

—দেহে তখন দ্রব্যের ক্রিয়া আরম্ভ হ'য়েছে,—পায়ের নীচে মাটি দুলছে তাই পা ঠিক চলছে না। তারা অন্ধকারে পাথর-কাঁকরে ঠোকা খেতে খেতে সেই দিকেই চললো। সাবি বললে,—ঝুমুরী গানটা কি বটে—

—উ, জোয়ান কামিন সব লাচবেক, বাবুরা নেশা করে লাচবেক,—বড় মজা বটি। তু কামিন হোথা কামিন লাই—

—হ, চল কেনে, কে কি বলবেক—তু ত রইছিস্—

—উ ভাল লয়—

—কেনে ভাল লয়—

—কামিনরা রস খেয়ে লাচছে, বাবুরা ফুর্ত্তি করছে—যাবি ?—সাধুর সংশয় ছিল, কামনার এমনি উলঙ্গ প্রকাশ দেখতে যাওয়া সাবির পক্ষে হয়ত ঠিক হবে না। সাবি বললে,—চল কেনে—

ওরা কেরোসিনের আলো লক্ষ্য করে এসে উপস্থিত হল।

এখানে ভীড় ঘনীভূত। কয়েকটি শালের রলার সঙ্গে ছুঁমুখো কেরোসিনের লম্প মশালের মত জ্বলছে। মাঝখানে বসে আছে হারমোনিয়াম-বাদক ও ঢোলকওয়ালা, বাঁশী, জুড়ি। কয়েকটি তরুণী রঙীন কাপড় পরে, যথাসম্ভব সেজেগুজে নেচে নেচে গান করছে—আর ঘুরে বেড়াচ্ছে ভীড়ের প্রান্ত দিয়ে—

চারিপাশে নিবিড় অন্ধকার,—আকাশের তারার আলো আমবনের ছায়ায় এসে পৌঁছয়নি। আম্রছায়ার অন্ধকার নিবিড়তর, তারই মাঝে লম্পের আলো,—লোকের ভীড়ের প্রাচীরে বন্ধ। তার পিছনে অন্ধকার সূচিভেদ্য। সমুদ্রের গভীর তলদেশের নিরালোক তরল অন্ধকারের মধ্যে যেন এই জীবগুলি কেলি করে বেড়াচ্ছে। সেখানের কামনায় বিষবাষ্প পূতিগন্ধময় হ'য়ে আশ্রয় নিয়েছে—উলঙ্গ ব্যভিচার ও অভিচারের বন্যা বয়ে চলেছে নিঃশব্দ জনারণ্যে। মাতাল তরুণী নর্ত্তকীরা নাচছে, গান করছে—শ্রোতৃ বা দর্শকমণ্ডলী নেশার ঘোরে সংজ্ঞাহীন, রুচিবিকারহীন।

কালো কালো সুস্থ-সবল-দেহ নর্ত্তকীরা সজ্জিত, কিন্তু সে সজ্জার মধ্যে শালীনতা নেই, দেহকে বিবস্ত্র করে প্রকাশ করবার জন্যেই যেন তারা সবস্ত্র

হ'য়েছে। গান হচ্ছে। গানের অর্থ সরল ও প্রাঞ্জল, নগ্ন যৌন আবেদনের পঙ্কিলতায় অশ্রাব্য। নাচের প্রতিটি ভঙ্গির সঙ্গে সে-গানের পঙ্কিলতাকে মূর্ত্ত করে তুলেছে। নিঃসাড় শ্রোতৃমণ্ডলী মাথা নেড়ে তারিফ করছে—

সাবি আর সাধু অবাক বিস্ময়ে দেখছিল—তারা তরুণ, রক্তে তাদের আদিমকালের উত্তেজনা,—তারা এই পঙ্কিলতাকে পান করছিল সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে। মদের সঙ্গে মাদকতা এসে দেখা দিল। সাবি দেখছিল,—সাধুও দেখছিল। একটা দুর্ব্বার আকর্ষণ তাদের দুজনকে যেন টেনে রেখেছিল এই দৃশ্যের সামনে—যেমন করে ভ্রাম্যমাণ গ্রহকে সূর্য্য টেনে রেখেছে ভৌমাকর্ষণ দ্বারা।

চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার—স্বল্পালোকের আলোছায়ায় চলেছে কামনার উলঙ্গ প্রকাশ। আম্রকুঞ্জের অন্ধকারে কামনার লম্প জ্বালিয়ে এরা কাঞ্চন উপার্জ্জন করছে,—অস্পষ্ট প্রেতলোকের আলোছায়ায় যেন ভূতনৃত্য চলছে। যারা নাচছে, যারা বাজাচ্ছে, যারা শুনছে দেখছে সকলেই দ্রব্যগুণে পৃথিবীর আলোবাতাস সংস্কার ত্যাগ করে অতীতের অন্ধকারাচ্ছন্ন বিবস্ত্র আদম ও ঈভ-এর যুগে উপস্থিত হয়েছে—সেখানে জ্ঞানবৃক্ষের ফল নিষিদ্ধ।

সাবি দেখছিল—বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখদুটি মেলে ধরে। শ্রোতা একজন একটা আধুলি তুলে ধরে হাঁকলো,—ইদিকে, এ্যাই—ঝুমুরী—হায়—ইদিকে—বাক্য তার শ্লথ, অপ্রকাশিত। আবার ডাকলে,—আয়,—আয়···

ঝুমুরী নাচতে নাচতে এসে আধুলিটা সংগ্রহ করে নিয়ে গেল, এবং কাঞ্চনের বিনিময়ে সে দাতার আজ্ঞাগত দেহকে শিথিল করে স্পর্শময় করে দিল। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল আর-একজন—পাঁচটাকার নোট উঁচু ক'রে ধরে বললে,—ই—ইদিকে আয়, পাঁচটাকার নোট দেব—সুন্দরী—

নৃত্যপরা ঝুমুরী উপস্থিত হতেই বাবু তার হাত ধরে ভীড়ের ভেতর দিয়ে টেনে আম্রবৃক্ষের তলায় গভীর অন্ধকারে নিয়ে গেল—

বাকী ক'জন তরুণী নতুন গান ধরে নাচছে,—যারা বাইরে ছিল তারা এসে জুটেছে, সংখ্যায় তারা বেশীই হ'য়েছে এখন। গান চললো,—ঢোলকের দ্রুত তালের সঙ্গে কোমর ও নিতম্বের বঙ্কিম গতি পুরুষের চিত্তকে আত্মহারা করে তুলেছে—

সাধু বললে,—চল্ সাবি, এ ভাল নয়—

সাবি বিরক্ত হয়ে বললে,—দাঁড়া কেনে; দেখি-না।— সাবির সর্ব্বাঙ্গে তখন আদিম প্রকৃতির তড়িৎ-শক্তি উদ্দাম উদগ্র হয়ে দেহকে বার বার

রোমাঞ্চিত করে তুলেছে। সাবি সাধুর কাঁধে হাত দিয়ে কাছে টেনে এনে বললে,—উ কে বটে, সাধু—

—কোন্‌টি—

—উ পাঁচটাকা দিলেক—

—কোন্ বাবু বটে, উ সব বাবুরা ঝুমুরী লিয়ে অমনি মজা করে,ফুর্ত্তি করে—

সাবি ঘন ঘন আম্রবনের অন্ধকারের দিকে চেয়ে দেখছিল,—ওরা ফিরছে না। এদিকে অমনি ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলছে।

কিছুক্ষণ বাদে সাবি দেখলে,শাল-গায়ে বাবুটি ঝুমুরীর হাত ধরে ধীরে ধীরে আসছে, দুজনের মুখে জ্বলন্ত সিগারেট—মধুর গন্ধটা সাবির নাকে এসে লাগলো। তখন নূতন দু'জন আসরে নেমে দলে ভিড়েছে, এরা এতক্ষণ কোথায় ছিল বোঝা যায়নি,—হঠাৎ যেন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছে। এমনি একটা বীভৎস যৌন তাণ্ডব চলছে চারিদিকে,—রাত্রের অন্ধকারে।

সাধু আর সাবি দেখছিল—কেবল দেখছিল অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে, যেমন করে অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে শিশু জন্মে আর বেড়ে ওঠে—মানুষ মেরুপ্রদেশ ও গৌরীশৃঙ্গের অভিযানে যায়।

ঝুমুরী-নাচের কাছে প্রায়শঃই স্ত্রীলোক থাকে না,—শালীনতা বা সঙ্কোচের জন্যে, কিন্তু ওরা এসে পড়েছিল,—নেতি কাদায় পা আটকে গিয়েছিল—যেতে পারেনি।

ঝুমুরী মেয়েটা সিগারেট টানতে টানতে চলছিল, হঠাৎ সাবিকে দেখে এগিয়ে এল সেই দিকে, দেখলে চোখ টেনে টেনে। হঠাৎ সাবিকে জড়িয়ে ধরে বললে,—তু কোথা ছিলি বটে, সই? তুকে খুঁজছি—

সাবি বুঝেছিল ঝুমুরী মেয়েটা নেশার ঘোরে অপ্রকৃতিস্থ। সে শুধু বললে,—তু কে বটে?

—হাঁরে সই, মুকে চিনলি না, এতেদিনের সই। চল্ চল্—রস খাবি, লাচবি চল্— সে সাবিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সাধু সাবির হাতখানা ধরে ফেলে বললে,—কোথা যাচ্ছিস্?

ঝুমুরী অসঙ্কোচে সাধুকেও জড়িয়ে ধরলে,—তার শিথিল বস্ত্রাঞ্চল ধুলায় লুটোচ্ছে; হেসে হেসে বললে,—তু উর মনিষ বটি? চল কেনে—রস খাবি, লাচবি—

ঝুমুরী দুজনকে টানতে টানতে নিয়ে চলল, যন্ত্রচালিতের মত তারা তার আকর্ষণে চললো। যেখানে ভীড়টা জমেছে সেখান থেকে খানিকটা নির্জ্জন

জমি পার হয়ে তারা একটা ছোট নাড়ার কুঁড়েঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। এই কুঁড়েঘরখানা যে ছোট একটি লম্পে আলোকিত হয়ে ভীড়ের অদূরে নির্জ্জনতায় দাঁড়িয়ে ছিল তা হঠাৎ বোঝা যায় না। ঘরের মধ্যে একটি বৃদ্ধ লোক বোতল ও পাত্র নিয়ে বসে ছিল। ঝুমুরী বললে,—দে, মোর সই বটে, দে, রস খাইয়ে দে—বুড়োদাদু—

ঝুমুরী এক পাত্র মদ ঢেলে নিয়ে একরকম জোর করেই দুজনকে খাইয়ে দিল। বললে,—চল, লাচবি চল—

সাবি বললে,—লাচতে জানছি বটে!

সাধু আপত্তি করলে,—উ লাচবে কেনে? উ ত ঝুমুরী লয়—

ঝুমুরী সাধুর মুখের উপর কাচের চুড়ি-মোড়া হাতটা নেড়ে নেড়ে বললে,—সব ঝুমুরী, বিলকুল ঝুমুরী। আসরে লাচবি, পয়সা লিবি, বাবুরা গোটা পাঁচটাকার লোট দিবে—কোলে বসে রস খাবি। খাবি না? লাচবি না—যাঃ, না খাবি ত ক্ষেতে ধান পুঁতবি—মনিবের হুকুম শুনবি। চল্ লাচবি—পয়সা লুটে লিবি—

সাবির নেশা রীতিমত লেগেছে; সে বললে,—নাচ জানছি?

—হঃ, শিখে লিবি, লাচতে কি লাগছে আর?

বৃদ্ধ চোখ বুজে বসে ছিল, মাথাটা দু'হাঁটুর মাঝে ঝুলে পড়েছে। সে চোখ বুজেই বললে,—দলে ভিড়ে যা কেনে, বেতন পাবি, আসরে পয়সা লুটবি,—জোয়ান কামিন, পারবিনে কেনে?

সাধু বললে,—চল সাবি, চল— সে সাবির হাত ধরে টেনে তুলে দাঁড় করালে; বললে,—চল—

সাবি উঠে সাধুর পিছন পিছন চলতে আরম্ভ করলে। তার পরে এসে সোজা পথে মেলার ভিতর ঢুকলো। এখন ভীড় কমতে সুরু করেছে, আলোগুলি জ্বলে জ্বলে নিষ্প্রভ হ'য়েছে,—মাঝে মাঝে দু'একটি বদ্ধ মাতাল রাস্তায় পড়ে আছে, কেউ-বা টলতে টলতে যাচ্ছে। তারা তাদের নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষতলে এসে চাদর বিছিয়ে নিল—তখন ভোরের বাতাসে গায়ের ভিতর শিহরণ এনে দিচ্ছে। পাশেই লগেন দাসু তরী ওরা নিদ্রামগ্ন, সাধু পোঁটলাটা মাথায় দিয়ে শুয়ে বললে,—উ ভাল লয়, সাবি। ঝুমুরী সব জাত লাই,—বেবুশ্যে সব,—উ সব বদমাস্—

সাবি তার চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। সাধুর কথায় জবাব দিল না। এতদিন সে পচুই খেত, আজ চোলাই-করা মদের ক্রিয়া সমস্ত দেহে মনে ও

মস্তিষ্কে সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে। উন্মুক্ত তারায়-ঘেরা আকাশের নীচে ঘনীভূত আম্রবনের অন্ধকারে লম্পের আলোয় সে যা দেখে এসেছে তা যেন ঝড়ের পরে ছেঁড়া মেঘের মত তার অন্তরাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সঞ্চরমান সেই মেদুর মেঘের ভিজা হাওয়ায় মনের আদিম প্রকৃতি শিহরণে বেপথুমান হ'য়ে উঠেছে।—সে এলোমেলো ভাবছে নানা কথা। ওরা জীবনটা ভাসিয়ে দিয়েছে হাওয়ায়, তৃণের মত ঝড়ের মুখে সাঁতার কেটে চলেছে,—বন্ধনহীন স্বাধীন ওরা, চলেছে জীবনের অভিযানে।

সাধু বললে,—উধার যাসনি, সাবি, উরা ভাল লয়, তুকতাক জানছে বটে। বড় খারাপ—

সাবি বললে,—মোর কি ক'রবেক ? উ তুকতাক মোর লাগছে নাই—

সাধু ক্ষুণ্ণ হল,—কোন কথা না বলে সে শুয়ে রইল। সাবি আজ প্রথম তাকে টেনে কাছে নিয়েছে, তারই সুখস্পর্শে তার চিত্ত সুবাসিত হ'য়ে গেছে। সে অন্ধকারে সাবির হাতখানা হাতড়ে ধরে বললে,—সাবি, তু কি করবি, বল কেনে,—মোর ঘরকে যাবি নাই ?

সাবি উত্তর দিল না,—বিকল মস্তিষ্কের স্বপ্নজালে তখনও স্বল্পান্ধকারের উত্তেজনা স্তিমিত হয়নি। সাবি ভাবছিল,—স্বপ্ন দেখছিল। দেহটা ধীরে ধীরে অসাড় হ'য়ে এসেছে,—গাছের পাতার ফাঁকে আকাশের তারা বার বার নিভে যাচ্ছে—তাদের আলো এসে পৌঁছচ্ছে না সাবির চোখে।··

প্রভাতের পাখী গান করে গেছে বৃক্ষশাখে বসে। তারপরে ভোরের স্তিমিত অন্ধকার তরল হয়ে এসেছে, পুবের আকাশ ফরসা হ'য়েছে,—তারা বৃক্ষশাখা ছেড়ে গেছে মাঠে। সূর্য্যের রক্তিম আলো পুব-আকাশের ভাসমান শুভ্র মেঘের ললাটে সিন্দূরের টিপ দিয়েছে—তার পরে সূর্য্য উঠেছে—

সমগ্র মেলার লোকের রাত্রি তখনও কাটেনি,—রাত্রির কর্ম্মব্যস্ততা ভোরে স্তিমিত হ'য়ে বিবশ নিদ্রাগত। আলো প্রখরতর হ'য়েছে। রোদ উত্তপ্ত হ'য়েছে,—মেলার ক্ষণিক নগরী তখনও জাগেনি। দু'একটি লোক উঠে বসেছে তন্দ্রাঘোরে মাত্র,—সাধু আর সাবির গায়ে তপ্তরোদ এসে পড়েছে, দাসু লগেন তরী সকলে নদীর ধার থেকে ঘুরে এসেছে, হাতমুখ ধুয়ে এসেছে, তখনও ওরা নিদ্রাগত—সাধুর নিবিড় আলিঙ্গনের মাঝে সাবি নির্লজ্জভাবে নিদ্রাগত।

তরী নিদ্রাগত সাধু ও সাবির দিকে চেয়ে বললে,—হ, মেলাকে এসেছে বটে! রস খেয়ে মরেছে উটি—

তার অন্তর ফেটে পড়ছিল এই নির্লজ্জ নিদ্রায়—পরাজয়ের একটা গ্লানি আর ঈর্ষ্যা তাকে অসংবৃত করে দিয়েছিল। সে বললে,—সাঙ্গা করবেক নাই, উ ত ইয়াই করবেক···

লগেন ডাকলে,—সাধু, সাধু—উঠ্—

সাধু চোখ রগ্ড়ে উঠে বসে বললে,—হ, বেলা হইছেন,—সাবি তু উঠ্-উঠ্—দেখ কেনে বেলা হইছে বটে—

সাবি দু'একবার গড়াগড়ি দিয়ে চোখ মেলে দেখলো, তার পরে ধীরে ধীরে উঠে বসে ফিক্ করে একটু হাসলো। বললে,—বেলা হইছে বটে!

তরী বললে,—ঘরকে যাবি না?

লগেন বললে,—কাল যাবেক, মেলা ত রইছেন বটে—উ শুনবেক নাই।

কাল মেলা দেখা হয় নাই, অনেকটাই উপভোগ করতে বাকী রয়েছে, আজ সেটা শেষ করে কাল গৃহে ফেরা যাবে। গান খেলা প্রভৃতি এখনও অনেকই দেখা বাকী—

সাবি বললে,—না, যাবেক কেনে, এখুনো কত কি দেখবো হেথা—

তারপরে তারা উঠে সকলে পাপহরা গঙ্গার কবোষ্ণ জলে স্নান সেরে এসে পাথরের উনুনে সমবেতভাবে ভাত রান্না করে নিলে। ভাত হ'তে হ'তে মুড়ি-পাঁপড় খাওয়া হল, চা হ'ল। প্রহরেক বেলার পরে তারা খেয়ে নিলে। পত্রবিরল বৃক্ষের স্বল্প ছায়ায় আর-একটু গড়াগড়ি দিয়ে নিয়ে তারা উঠে মেলায় গেল। মেলায় তখনও লোকসমাগম হয়নি। অপরাহ্নের শেষ দিক থেকে ভীড় বাড়তে আরম্ভ করে, আর রাত্রিশেষে মেলা ঝিমিয়ে আসে। দুপুরে দোকানে ভীড় বিশেষ নেই—দোকানী দোকান সাজায়, আর কেউ কেউ ঝিমোয়। তরী দাসু ফিতা-কাঁটা, কাচের চুড়ি কিনলে। সাধু সাবিকে কিনে দিলে ফিতা-কাঁটা আর একহাত কাঁচের রেশমী চুড়ি। আরও টুকিটাকি দু'চারটে জিনিষ। একটা গন্ধ-তৈল কিনে দিলে মাখবার জন্যে—

বৈকালে তারা ঘুরে ঘুরে দেখলে; চা তেলেভাজা খেলে। রাত্রে মুড়িই খাবে সকলে, কাজেই রাঁধবার ঝামেলা নাই। সন্ধ্যার পরেই তর্জ্জা, লেটো গান, ম্যাজিক ও সার্কাস আরম্ভ হবে। ওরা সদলে বৃক্ষতলে ফিরে এসে সন্ধ্যার অন্ধকারে মুড়ি খেয়ে নিল,—তার পর আবার বেরুল মেলায় গান শুনতে—

মেলায় ঘুরতে ঘুরতে লগেন দাস্থ আর তরী একদিকে, আর সাবি আর সাধু আর একদিকে বিভক্ত হয়ে গেল। তারা সার্কাস দেখলে, তর্জ্জা শুনলে, —রাত্রি গভীরতর হ'তে লাগলো—

মেলার উজ্জ্বলতা সাবির গ্রাম্য সরল ও সবল ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করেছিল, ঘোড়ামারার বাইরের এই পৃথিবীকে সে দেখেনি কোনদিন। যে মোহে মানুষ প্রকৃতির কোল ছেড়ে নগর নির্ম্মাণ করেছে, প্রকৃতিকে ত্যাগ করে অপ্রাকৃত জীবনকে ভালবেসেছে, সেই মোহ সাবিকেও দুর্ব্বার আকর্ষণে টানছিল। হাঁটবার কষ্টকে জয় করতে মানুষ মোটর নির্ম্মাণ করেছে,—আরামে যাচ্ছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিদত্ত হাঁটবার শক্তিকেও সে হারিয়ে পঙ্গু হ'য়েছে। তেমনি একটা মোহ সাবিকে আজ পেয়ে বসেছিল—

কাল আম্রবনের অন্ধকারে কামনার লম্প জেলে যারা পসরা খুলেছিল তাদের অপ্রাকৃত জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা তার আদিম মনকে উত্তেজিত করে তুলেছে। সেই স্বপ্নালোকে যে ছায়ামূর্ত্তি সব প্রেতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল, —পসরা ভরে নিয়েছিল কাঞ্চনে, তাদের ভীড় যেন অজ্ঞাত প্রেতলোকের মত তাকে ইঙ্গিতে যেতে বলছিল। নিশির ডাকে যেমন মানুষ ঘর থেকে অজ্ঞানের মত ডাকের পিছু পিছু চলে যায়—ঐ প্রেতলোকে আলো-অন্ধকারের রহস্য তেমনি করে তাকে ডাক দিল।

সাধু হঠাৎ দেখে সাবি তার সঙ্গে নেই। অন্ধকারে এই চলমান জনারণ্যে কোথায় সাবি ছিট্‌কে চলে গেছে। সাধু চম্‌কে উঠল—সাবি হারিয়ে গেল, কিছু তো বলে গেল না সে! তার মনে কি যেন দুর্বুদ্ধি দেখা দিয়েছে, সে কি?···

সাধু ব্যস্ত হল,—শঙ্কা লজ্জা ও পরাজয়জনিত একটা ক্ষোভে সে ক্রমশঃই উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো। সে তাকে মেলার মাঝে খুঁজতে সুরু করলো। প্রতিটি মুখ প্রতিটি দোকান সে দেখে যাচ্ছে। লেটো গানের শ্রোতৃমণ্ডলীকে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পর্য্যবেক্ষণ করলে, তরজা গানের আসর দেখলে— কোথায়ও সাবি নেই—

সে তাড়াতাড়ি ফিরে এলো তাদের বৃক্ষতলের অনাবৃত আশ্রয়ে—সেখানেও সাবি নেই। সে ভাবল, অনেক ক্ষণ,—লগেন তরী দাসুও আসে নাই। সাবি যদি হারিয়েই যেয়ে থাকে, তবে সে ত এখানে ফিরে আসবে। সে রকম সাবধান-বাণী বহুবার সে আর লগেন বলেছে,—সাবি নিশ্চয়ই অন্য কোথায়ও, অন্য কারও সঙ্গে চলে গেছে—

সাধু মহুয়া-বৃক্ষতলে বসে বসে অপেক্ষা করলো, নিষ্ফল অপেক্ষার সঙ্গে রাগ দুঃখ ক্ষোভ অভিমান ক্রমশঃ বেড়েই চলল, একা নিরাশ্রয় এই আশ্রয়ে বসে কান্না পেতে লাগলো। ধীরে ধীরে রাত্রি বেড়ে গেছে, দ্বিপ্রহর হ'য়ে গেছে, হয় ত এখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর। সাধু একাই বসে বসে নিজের উপর আর সাবির উপর অভিমানে চোখের জল ফেলছিল,—নিশ্চয়ই সাবি অন্য কোন মনিষের সঙ্গে সরে পড়েছে,—নইলে এতক্ষণে এখানে আসতই—

লগেন দাসু তরী তর্জ্জা শুনে ফিরে এল। অন্ধকারে সাধুকে একা দেখে লগেন বললে,—তু একলাটি, সাধু! সাবি কোথাকে গেলে?

সাধু ভীতভাবে বলল,—সাবি হারাইছে বটে,—কোথাকে গেল, তার তরে বসে আছি বটে—

তরী বললে,—হ, হারাইছে বটে! তা হেথা ফিরলেক নাই কেনে, উ বদ কামিন বটে—

দাসু বললে,—হ, হেথা ত ফেরা লাগে বটে—

তরী টিপ্পনী করলে,—হেথা ফিরবেক কেনে,—রস খেয়ে কোথা লাচচে—দেখ গা—

তরীর ব্যঙ্গে সাধু আরও ক্ষুণ্ণ হল, কিন্তু সে কিছু বললে না। বললে,—লগেনদা, হেথা এখুন ঘুমুবি ত?

—হ বটে—

—সাবি হেথাকে এলে রাখবি, আমি মেলাকে খুঁজে আসি, উ কোথা যাবে, গান শুনছে কোথা বটে—

ওরা শোবার ব্যবস্থা করতে না করতেই সাধু বেরিয়ে পড়ল আবার খুঁজতে সাবিকে। দুঃখ ও অভিমানে প্রথমেই সে গিয়ে ঢুকলো মদশালে,—আকণ্ঠ পান করলে পচুই, তার পরে মেলায় ঢুকে খুঁজতে আরম্ভ করলে। গানের আসর দেখলে,—ম্যাজিক থেকে সবাই ফিরছে—একপাশে দাঁড়িয়ে তাদের দেখলে, কোথায়ও সাবি নেই। আবার একবার বৃক্ষের আশ্রয়ে যেয়ে দেখে এল,—সেখানে ওরা ঘুমুচ্ছে, সাবি যায়নি।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হ'তে চলেছে। মেলার গুঞ্জন কল-কোলাহল স্তিমিত, অবসাদগ্রস্ত পাগলের মত ধীরে ধীরে নিশ্চল হ'য়ে আসছে, সাধু নেশার ঘোরে ঘুরেই বেড়াচ্ছিল, কামিন তথা স্ত্রীলোক দেখলেই মুখের দিকে চেয়ে দেখছিল, কিন্তু সাবি নেই—কোথায়ও নেই—সেও মাতালের মতই ঘুরছিল কেবল—

হঠাৎ তার মনে হল, সাবি কি ঝুমুরী শুনতে গেছে, ওখানে কি সে ঝুমুরীদের দলে ঢুকেছে ? সাধু তাড়াতাড়ি অন্ধকারে মাঠটুকু পেরিয়ে ঝুমুরীর কাছে এসে উপস্থিত হল। লম্পের আবছা আলোয় আজও ছায়ামূর্তির ভীড়, তৃতীয় প্রহরের তন্দ্রাচ্ছন্ন। তেমনি কামনার শিথিল স্বপ্ন। দর্শক, ঝুমুরী সকলেই ক্লান্ত, ঢোলক-ওয়ালার হাতও শ্লথ হ'য়ে এসেছে—মাঝে মাঝে মাতালের অস্পষ্ট হাসি আর বাহবা। সাধু তাদের পিছনে এসে দাঁড়াল,—মাতলামি, অশ্লীল গান, পয়সার ছিনিমিনি কাল রাত্রির মতই চলেছে। ঝুমুরীরা অর্দ্ধ-বিবস্ত্র, নেশার ঘোরে জ্ঞানহীন—নেশার ঘোরে নেচে চলেছে—দর্শকদের হাতছানিকে আর যেন দেখতে পারছে না—কিন্তু সাবি নেই।

আশেপাশে ঘুরতে ঘুরতে সে কালকার সেই একক কুঁড়েঘরখানির সামনে এসে দাঁড়াল। বৃদ্ধটি আজও তেমনি বোতল গ্লাস ও পেঁয়াজী বড়ার ঝাঁকা নিয়ে বসে আছে—চোখ বুজে। লম্পটা জ্বলে জ্বলে ক্লান্ত হয়েছে—তাতে ফুল পড়েছে—আলো প্রায় নিবু-নিবু। দন্তহীন মুখের ওষ্ঠটা ঝুলে পড়েছে—ও বসে আছে ঠিক, খুঁটিটা হেলান দিয়ে।

সাধু ঘরে ঢুকে পড়ে ডাকলে,—ও মোড়ল, মোড়লপো – শুনছো—

বৃদ্ধ নেশায় বুঁদ, কোনমতে টেনে টেনে চোখ খুললে—কিন্তু কিছু দেখছে বলে মনে হল না। বললে,—কে বট ?

সাধু বললে,—হেথা কি সাবি রইছে ?

—হ,—

—কোথা রইছে ?

—কে বট,—কে রইছে—

—সাবি—

—সাবি, কে বট ?

—সাবিত্রী বাউরী—

বৃদ্ধ দন্তহীন মুখে জিহ্বার দ্বারা কেমন একটা শব্দ করে বললে,—ঝুমুরীর দলকে সীতে-সাবিত্রী রইবে কেনে ? হেথা ঝুমুরী আছে, উর্ব্বশী আছে, মেনকাও রইছেন, আর উ ফুলি ও রইছেন—

সাধু বুঝলে, বৃদ্ধ ঠাট্টা করছে। সে বললে,—কাল রাতকে মোর সাথে যে কামিনটো এসেছিল বটে, সেইটো,—হেথাকে আসে নাই— বৃদ্ধ চোখটা আর একবার প্রাণপণে মেলে ধরে মুখের কাছে চোখটা এনে সাধুর মুখখানা দেখে নিল। মাথা দোলাতে দোলাতে বললে,—হ, তু কে ? কে বটে !

—কাল রাতকে রস খাওয়ালে মনে নাই—

বৃদ্ধ পুনরায় মাথা দুলিয়ে চোখ বুজে বললে,—হ বটে!

—কি বটে—ও মোড়ল—

—হ বটে, কাল রাতকে সেই রেণুবালার সই, সেই লতুন কামিনটো এইলো বটে। উত টাটকা কামিন বটে। হ, ভাল বটে—বাবুরা লিয়ে গেছে—

—কোথাকে লিয়ে গেছে—

—কে জানছে, ভোর রাতকে আসবেক, দশটাকা দেবেক বললে—উ রেণুবালা লিয়ে গেল। হ তুর কামিন—বস কেনে,—লে, রস খা—

নেশাগ্রস্ত সাধুর মাথাটা হঠাৎ বারুদের মত জ্বলে উঠলো। বিস্ময়ে অভিমানে স্ফুরিত কণ্ঠে সে বললে,—বাবুরা লিয়ে গেছে—

—হ বটে, তিন বাবু তিরিশটাকা দেবেক বটে! তুর কি?

—মোর সাথে এসেছে বটে,—মোর গাঁয়ের কামিন—

বৃদ্ধ চোখ বুজেই বললে,—ভাল বটে, মেলা দেখলি, রস খেলি, বিশটাকা ঘরকে লিয়ে যাবি, দশটাকা ঝুমুরীকে দালালি দিবি। তুর কামিন ত লয়?

—মোর কামিন লয় বটে!

—সাঙ্গা করবি? মেলাকে এসেছিস্,—ভাল বটে, বাবুরা লিয়ে গেছে উতে কি হবেক? জাত ত যাবেক নি। ভাল বাবু সব—বামুন আছে, কায়স্থ-বাবুবা আছে—ভাল লোক বটে—

সাধু উত্তেজিত হয়েছিল। সে আর শুনতে পারলো না, ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল আম্রবনের ছায়ায় অন্ধকারের মধ্যে। অন্ধকারের মাঝে উষর মৃত্তিকার উপর বসে চোখের জল ছেড়ে দিল—দুঃখে অভিমানে। তার সাবি মদ ও অর্থের মোহে তাকে ছেড়ে ঝুমুরীর দলে ভিড়েছে,—তার এত ভালবাসা, এত প্রেম, এত আগ্রহ সব মুহূর্তে ধূলিসাৎ করে দিয়ে, একেবারে ব্যর্থ করে দিয়ে সে চলে গেছে—

সাধুর ইচ্ছা করছিল বুক চাপড়ে কাঁদে, কিন্তু নেশার বিবশতায় ও হতাশায় সে বসেই রইল—তার অন্তর কেবল তারস্বরে চীৎকার করছে—সাবি, সাবি, তু চলে গেলি! আজও সে দেহের রক্ত দিয়ে উপার্জ্জন-করা অর্থ দিয়ে তার রেশমী-চুড়ী ফিতাকাঁটা কিনে দিয়েছে,—সে বুকভরা ভালবাসা দিয়েছে। কাল রাত্রির অন্ধকারেও সে তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে শুয়ে ছিল—

আকাশে অগণ্য তারা, সে তারার আলো মেলার গ্যাসের বাতি-উদ্ভাসিত বায়ুস্তরে এসে থেমে গেছে—লম্পের আলোর কাছে এসে পৌঁছয়নি,—মেলার

কোলাহল নিভে এসেছে। রাত্রির অন্ধকার গলে যেন দিনের শুভ্রতার আগমন ঘটছে ধীরে ধীরে—অন্ধকার-অবলুপ্ত বৃক্ষশ্রেণী মাঠ-ঘাট গৃহ-প্রান্তর ধীরে ধীরে স্পষ্টতর রূপ নিয়ে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে। দূরের বনশ্রেণী বনস্পতি সব তরল অন্ধকারে কেবল ছায়ামূর্তির মত দাঁড়িয়েছিল—তারা ধীরে ধীরে আকার ও পরিচয় নিয়েছে। দিনের শুভ্রালোক আসছে পুবগগন বেয়ে, লম্পের আলো নিভে যাচ্ছে,—অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। বাসনার নারক্লতা শুভ্রতার প্রকাশে সংবৃত হয়েছে—

ঝুমুরীরা অশক্ত অসংবৃত দেহে আসরের প্রান্তে শুয়ে পড়েছে,—তৈলহীন লম্প পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে শালের রলায় কালো বিন্দুর মত ঝুলছে। শ্রোতৃগণ যারা সজীব ছিল তারা অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিয়েছে,—যারা পারেনি তারা ধরাশয্যা গ্রহণ করেছে। সাধু ভিজা চোখের ঝাপসা দৃষ্টি দিয়ে দেখছিল আগমন—হর্ষভরা প্রত্যূষের—

সাধু দেখলে, কে একজন যেন সিগারেট টানতে টানতে আম্রবনের ওধার থেকে আসছে। ভোরের হিমেল হাওয়ায় তার গন্ধ নাকে এসে লাগছে। এই আলো-আঁধারের কোলাকুলির মাঝে চেনা যায় না—তবে রমণী। আর একটু আসতেই সাধু চিনলো, এ সাবি। তার চলার ভঙ্গি, তার পদক্ষেপের ছন্দ তার চিরপরিচিত।

সাধু ছুটে গিয়ে দেখে সাবি। হঁ্যা, সাবিই বটে,—সে খপ করে তার হাতখানা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে বলল,—তু সাবি? কোথা ছিলি রে সারাটি রাত—আমি সারা মেলাটা খুঁজতে লেগেছি—

সাবি টলছে; হিহি করে হেসে বললে,—উ হোথা—

—কোথা ছিলি বল,—বল কেনে?

সাবি টলতে টলতে যেন পড়ে যাচ্ছিল, সাধু দৃঢ়মুষ্টিতে তাকে ধরলে। সাবি বিনিয়ে বিনিয়ে বললে,—উঃ হোথা, বাবুরা লিয়ে গেল, রস খাওয়ালেক, মাংস খাওয়ালেক, তিরিশটাকা দিলেক।—সাধু জ্বলে উঠে বললে,—তু কি করলি?

সাবি হেসে বললে,—কেনে, তুর কি? মু তোর কামিন বটি? লাচলাম, গাইলাম, বাবুরা যা বললে তাই করলেক—তা তুর কি?

সাধু রাগে ক্ষোভে কি বলবে ঠিক করতে না পেরে বললে,—তু ঝুমুরী হয়েছিস্, সাবি,—রস আর টাকা লিয়ে বাবুদের কথা শুনলি—

—হ বটে—তুর কি?

—তু খারাপ হলেক রে, সাবি ? হোথা যাস্‌নি ঝুমুরী-দলে, চল্ চল্ সাবি, ঘরকে যাই—

সাবি বললে,—হ, ঘরকে যেচ্ছে, ঘরকে মোর কি আছে ? মনিষ রইছে, জমি রইছে ? ঘরকে যাবেক কেনে ? কেনে যাবেক—মু ঝুমুরী হবেক—লাচবেক, রস খাবেক—

সাধু ব্যাকুলকণ্ঠে বলল,—সাবি, চল্ ঘরকে যাই, মু সাঙ্গা করবেক, মোরা ঘর বাঁধবেক, ধান পুঁতবেক, সোনার ধান ফলাবেক, পাহাড়কে কাঠ ভাঙ্গবেক, গান করবেক লাচবেক, চল্ ঘরকে যাই—

সাবি হিহি করে হেসে বললে,—ধান পুঁতবেক কেনে ? মাটি বইবেক কেনে ? রস খাবেক ঝুমুরী হবেক—হ দ্যাখ তিরিশখানা টাকা বটে— সাবি তার কোমর থেকে বের ক'রে তিনখানা চকচকে দশটাকার নোট সাধুর সামনে মেলে ধরলে।

সাধু সাবির হাত ধরেছিল,—সে বুঝেছিল সাবি নেশার ঘোরে কাঁপছে। সে বলল,—তোর নেশা লাগছে বটে, উসব বলবি না, চল্ ঘরকে যাই—

সাবি রুষ্টভাবে বলল,—ঘরকে কোন্ সোয়ামী রইছে মোর রে ? ঘরকে যাবেক নাই। কেনে যাবেক, তু কি রে ?

সাধু অধিকতর ব্যাকুলভাবে বলল,—তু যাবি না, সাবি ? মহিম জেঠাকে কি বলবেক, তুর মাকে কি বলবেক ? সাবি, তু যাস্‌নি ঝুমুরী-দলে—উরা যখন খুঁজবে সাবি কোথা, কি বলবেক বল ?

সাবি হেসে বললে,—বলবি সাধু, সাবি মরলেক, বক্রেশ্বর-নদীতে ছাই করে দিলেক। সাবি মরলেক—

সাধু ব্যগ্রব্যাকুল কণ্ঠে বলল,—সাবি, তু সাবি, অমনি বলবি না, চল্ ঘরকে যাই—

সাবি হিহি করে হেসে হাতখানা জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। বললে,—গাঁকে বলবি,—সাবি মরলেক, ছাই হ'য়ে গেছে বক্রেশ্বরের চরে—সাবির ঘর লাই, মাঠ লাই, মুনিব লাই—

সাবি টলতে টলতে ঝুমুরীদের কুঁড়েঘরের দিকে চলতে লাগলো। সাধু সজলকণ্ঠে ডাকল,—সাবি যাস্‌নি, মোরকে ছেড়ে যাসনি,—ঘরকে চল্—

সাবি ফিরল না, ফিরে একবার তাকিয়ে দেখলে না সাধুকে।

প্রভাতের স্বল্পান্ধকারে সাবি টলতে টলতে কুঁড়েঘরে যেয়ে ঢুকল। সাধুর বুকের মাঝে কি যেন একটা নিঃসাড় হ'য়ে ভয়ে সংকুচিত হ'য়ে ছিল, হঠাৎ

মুচড়ে উঠে বুকখানাকে চৌচির করে দিল।—আকস্মিক আঘাতে পাঁজরাগুলি যেন দীর্ণ হয়ে গেছে, ফুসফুসে হাওয়া ঢুকছে না, চোখে জ্বালা করে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ে বুক ভিজিয়ে দিল। সে কঠিন মৃত্তিকার 'পর আছড়ে পড়ে কেঁদে উঠল,—সাবি, সাবি রে, তুর মনকে এই ছিল রে? তু এ কি করলি, সাবি?

নিস্তব্ধ নিঝুম ঘুমন্ত সেই জনারণ্যে সাধুর কাকুতি বাতাসে কম্পন তুলে শিশির-শীতল রুক্ষ প্রান্তরে মিলিয়ে গেল। আম্রবনের অন্ধকার থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বাহিরের প্রান্তরে মিশে গিয়ে হাহাকার করে উঠলো। সাধু হাপুস নয়নে কঠিন মৃত্তিকার কোলে চোখের জল ফেলে পাথরকে ভিজিয়ে দিল—

আদিমকালের হিংস্র মানুষ থেকে আজকার এই সভ্য জগতের মানুষ সকলেই এমনি করে মাটির কোলে তার চোখের জল ফেলেছে,—পৃথিবীর বিশুষ্ক মৃত্তিকাকে ভিজিয়ে দিয়েছে আহত হৃদয়-নিঃসৃত অশ্রুর বন্যায়—হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সংঘাতে মানুষ কেঁদেছে, কাঁদবে। এই চিরন্তন ক্রন্দন তার বেড়েই চলেছে,—যত সে নিজের চারিপাশে সংস্কৃতি ও সভ্যতার বেড়াজাল দিয়েছে, দেহের চারিপাশে কণ্টকের প্রতিরোধক দিয়েছে, ততই কেঁদেছে তার হৃদয়—বেড়ে গেছে তার হৃদয়ের বেদনাভার। সংঘাত জটিলতর হ'য়ে দুঃখকে করেছে বিচিত্র—তাই মানুষ মানুষের ভীড়ে বাস করেও একাকী নির্জ্জনে কাঁদে—

সাধুও তাই কাঁদছে সুপ্ত জনারণ্যের প্রাণকেন্দ্রে ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে। সাধু প্রাণভরে কেঁদে বুকের জমাট দুঃখকে হালকা করে দিল। তার পর চেয়ে দেখলে প্রভাতের আলো স্বচ্ছতর হ'য়েছে—সে উঠে দাঁড়ালো, দূর থেকে দেখলে আলোর বন্যার মাঝে কুটিল-কালো কলঙ্কের মত কুঁড়েঘরখানা দাঁড়িয়ে আছে মাঠের বুকে শ্বাপদের মত। সাবি কোথায়ও নেই। সে চলে গেছে কোথায়?

পথের সম্বল পুঁটলিটাকে লাঠির আগায় বাধিয়ে কাঁধে করে সে উঠল,—আজ ফিরে যাবে তারা ঘোড়ামারায় বহুস্মৃতিপূত গৃহের পানে—সাবি যাবে না, সে পড়ে রইল পিছনে—

সাধু তাদের অনাবৃত বৃক্ষাশ্রয়ের দিকে রওনা দিল—

লগেন, তরী, দাসু উঠে বসেছে, তাদের সামান্য পথের সম্বলকে গুছিয়ে পুঁটলি করেছে,—তারা দু'দিনের আনন্দের পরে ফিরে যাবে ঘোড়ামারায়—তাদের গাঁয়ে। সাবি আর সাধু এখনও আসেনি, তাই তারা অপেক্ষা করছে—

সাধু ফিরে এল চোখের জল মুছতে মুছতে। লগেন বললে,—সাবি কোথা ? বেলা হ'ল বটে,—

তখন দূরের আকাশ রক্তিম হয়ে উঠেছে। আর বিলম্বে পথে কষ্ট হবে। দামু বললে,—সাবি কোথা, বেলা উঠ্‌বে এখুনি বটে—

সাধু বিমর্ষভাবে চোখের জল মুছে বললে,—সাবি যাবেক না, উ ঝুমুরীর দলকে যাবে, নাচবে গাইবেক, আর ধান পুতবেক না—

লগেন বললে,—উর মা'কে কি বলবি সাধু, মহিম জেঠাকে কি বলবি ? গাঁয়ের কামিন ঝুমুরী দলকে দিয়ে তু ফিরলি কেনে মুখটি নিয়ে ? কি বলবি তু ?

—কি বলবেক, কত বলছি, হাত ধরে টানছি, সাবি ফিরলেক নাই—

—সে কোথা বটে ?

—উঃ ঝুমুরীর কুঁড়েঘরকে রইছে বটে—

লগেন লাঠিখানা ঠুকে বললে,—চল্‌, উকে লিয়েই যাবেক মোরা, গাঁকে লিয়ে যাই,—তারপর ঝুমুরীর দলকে যাবে।

লগেনের বক্তব্য, প্রয়োজন হ'লে জোর করেও তারা সাবিকে নিয়ে যাবে, গ্রামের মেয়েকে গ্রামে ফিরিয়ে নেবে, যদি ইচ্ছা হয় সাবি সেখান থেকে ঝুমুরী-দলে যোগ দেবে—কিন্তু তারা তাকে এখানে মেলায় ফেলে রেখে যাবে কোন্‌ মুখে ?

তারা সকলে সমবেত হয়ে একসঙ্গে ঝুমুরীর কুঁড়েঘরের দরজায় এসে হাজির হল। বৃদ্ধটি বসে বসেই ঘুমুচ্ছে,—কয়েকজন ঝুমুরী বিবস্ত্র অজ্ঞানতায় সোনালী রোদে পড়ে আছে, সোনার পুতুলের মত। অন্যান্য সকলেই অচেতন। কুঁড়ের মাঝে সাবি নেই—

লগেন কুঁড়েঘরের এদিক ওদিক তাকাতেই দেখে, সাবি একখানা পাথরে মাথা রেখে উষর অমসৃণ ভূমির উপর পড়ে আছে, অর্দ্ধবিবস্ত্র অজ্ঞান। লগেন সাবির মাথাটাকে তুলে ধরে বললে,—সাবি, হেথা রইছিস্‌ কেনে,—চল্‌, ঘরকে চল্‌। ঘরকে মা রইছে, মহিম জেঠা বলবেক কি ?

প্রভাতের রৌদ্র এসে পড়েছে সাবির মুখে, ঝলমল করছে তার কালো মুখ। সে তাকাতেই দিনের আলো চোখটাকে ধাঁধিয়ে দিল। সে তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে চোখ ঢেকে বললে,—বেলা হইছেন বটে—

—হ, বেলা হল বটে,—চল্‌ ঘরকে যাই। মেলাকে দু'দিন হল বটে—চল্‌—

লগেন একখানা হাত ধরে টান দিতেই সাবি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, তখনও পায়ের উপর দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা যায় না। সাধু এসে আর-একখানা হাত ধরে বলল,—চল্ সাবি, বেলা হল—ঘরকে চল্,—

সাবি চারিপাশ চেয়ে দেখলে—কোথায় যেন সে এসেছে ঠিক ঠাহর করতে পারলে না—কিন্তু একপায়ে দুইপায়ে সাধুর আকর্ষণে সে পা বাড়াল। কামনার লম্প ওদের নিভে গেছে, তাই দিনের আলোয় ঝুমুরী-দল ঘুমিয়েই রইল। সাবি চলল ঘরে ফিরে—

ধীরে ধীরে তারা আম্রবন পার হয়ে বারাবনীর পথ ধরল। সাবিকে বললে,—সাবি চল্, তাড়াতাড়ি চল্ কেনে—

সাবি চলল, কিন্তু পদক্ষেপ এখনও তার সবল হয়নি,—সে টলতে টলতে চলল সাধুর পিছনে পিছনে। তরী এতক্ষণ অবাক বিস্ময়ে সব দেখছিল; সে বললে,—উ ত মাতাল হল বটে,—রাতকে কোথা ছিলি, সাবি? কে মদ দিলে তুকে—

সাবি বললে,—হ, মদ ত খেলেক, বড় নেশা লাগল বটে—

*

পিছনে সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে উঠছেন উপরে,—দেখতে দেখতে শিশির-শীতল মৃত্তিকা উত্তপ্ত হ'য়ে উঠল। পায়ের নীচে বালি আর কাঁকর উষ্ণ হয়ে উঠেছে, দক্ষিণের উষ্ণ হাওয়া ঝড়ের মত বইছে প্রান্তরের উপর দিয়ে, সে হাওয়া গায়ে লাগলে সর্ব্বদেহে জ্বালা করে। একটি বিস্তীর্ণ উচ্চাবচ নিরাশ্রয় মাঠ পার হ'য়ে এসে ওরা শালবনের মাঝে ঢুকলো। দুদিকে বড় বড় শালগাছ, মাঝে মাঝে মহুয়া, জাম, পিয়াল ও পলাশের গাছ। পথের উপর তার ছায়া পড়েছে, শরীরটা আপনিই জুড়িয়ে যায়।

লগেন বললে,—উ দিক পানে যাবেক নাই, চল্ লোকপুর দিয়ে যাবেক। হোথা বাজারে খেয়ে লিবে সব—

সাবি বললে,—চলতে লারছি বটে, লগেন, হেথা বস কেনে একটুখানি—

শালবনের ছায়ায় একটু বিশ্রাম করতে সকলেরই ইচ্ছা ছিল। কেবল আপত্তি করল লগেন,—বসলে আর চলতে লারবেক তু, সব,—পা ভারিয়ে যাবেক—

সাধু বলল,—হ, একটুকখানি বসে লে কেনে, যেতে ত হবেক? সাবি হাঁটতে লারছে—

তরী হি-হি করে হেসে বললে,—সাবি লারছেক, সাবি লারছেক—কেনে তু কাঁধকে লে'কেনে—

সাধু বললে,—হ, সাবিকে লেবে, তুকেও লেবে—

লগেন বললে,—হ, তবে বস কেনে হেথা—

একটা বড় শালগাছের ছায়াতে সকলে বসলে। পুঁটুলিটা মাথায় দিয়ে সাবি সটান শুয়ে পড়ল মাটিতে। সাধু একটি পাথরে হেলান দিয়ে মেলায় কেনা বিড়ি ধরালে। সারাটা রাত্রি সে ঘুমোয়নি, তারপর হাঁটতে হচ্ছে, তার ঘুম পাচ্ছিল।

সাবি ঘুমিয়ে পড়েছে, সাধুও পাথরে মাথা দিয়ে ঝিমুচ্ছে—

লগেন বিড়ি ধরিয়ে তরীকে একটি আর দাসুকে একটি দিল। তরী বললে,—উরা সারাটি রাত কি করলে বটে? ঘুমালেক—এখুনি—

দাসু সাদাসিধা লোক,—সে বললে,—রস খাইছে, মেলাকে সারা রাত্রি ঘুরলেক, ঘুম পাবেক নাই?

তরী বললে,— হ, কোথা গেলেক উরা?

*

লগেন একটা দুইটা তিনটা মেলার বিড়ি খেল। একদল মেলার যাত্রী চলে গেল, তবুও সাধু বা সাবি ঘুমুচ্ছে। বেলা বেড়ে চলেছে, আর দেরী করলে দিনে দিনে পৌঁছানই যাবে না। লগেন ডাকলে,—এ সাধু,—সাধু—চল্—বেলা বাড়লেক বটে—

সাধু উঠে চোখ খুলে এদিক ওদিক একটু চেয়ে দেখলো, তার নেশাটি যেন কেটেছে মনে হয়, সে অবস্থাটা স্মরণ করে বুঝে নিয়ে বললে,—হ, বেলা একপহর হল বটে—

তরী বললে,—তুর সাবিকে ডাক কেনে,—

লগেন বলল,—লোকপুর বাজারকে রান্না-খাওয়া করবেক, চার ক্রোশ পথ হবেক, কখুন যাবি তুরা?

সাধু ডাকলো,—উঠ্, সাবি, উঠ্—বেলা হল বটে—

সাবি পাশ ফিরে শুয়ে বললে,—তু যা কেনে, মু ঘুমাবেক—

সাধু তাকে জোর করে তুলে দিল। সাবি দু'হাতে চোখ রগড়ে বসে বললে,—এ কোথাকে এনু রে—

—ঘরকে যাবেক নাই?

—যাবেক ত বটি,—ই কোথা?

লগেন বললে,—লোকপুরের জঙ্গল বটে। চল্, লোকপুরে রাঁধা-খাওয়া করবেক—

সাবি উঠে দাঁড়াল, নেশাটা যেন কমেছে, সে যেতে পারবে কিনা ভাবছিল। লগেন বললে,—তু হাঁটতে লারবি?

—কেনে, লারবো কেনে? চল্ না—

সাবি পুঁটলি মাথায় করে প্রস্তুত হল—তারা লোকপুরের বাজারের দিকে নূতন উদ্যমে রওনা হল।

লোকপুর বাজারের পাশে মস্তবড় বটগাছ,—বহুদিনের। বহু শাখাপ্রশাখা মেলে সে বনস্পতি কয়েক বিঘা জমি ছায়াযুক্ত করে রেখেছে। গাছের ডাল নুয়ে এসে মাটিতে পড়েছে। এদিকে ওদিকে ঝুরি নেমেছে। ঝুরিতে ভর দিয়ে ডালগুলো এগিয়ে গেছে অনেকদূর—

ওরা যখন লোকপুর এসে পৌঁছল তখন বেলা প্রায় এগারটা। পৃথিবী উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে। দক্ষিণের গরম হাওয়ায় চোখ জ্বালা করছে। তারা নিজেদের ভাগের পয়সা দিয়ে চাল-ডাল, আলু-পেঁয়াজ, নুন-তেল আর হাঁড়ি কিনে রান্নার ব্যবস্থা করলো। পাশেই একটি বাঁধ ছিল, তার অগভীর জলে সকলে স্নান করবে। লগেনরা আগে স্নান করতে গেল, ততক্ষণ বন থেকে কাঠ ভেঙে সাধু আর সাবি পাথরের উনুন তৈরী করে হাঁড়ি চাপিয়ে দিল। স্নান সেরে এসে ওরা রান্নার ভার নিলে, সাধু আর সাবি চলে গেল।

সাবি জলে নেমে যাচ্ছিল, সাধু বললে,—তুর কোমরে দশটাকার লোট রইছে, সাবি—জলকে লামিস্ না—

—লোট—দশটাকার কি বলছিস্—

সাধু বলল,—হ, দেখ কেনে, রইছে তিনখানা বটে—

সাবি কিছুক্ষণ ভেবে নিলে, কেমন করে নোট তার কাছে এল। ভেবে নিয়ে কোমরের কাপড় খুলে দেখলে কিছুই নেই—

সাধু বললে,—লোট কি হ'ল রে, কোথা ফেলেছিস্ রে সাবি?

সাবি আর একটু ভেবে বললে,—হ, উঃ বুড়াটা লিয়ে লিছে, ভোর রাতকে উ মোর ট্যাকটি হাতড়াচ্ছিল বটে—

—তু দিলি কেনে?

—দিলেক কেনে? তখুন ত জ্ঞান নাইরে মোর, কি করলেক মনকেই নাই—

সাবি জলে নেমে স্নান করলে, তার পর কাপড় ছেড়ে কাপড় কেচে নিয়ে উঠে দাঁড়াল—সাধুও স্নান সেরে ফিরলো। বটগাছের ছায়ায় এসে সাবি বললে,—লগেনদা, মোর ঘুম পাইছে বটে,—চান করলেক আর নেশাটি আবার লাগলে,—তুরা রান্না কর কেনে, মু ঘুমাবেক—

তরী কটু কটাক্ষে একবার তাকালে। সাধুও ঘুমুবে বলে চলে গেল,—গাছের আড়ালে একটি নির্জ্জন স্থানে শুকনো ঘাসের উপর ওরা এসে দেহ এলিয়ে দিল। পাথর ছিল,—মাথায় দেওয়া চলে। সাধু বললে,—সাবি পাথরকে যাস্ না, কঁ্যাকড়া রইছে বটে—

তারা দু'জনেই আশেপাশের পাথর উল্টে দেখলে, তার নীচে কঁ্যাকড়া-বিছে আছে কিনা,—দেখলে নেই। সাবি শুয়ে পড়ল, সাধু কিছুক্ষণ বসে রইল। সাবি আরামে চোখ বুজেছে—

সাধু ডাকল,—সাবি—

—কি? বল্ কেনে?

—তু, কাল রাতকে কোথা ছিলি—

সাবি জবাব দিল না। চোখ বুজে সে একটু হাসলো। সাধু বললে,—সারাটি রাত কোথাকে ছিলি, দশটাকার লোট কে দিলেক,—তু কি করলি বল কেনে—

—কেনে, উতে তোর কি হবেক—

—বল কেনে সাবি, সারাটি রাত আমি মেলা আর আমবাগান করলেক, আমবাগানকে বসে তুর জন্যে কাঁদলেক—বলবি না⋯ সাধুর চোখ দুইটি চিকচিক করে উঠল বেদনার অশ্রুতে।

সাবি সংক্ষেপে বললে,—উঃ ভাল লয়, কি হবেক বল্ না?

—বল কেনে, সাবি?— সাধু এগিয়ে এসে সাবির হাত ধরে বললে,—বল কেনে—

—শুনবি?

—হ। বল্—

সাবি বললে,—মেলাকে উঃ ঝুমুরী এসে ডাকলেক, চল্ রস খাওয়াবেক। হোথা গেলেক,—কি রস দিলেক, একেবারে জ্ঞানহারা হ'য়ে গেলেক। ঝুমুরীটা আর আমি কোথাকে যেন গেলেক, বাবুরা নিয়ে গেল—মোরা গান করলেক নাচলেক, বাবুরা রস খাওয়ালেক, মাংস খাওয়ালেক—

—টাকা দিলেক?

—হ, উ ঝুমুরী বললেক, টাকা দিলেক—ঝুমুরীটি তো একলাটি রেখে পালালেক,—বাবুরা মাতাল হয়ে কত কি করলেক—

—তু কি করলেক ?

—কে জান্‌ছে !

—তু কি করলি তু জানছিস্‌ না—

—মোর জ্ঞান ছিলেক ! কি করলেক,—হ,—কি ক'রলেক মু জানছি বটে—রস খেয়ে বেঁহুস হ'য়ে পড়ে রইলেক, ভোর রাতকে উরা তুলে আমবাগান দিয়ে গেলেক—তু ত দেখলি—

সাধু চুপ করে রইল, সাবি কি যেন একটা কথা গোপন করলো, যতই মাতাল হোক সারাটা রাত্রির ঘটনা একেবারেই ভুলে গেছে, কিছুই তার মনে নেই, এ কথা সাধু বিশ্বাস করেনি। সাধু কেন, কেউই বিশ্বাস করবে না—তা ছাড়া তিনখানা দশটাকার নোট সাবি তাকে দেখিয়েছিল, সে কথা এখনও তার মনে আছে, প্রভাতের আলোয় সে দেখেছে রক্তরাঙা তিনখানা নোট। সাবি চোখ বুজেই শুয়ে ছিল,—সাধু চেয়ে-চেয়ে তার যৌবনশ্রী দেখছিল, মোহমদির চোখ মেলে।

এরা নারী পুরুষ এমনি মেশে—পাশ্চাত্য দেশের মতই স্বাধীনভাবে। তারা জানে এর মাঝে স্খলন পতন আসে, অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে, তা নিয়ে এরা অভিযোগ করে না। পাশ্চাত্য দেশের নরনারীরা কুমারী ব্যভিচারকে সার্ব্বজনীন জেনেও যেমন বিয়ে করবার সময় পিছিয়ে যায় না,—তারা জেনেশুনেই বিবাহ করে, তার জন্মে মনে অস্বস্তি বোধ করে না; এরাও ঠিক তেমনি। আধুনিক যুগের মত স্বাধীনতার বড় বড় রসাত্মক বাক্য দিয়ে এরা পরের মেয়েকে বাইরে টেনে আনে না। যারা ফ্লার্ট করে, প্রেম করে, পরের মেয়েকে পদস্খলিত করে—কিন্তু বিয়ে করবার সময় পিছিয়ে যেয়ে বিয়ে করে সনাতনীকে, বিলেতী কায়দা যারা আয়ত্ত করতে চায় অথচ বিলেতী মন নিয়ে বিয়ে করতে পারে না, এরা তাদের মত নয়। এরা প্রকৃতির সন্তান—এরা প্রকৃতিকে মেনে চলে।

সাধু বললে,—সাবি— কি যেন বলতে গিয়ে তার বেধে গেল।

—বল কেনে ?

—তু সাঙ্গা করবি না ? উরা ত কিছু জানছে না,—

—কি জানছে না ?

—রাতকে কোথায় ছিলি—

সাবি তীব্রকণ্ঠে বললে,—তু ত জানছিস—বাবুরা কি করলেক—তু সাঙ্গা করবি কেনে ?

—করবেক। উ রস খাওয়ালে বটে, তু কি করলি তু জানছিস না—তু ত করিস নাই—মদে করলেক—

সাবি বললে,—হ,—তু সাঙ্গা করবি, বাবুরা টাকা দিলেক,—লাচালেক—

সাধু বললে,—উ সব মু বলবেক নাই। কে জানছে বটে মেলাকে তু কোথাকে ছিলি—

—তু বলবি না ?

—না, বলবেক নাই।

—কেনে ? কেনে তু বলবি না…মু সাঙ্গা করবেক—তাই ?

—তু সাঙ্গা করবি বল কেনে—

—সাঙ্গা না করলে তু ত গ্রামকে বলবি, বাবুরা মোকে নিয়ে ফুর্তি করলেক, টাকা দিলেক, মদ খাওয়ালেক—তু বলবি ত ?

সাধু জবাব খুঁজে পেল না, স্ত্রীলোকের সহজাত এই চাতুর্য্যের কাছে যুগযুগান্ত পুরুষ মূক হয়ে রয়েছে, জবাব খুঁজে পায়নি তারা। অসহায়ভাবে মুখের দিকে তাকিয়েছে মাত্র। সাধু দূর দিগন্তের পানে চেয়েছিল,—ধূসর দিগন্তে রৌদ্র ঝলমল করছে, যেন অগ্নিবৃষ্টি করছে গৈরিক মৃত্তিকার উপর। তার চোখটা জ্বালা করছিল—রাত্রি-জাগরণ, তার সঙ্গে এই দীর্ঘপথ ভ্রমণ, এবং উন্মাদের মত আম্রবন ও মেলায় হারানো সাবিকে খুঁজে বেড়ানো একসঙ্গে তার দেহ-মনকে ক্লান্ত করে দিয়েছে—

সাবি তাকিয়ে ছিল সাধুর বিমর্ষ ক্লান্ত মুখের দিকে। বটগাছের ছায়ায় তার মুখখানিতে যেন কালির প্রলেপ দেওয়া। সাধুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সাবি হেসে চোখ বুজলো ; বললে,—কি, কথা বলছিস না যে ?

সাধু থেমে থেমে বললে,—কি বলবেক ? তু এতদিনেও মোরকে জানলি না সাবি ? তু ত পাথর—

সাবি হি-হি করে হেসে বললে,—তু পাথর সাঙা করবি সাধু ? পাথর গলাকে বাঁধবি কেনে ?

অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে সাধু চেয়ে রইল সাবির দিকে। সাবি চোখ বুজে হাসতে লাগলো—যেন কিছুই হয়নি তার। সাধুর অশ্রুভারাক্রান্ত চোখের এই আকুতির যেন কোন মূল্যই তার কাছে নেই।

সাধু কেবল ভাবছিল, কি রহস্যময় এই মেয়েটি, এর কথার মাঝে কিছুই

বুঝবার উপায় নেই। সাবি বললে,—ঘুমা কেনে, সারাটি রাত মোকে খুঁজলি—

সাধু পাথরটায় মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল,—চোখে পড়ল বটগাছের অসংখ্য পাতা, তার ফাঁকে পত্রের ছায়ায় বসে আছে দুটো পাখী। এক পায়ে ভর দিয়ে ঘাড় বাঁকা করে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে—কি যেন দেখছে সে কোন্ দূরে। একটা সঙ্গিহারা কাক বৃক্ষের সুউচ্চ শাখায় বসে কা-কা করছে—একটা বাছুর রোদের তাপে মাঠ ছেড়ে এসে বটের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে—ওদিকে উনুন থেকে ধোঁয়া উঠছে—

তরী হাসছে হি-হি করে—সাধুর চোখ বুজে এল—

দাসু এসে ডাকলো—উঠ্। সাধু-সাবি উঠ্, রান্না হলেক বটে—

রান্না হ'য়েছে, শালপাতায় ঢেলে নিয়ে তারা চাল-ডালের মিশ্রিত আহার্য্য খেয়ে নিল, তারপর বিশ্রাম করলে বটের ছায়ায়।

লগেন বললে,—উঠ্ সব—চল্ কেনে,—রাত হবেক। পথ অনেকটা রইছে বটে—চল্—

তারা রওনা হল—মেলা দেখা শেষ করে তারা ফিরছে ঘোড়ামারায়—তাদের গৃহে।

ঘোড়ামারায় তখন গোধন পায়ের ধুলায় পশ্চিমাকাশ মলিন করে গ্রামে ফিরে এসেছে। একটা বিবশ নির্জ্জনতা গ্রামখানিকে যেন মূখ করে রেখেছে। ওরা দূর থেকে গ্রামখানাকে দেখলো হর্ষপুরিত কণ্ঠে; তরী বললে,—উ ভালকুড়ি লয়? উই ত ঘোড়ামারা মোদের গাঁ বটে—

লগেন বললে,—হ; মোদের গাঁ—

পথে কালী ধাঙড়ের মেয়ে নোটন ঘুটে-সার গোবর কুড়িয়ে স্তূপাকার করছিল—জমির সার হবে। সে হেসে এগিয়ে এসে বললে,—সাবি, মেলা কেমন দেখলি বটে?

—ভাল—

—খেলা রইছে অনেক—লয়—

—হ, ম্যাজিক সার্কাস তর্জ্জা লেটো—

—কি কিনলি বটে— নোটন এগিয়ে এসে দেখলে সাবির হাতে কাঁচের রেশমী চুড়ি, সে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে, খুসী হয়ে বললে,—বেশ, ভাল চুড়ি হা, কত দাম বটে?

সাধু বললে,—হু'পয়সা একটা,—বড় দাম বটে—

—হ, তু দিলি সাধু—সাবিকে ?

সাধু সগর্ব্বে বললে,—হ।

পথে আরও দু-চারজনের সঙ্গে দেখা হল,—তারা কুশল প্রশ্ন করল তাদের, মেলার সংবাদ নিল।

তাদের মনে হল তারা যেন বহুদিন প্রবাসের পরে গ্রামে ফিরছে, গ্রামবাসী প্রতিবেশী উন্মুখ আগ্রহে তাদের অভ্যর্থনা করছে। সাবির হঠাৎ মনে হল,—যদি সে ঝুমুরীর দলে চলে যেত! যদি না ফিরতো—সাধুরা যদি জোর করে না ফিরাতো! এই গ্রাম, এই প্রতিবেশী, ওই ভালকুড়ি সব থেকে সে চলে যেত কত দূরে, আর হয়ত ফিরতো না এই গ্রামে। অকস্মাৎ মনে হল,—এই গ্রাম, তার অধিবাসী, সাধু লগেন দাসু এরা সব তার পরমাত্মীয়, এ গ্রাম বড় আপনার। এই গ্রাম যেন তার অস্থি-মজ্জার সঙ্গে রস ও রক্তের মত মিলে আছে—

সাধু তার পিছনে পিছনে আসছিল নির্ব্বাক ভাবে। সাবি হঠাৎ ফিরে বলল,—গ্রামকে ফিরছি বটে—লয়?—উ ত গ্রাম।—সাধু সাবির মনের কথাটা বোঝেনি।

সাবি একটু থেমে বললে,—কি সুন্দর মোদের গাঁ—লয়রে, সাধু—গাছের ফাঁকে উ মহিম জেঠার টালির ঘর—উ দেখা যাচ্ছে বটে—এমনটি কোথা আছে?

সাধু বললে,—পাহাড়ের বগলে এমনি গাঁ আর নাই কোথা—

তারা এসে পৌঁছিল গ্রামে—একটা কলকোলাহল উঠলো চারিদিকে। মেলার খবর নিতে লোক জড়ো হল সাধুর গৃহ-প্রাঙ্গণে। সাবি এসে দেখে মা রান্না তুলে দিয়েছে। সাবি বললে,—মোর চাল লিলি, মা?

—হ, তু দেরী করলি কেনে?

—উঃ মেলাকে এবার বড় মজা বটি—

সাবি মাথার পুঁটুলিটা দাওয়ায় রেখে পা ছড়িয়ে বসে মাকে মেলার গল্প বলতে সুরু করল।

এদের কাছে এই নূতনত্বই যথেষ্ট।

এমনি করে চলে ঘোড়ামারার জীবন।

ওরা কাজ করে। মাঠে প্রান্তরে, রৌদ্রে বৃষ্টিতে শীতে গ্রীষ্মে ওরা কাজ করে। প্রকৃতির দুরন্ত শিশুর মত মায়ের বুক থেকে দুধ খায়, তাকে জড়িয়ে

ধরে মা-মা বলে ডাকে। প্রকৃতির স্তন্য পান করে ওরা বেঁচে থাকে—জীবনের যুদ্ধ করে অমিত বিক্রমে। ওরা চলে—কাজ করে।

সেদিন ওরা সব হাটে গিয়েছিল। সাবি দু'হাজার পাতা নিয়ে গেছে হাটে। দু'টাকা দামে বিক্রি করে সওদা এনেছে,—মায়ের জন্যে পাঁপড় তেলেভাজাও এনেছে সাবি। তার সঙ্গে একটা সংবাদ এনেছে। সংবাদটা ওদের পক্ষে লোভনীয়—

জগৎপুরের ডাঙায় হাসপাতাল হবে—সরকারী হাসপাতাল। তার ইমারত তৈরী হবে,—ডাক্তার, নার্স প্রভৃতির বাসা তৈরী হবে। কাঁকুড়গাছির মণ্টুবাবু তার কন্‌ট্রাক্ট নিয়েছেন। এখন লাখ তিনেক ইঁট তৈরী হবে। তার জন্যে কুলি-কামিন চাই—

আজ হাটে ঢেঁড়া দিয়েছে—সাতটাকা করে হাজার দেবেন তিনি। সরকার বাঁধের থেকে মাটি এনে হাজার ইঁট তৈরী করলেই সাতটাকা। যারা কাজ করতে চায়, তারা কাল সকালে জগৎপুরের ডাঙায় যাবে। ডাঙ্গায় একটা ঘরও উঠেছে এরই মাঝে—যেখানে থেকে মণ্টুবাবুর লোক কাজ দেখাশোনা করবে—

এখন মাঠের কাজ নেই। দুইমাস অন্ততঃ এই কাজ করলে যথেষ্ট উপায় হতে পারে। ঘোড়াগারায় একটা নূতন রকমের উৎসাহ দেখা দিল—

পূর্ব্বে দুই-একজন ইঁট তৈরীর কাজ করেছে, মহিম জেঠা ইঁটের পাঁজা সাজানো ও পোড়ানোর কাজ শিখেছিল। ওই কাঁকুড়গাছির কলিয়ারীর বাড়ী-তৈরীর যত ইঁট তা মহিম জেঠারই পোড়ানো। সকলে তার কাছে উপস্থিত হলে, মহিম জানালে যে এই কাজে যথেষ্ট লাভ আছে। একটা কুলি ও একটা কামিন দু'দিনে এক হাজার ইঁট তৈরী করতে পারে। তা হলে রোজ পড়বে একটাকা বার আনা, কিন্তু অন্য কোনও কাজে এত রোজ হয় না। কিছুদিন পরে তিনদিনে দু'হাজার ইঁট হতে পারবে। কামিন মাটি তৈরী করে এনে দেবে, আর মনিষ তৈরী করবে, তাতে পড়তা ভালই হবে—

জোড়ায় জোড়ায় মনিষ-কামিন ঠিক হ'ল। দাসু আর লগেন, সাবি আর সাধু। তরী আর চারু। ধাঙড়দের নোটন আর ওপাড়ার বিষ্টু। ঠিক হল চাষ-আবাদ না আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত তারা কাজ করবে ওখানে—কাজের ফাঁকে ফাঁকে তারা জমিতে সার দেওয়া প্রভৃতি কাজ সেরে নেবে। মহিম জেঠা টাকার ভাগও বলে দিলে—হাজার-করা মনিষ চারটাকা, কামিন তিনটাকা।

এখন কাজ করাটা সব দিক দিয়েই সুবিধে, এই টাকাটায় ঘরদোর সারানো, লাঙল জোয়াল কাস্তে কুড়ুল প্রভৃতি চাষের জিনিসপত্র ঠিক করে নেওয়া যাবে এবং কিছু চাষের খরচও জোগাড় হবে। মহিম জেঠার উৎসাহে ঘোড়ামারার দশজন মুনিষ-কামিন কাজ করবে ঠিল হল।

জগৎপুরের নির্জ্জন ডাঙায় কর্ম্মব্যস্ততা দেখা দিল—

বড় ছত্রাকার বটগাছের নীচে মণ্টুবাবুর লোক দু'জন এসে একটা ছোট তালপাতার ঘর করেছে। সেখানেই তারা থাকবে—কাজ দেখবে—বটতলায় রান্না খাওয়া চলছে।

পরদিন ভোরেই ঘোড়ামারার সকলে মুড়ি বেঁধে নিয়ে চলল জগৎপুরের ডাঙায়—

দেখে ওরা বিস্মিত হ'ল। নির্জ্জন ডাঙাটায় যেন মেলা বসেছে—দশখানা গরুর গাড়ি কাঁদড় থেকে অবিরাম বালি আনছে। আর দশখানা কাঁকুড়গাছির খাদ থেকে কয়লা এনে একপাশে স্তূপ করছে। আগের দিনে কিছু কিছু ইঁট তৈরী হয়েছে, সেগুলো সাজিয়ে শুকোনো হচ্ছে। শহর বসে গেছে—

সাবি বিস্মিত হ'য়ে বললে,—দেখছিস্ সাধু। একেবারে শহর বসালে বটে রাতারাতি

সাধু বিজ্ঞের মত বললে,—কি দেখছিস্, হাসপাতাল হবে? ডাক্তার আসবেক, তখুন দেখবি—

অন্যান্য গ্রাম থেকেও অনেক লোক এসেছে। প্রায় পঞ্চাশ জন কুলি-কামিন হবে। মণ্টুবাবুর লোক জয়দেব দত্ত সকলের নাম লিখে নিয়ে, জোড়ায় জোড়ায় ইঁট তৈরীর স্থান প্রভৃতি নির্দ্দেশ করে দিলেন।

জয়দেব দত্ত বেশ সৌখীন লোক। আদ্দির পাঞ্জাবি, চকচকে একটা আধুনিক স্লিপার পায়ে, হাতে ঘড়ি, মুখে সিগারেট—চেহারাটাও ফরসা, একটু রোগা হ'লেও মানানসই। চেহারাটা মন্দ নয়,—ভালই বলা যায়। বয়স বছর আটাশ হবে। ক্লাস এইট থেকে নানা রোগে ধরায়, পড়া হয়নি, তবে কাজ করেছেন জীবনে অনেক! বহু রকমের চাকুরী করতে বহু দেশ ঘুরেছেন। জামা থেকে একটা এসেন্সের গন্ধ ভেসে আসছিল। তিনি সাবির অত্যন্ত সন্নিকটে এসে বললেন,—তোর নাম কিরে?

—সাবি বাউরী।

—তোর মনিষ—

—উঃ সাধু বাউরী।

সাবি সাধুকে নির্দ্দেশ করে দিল। জয়দেববাবু সাধুর দিকে একটু যেন কেমন বিরূপ ভাবে তাকালেন। তারপরে বললেন,—তুই ত বেশ জোয়ান, সাবি। ভাল করে কাজ করবি, আমার কাছে অনেক দিন কাজ পাবি—

জয়দেব তাদের ঝুড়ি কোদাল, বাঁধের মাটি কাটবার স্থান ও ইঁট তৈরীর স্থান ঠিক করে দিলেন। ওরা কাজ আরম্ভ করলো। মাটি কেটে জড়ো করলে সাধু। সাবি জল এনে কাদা করলে। সাধু বালি আর ফর্ম্মা নিয়ে ইঁট তৈরী সুরু করল। সাবি মাটি তৈরী করে বয়ে আনছে আর সাধু ফর্ম্মায় ফেলে ইঁট তৈরী করে বালির উপর রেখে দিয়ে যাচ্ছে।

কাজ চললো এমনি—ওদের পাশে বিষ্টু আর নোটন, তার পাশে দাসু লগেন, তার পাশে চারু আর তরী।

নোটন ধাঙড়—বয়স এই বছর কুড়ি হবে। বিয়ে হ'য়েছিল দূর গ্রামে, স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয়নি, তাই ফিরে বাপের ঘরে এসেছে। এখানেই থাকে,—সাঙ্গাও হয়নি, তবে গ্রামের মাঝে তার সুনাম নেই। সে স্বাধীনভাবে যা খুসী করে—বিষ্টু জুটেছে ওর সঙ্গে এখন, একসঙ্গে কাজ করে, ঘোরাফেরা করে। লোকে দু'চার কথা কানাকানি করে, তবে বলে না কেউ কিছু—বলাটা এ সমাজে নেই।

জগৎপুর থেকে পুব দক্ষিণ টানে দেখা যায় কাঁকুড়গাছির কোলিয়ারীর চিমনী নিঃসৃত ধোঁয়া, আর পিছনে দেখা যায় ভালকুড়ির উন্নত উদ্ধত চূড়া। বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝে উর্বর এই জগৎপুরের ডাঙা। একটা বটগাছ ছত্রাকারে অনেকখানি জুড়ে আছে, আর সরকার বাঁধের ধারে ধারে তাল বাবলা আর তেঁতুল গাছ কয়েকটি আছে। চৈত্রের পাংশু মৃত্তিকায় ওরাই তামাটে সবুজ, বাকী সব লাল বালি আর ধূসর পাথর।

কাজ আরম্ভ হ'য়েছে ভোরে,—ধীরে সূর্য্যতাপ উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে। সাধু কোমরের গামছা খুলে মাথায় বেঁধেছে, সাবি আঁচল জড়িয়েছে কোমরে আর মাথায় বিঁডেটা বেঁধেছে খোঁপার পিছনে।

কয়েক গাড়ি তালপাতা এসে পডলো। সাবি বললে,—সাধু, উঃ তালপাতা কেনে?

—কে জানছে—

পাশের লোকটা ভিন্ গাঁয়ের। বললে,—ঝড়-বাদল হলে, উ চালা দেবেক, —ইঁট সামলাবেক—

সাধু বললে,—হ বটে, সেবারকে উ কাঁকুড়গাছিতে দেখছিস্ নাই ?

সাবি 'হুঁ' বলে আবার কাদা আনতে চলে গেল—

জয়দেববাবু ছাতা মাথায় দিয়ে দেখতে এলেন,—সাবিকে বললেন,—ঐ মাটি ভাল হয়নি, ইঁট ফেটে যাবে। আর একটু ছানতে হবে—

জয়দেব একটু এগিয়ে নোটনের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন,—তোর নাম কি ?

নোটন ফিক্ করে হেসে বলল,—নোটন—

—তোরা কি ?

—ধাঙড় বটে— সে আবার হাসলে।

জয়দেব নোটনের মুখের দিকে চেয়ে কি যেন দেখলেন, তার পরে একটু হেসে বললেন,—ভাল করে মাটি ছানবি। নইলে দাগ কম হবে—

নোটন বললে,—মাটি তো মোলাম করলেক,—ত্যাখ কেনে। সে এক ঢেলা মাটি নিয়ে এগিয়ে গেল দেখাতে। জয়দেব সভয়ে পিছিয়ে যেয়ে বললেন,—গায়ে দিবি নাকি ?

নোটন হি-হি করে হেসে বললে,—বাবুর ডর লাগলেক রে !

জয়দেব বললেন,—তোকে ভয় করবো কেন, কাদা গায়ে লাগবে না ?

নোটন ফিক্ করে হাসলো—

জয়দেব ছাতা নিয়ে দেখাশুনো করতে লাগলেন।

*

জয়দেব দত্ত পুরাতন পাপী,—কোলিয়ারী, কন্ট্রাক্টর, মুদিদোকান, সোনা-রূপার কাজ, দালালি, মাল আদান-প্রদান প্রভৃতি বহু কাজ জীবনে করেছে এবং বহু দেশেও গেছে। দু'একবার জেল হতে হতে বেঁচেও গেছে। বিদেশে চরিত্রের জন্য দু'একবার প্রহারও হয়েছে তাঁর। তবে গুণও তার আছে, মনিবের পা চেটে, জুতো টেনে সে মনিবকে জয় করতে পারে—এমনি তার ব্যবহার—চোর, মিথ্যাবাদী এবং বিশ্বাসঘাতক জেনেও তাকে কিছু বলবার উপায় নেই। এমন তার ব্যবহার যে, যত বড় অন্যায়ই সে করুক, চক্ষুলজ্জায় তা কোন ভদ্রলোক বলতে পারে না। অন্যায় ধরা পড়লে, তখনই স্বীকার করবে এবং এমনভাবে পায়ে পড়বে যে, সেই কাজই আবার করবার আদেশ পাবে। অথচ মনিবের হয়ে অন্যের উপর যখন সে খবরদারী করবে তখন

সে গনিবের চেয়েও উল্টো, তার চেয়েও সাংঘাতিক। মণ্টুবাবু এই জয়দেবকে নিযুক্ত করেছেন ইঁটের পাঁজা দিতে। অমনি লোক না হলে জগৎপুরের ডাঙায় তালপাতার ঘরে থেকে, নিজে রান্না করে খেয়ে দিনরাত্রি কাজ করতে কে চাইবে? জয়দেবের সঙ্গে একটা চাকর বা সাহায্যকারী আছে, তার নাম রতন বাগদী। বয়স হয়েছে, সে কাজ করতে পারে না,—মণ্টুবাবুর পোষ্য, খোরাকী আর পাঁচটাকা মাইনেয় নিযুক্ত হ'য়েছে। সে জয়দেবের সাহায্য করে।

সূর্য্য ধীরে ধীরে মাথার উপর উঠে তীব্র খররৌদ্র বর্ষণ করছে—বায়ুস্তর ঝিলমিল করতে আরম্ভ করেছে। কুলি-কামিনরা কাজ করে ক্লান্ত হয়েছে। বেলা প্রায় এগারটা। জয়দেব হেঁকে বলল,—এই তোরা সব টিফিন করে নে,—মুড়িটুড়ি খেয়ে নে,—তারপর কাজ করবি।

কুলি-কামিন সব গামছায় বা ন্যাকড়ায় বাঁধা মুড়ি বাঁধের জলে ডুবিয়ে নিয়ে পেঁয়াজ-লঙ্কা দিয়ে খেতে বসে গেল,—কেউ তেঁতুলতলায় বিচ্ছিন্ন ছায়ায়, কেউ বা তালগাছের শীর্ণছায়ায়, কেউ এসে খেতে বসল বটগাছের তলে।

নোটন আর বিষ্টু বসেছিল বটতলায়,—সাধু সাবি তরী ওরা বসেছিল তেঁতুলতলায়। বিশ্রাম করছিল আর গল্প হচ্ছিল নানা রকম।

নোটন খেয়ে নিতেই তালপাতার ঘরে তার ডাক পড়লো। রতন এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেল। নোটন ঘরে ঢুকলো রতনের সঙ্গে—

তরী বললে,—উ সাবি, দ্যাখ কেনে, নোটন উ ঘরকে ঢুকলে—

সাবিও দেখলো। সে বললে,—বাবু ডাকল বটি—

—হ, উকে বাবু ডাকবেক কেনে,—নোটন কি হলেক উঃ—

কিছুক্ষণ বাদে নোটন কয়েকখানা বাসন নিয়ে বাঁধের ধারে গেল। সাবি বলল,—উ বাসন মাজা করালেক বাবু,—উরা ত হেথাই রাঁধবেক—লয়?

সাধু বললে,—কত জিনিষ পত্তর রইছে,—দিনরাত হেথা রইবে না?

বাসন ধুয়ে নিয়ে নোটন ঘরে ঢুকলো। ঘরের ভিতরে দু'টো চারপাই,—একধারে কিছু ঝুড়ি কোদাল, ইঁটের ফর্ম্মা। মাটির কলসী সরা—বাইরে রেঁধে খেয়ে বাসনপত্র ঘরেই রাখা হয়।

নোটন বললে,—লে বাবু, তুর বাসন, [illegible] ঝক্‌মক্ করছে—

জয়দেব বলল,—বেশ—বেশ হ'য়েছে, নোটন। তুই বোস, নে—বিড়ি খা একটা।

নোটন সাগ্রহে বিড়ি নিয়ে টানতে লাগল,—মেঝের উপর বসে বললে,—বাবু, তুর দেশ কোথা ?

জয়দেব বললে,—এই যেখানে আছি, এই বটতলা—

—তুর বিয়া হইছে ?

—না, তোরা থাকতে বিয়া করবো কেন ?

নোটন হি-হি করে হাসলে। জয়দেব বললো,—নোটন, তু মদ খাস্ না ? ভাল করে আমার কাজ করবি,—বাসন মেজে জল এনে দিবি, তোকে শনিবার মদ খাওয়াবো।

—মদ কোথা ?

—হ্যাঁ, ভাল মদ দেব দেখবি, ভাল মাল—

নোটন বললে,—কাজ ত করছি বটে। উ বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট্,—সব করে দেবেক—তু শুধু মদ খাওয়াবি—

—না, মাঝে মাঝে এখানে আসবি—খাবি।

নোটন হিহি করে হাসলো,—বাবু বটে তু। হেথা রইবে কেনে বল না ?

জয়দেব বললে,—সে দেখবি। মুরগী মারবো সেদিন—

সারাদিন কাজ চললো—

দ্বিপ্রহরের যে তীব্র তীক্ষ্ণ রৌদ্রে মানুষ ঘর থেকে বেরুতে ভয় পায়, পাথর কাঁকরের উপর খালি পা রাখা চলে না, বটতলায় তালপাতার কুঁড়েয় বসেও জয়দেব পাখায় হাওয়া খেয়ে ক্লান্ত হয়।—সেই তীব্র রৌদ্রে এরা সারাদিন ইঁট তৈরী করলে। বেলা প্রায় চারটায় যখন সূর্য্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ল, তখন এরা রওনা হল বাড়ীর দিকে।

ঘোড়ামারার কুলিকামিনের দল ভালকুড়ি পাহাড়ের ছায়া পেরিয়ে, শালবনের ধার দিয়ে গ্রামের প্রান্তে এসে উপস্থিত হল। সাধু বিষ্টু নগেন বললে,—বস্ হেথা অশথতলে, চুটি খেয়ে লি। কাঁদড়কে চান করে ঘরকে যাবো—

তারা ঘরে তৈরী চুটি ধরিয়ে বসল। নোটন বিষ্টুর হাত থেকে চুটিটা কেড়ে নিয়ে বললে,—দে, খাচ্ছে ত খাচ্ছেই, দেবেক নাই। পেটটা ঢিস্ হলেক বটে—

বিষ্টু হাঁ করে তাকিয়ে থেকে হাস্‌লো—কিছু বললে না।

নোটন অমনি প্রগলভ,—সে জীবনটাকে ভাসিয়ে দিয়েছে নিজের খেয়াল খুশীতে। নীতিজ্ঞান তার কমই, তার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাহীনতাও এসেছে। এটা গ্রামের সকলে ভাল চোখে দেখে না। কিন্তু শাসন করবারও কিছু নেই। ধাঙড়-পাড়ার মোড়ল কালী ধাঙড়, নোটন তারই মেয়ে।

তরী হঠাৎ প্রশ্ন করলে,—নোটন, তুকে বাবু ডাকলে কেনে ?

নোটন হেসে বললে,—বাসন ধোয়া করালেক,—বললেক,—পয়সা দেবে, মদ খাওয়াবে। উর বাসন ধোয়া করবেক, ঘর ঝাঁটু দেবেক—

তরী বললে,—আর কি বললেক,—

বললে,—মদ খাওয়াবেক, রাতকে রইতে বললেক,—

তরী মুখ ঘুরিয়ে বললে,—এলি কেনে, রাতকে হোথা রইলি না কেনে ?

—রইবেক, মুরগী মদ খাওয়াবেক যেদিন—

নোটন হি-হি করে হাসলে। বললে,—বাবুটার চেয়ারাটো দেখছিস্ বটে !

সাবি এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। সে অধৈর্য্য হয়ে বললে,—হ, তুকে বিয়া করবে, ঘরকে লিয়ে যাবে—

নোটন বললে,—বিয়া করবেক নাই রে সাবি, সাঙা করবেক—টাকা দেবেক, রস খাওয়াবেক—তু' চল্ কেনে, দুজনকে রাতকে রইব—

—হ, মোরা যাবেক কেনে, তু যা, তুর বাবুর চেহারাটা দেখ কেনে—

নোটন বললে,—হ, বাবুটা মোর বটেক। বাসন ধোয়া করালেক, তা কি বলবেক—

লগেন বললে,—চল্ চল্, কাঁদোড়কে যাই—

তারা বিশ্রামান্তে স্নান করে ঘরে গেল—

সাবির মা রান্না করে রেখেছিল। সাবি বললে,—দাঁড়া মা, গরু-মুরগী সব তুলেলি, ডিবা জ্বালিয়েই খাবেক—

সাবি গরু গোয়ালে তুলে জাব দিল, হাস-মুরগী তুলে দিল ঘরে। তার পর সন্ধ্যার পরে কেরোসিনের ডিবা জ্বালিয়ে ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ল। কাল ভোরে আবার যেতে হবে জগৎপুরে—তাদের টাকা দেওয়া হবে হাজার ইঁট তৈরী হলে—

এমনি করে জগৎপুরের ডাঙায় ইঁট তৈরী হচ্ছে—হাসপাতালের ইমারত হবে। কুলি-কামিনরা সকলে বাড়ী থেকে চা-মুড়ি খেয়ে কাজে লাগে,

দ্বিপ্রহরে বাঁধের জলে মুড়ি ভিজিয়ে খেয়ে বৈকাল পর্য্যন্ত কাজ করে,—তার পর গৃহে ফিরে আসে। ওদের আয়ু শক্তি ও শ্রমের বিনিময়ে নির্ম্মিত ইঁট—ওদেরই মাথায় উঠে চুনবালি সিমেণ্টের সঙ্গে যাবে ভিতে, দেয়ালে, ছাতে—তৈরী হবে ইমারত—বাস করবে তাতে ডাক্তার, নার্স, হাসপাতালের রোগী। ওরা থাকবে ভালকুড়ির পাশে ঘোড়ামারায়, খড়ের চালের নীচে মাটির দেওয়াল-দেওয়া ঘরে শীতের তিনমাস,—বাকী ক'মাস ঘুমুবে গৃহ-প্রাঙ্গণে চারপাইয়ে শুয়ে। ওদের ইমারতের প্রয়োজন নেই,—তার বদ্ধতার মধ্যে ওরা শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে যায়—উদার প্রকৃতির ডানার নীচে না হলে ওদের ভাল লাগে না—

চৈত্রের প্রথমেই প্রায় একলক্ষ ইঁট তৈরী হয়ে গেল—একটা বড় পাঁজা দিতে হবে। তার কয়লা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়ে গেছে। ওরা হাজার-করা সাত টাকা পাচ্ছে,—তবে ভাঙা বা জখম ইঁট গুণতিতে বাদ যায়—জয়দেববাবু হিসাব করে টাকা দেয়।

নোটন মাঝে মাঝে জয়দেববাবুর আদেশ মত থেকে যায়। নোটনের পরণে বর্ত্তমানে একটা তাঁতের নতুন শাড়ী, সে রঙীন কাপড় পরেই ঘোরা-ফেরা করে। বিষ্টু তার সঙ্গে ইঁট তৈরী করে বটে, তবে ইঁট তার সপ্তাহে হাজারও হয় না। তথাপি বিষ্টু কাজ ছাড়েনি। নোটনের এই পরিবর্ত্তন দেখে অনেকেই মুখ টিপে হেসেছে,—নোটন কিছু মনে করেনি, বরং সে যেন তার সৌভাগ্যের গর্ব্বে বেশী রকম চঞ্চল হ'য়ে কোমর দুলিয়ে রঙীন শাড়ীর আঁচল জড়িয়ে সগর্ব্বে কুলি-কামিনদের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। সাবি হাসে, তরী রুষ্টস্বরে মাঝে মাঝে দু'একটা মন্তব্য করে। আর সকলে নির্ব্বাক—

সেদিন দু'রাত্রি বাদে নোটন ওদের সঙ্গে বাড়ী ফিরে এল। অশ্বত্থতলায় বসে যখন সকলে চুটি খাচ্ছিল, তখন তরী বললে,—নোটন, জগৎপুরের ডাঙ্গায় রাতকে কি করছিস্,—হোথা থাকিস্ কেনে?

নোটন চুটিতে দম দিয়ে বললে,—তু জানছিস্ না,—থাকবি হোথা একরাত, দেখবি কেনে কি করছি—

তরী বললে,—পোড়াকপাল তুর, তু থাক্ কেনে হোথা তুর বাবুর কাছকে—

—মু ত থাকছি বটে—

—কি করছিস্? বল কেনে?

নোটন একটু হেসে চুটিতে একটু টান দিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললে,—

সেদিন মুরগী মারলে, বাবু বললেক—নোটন, তু মোরগটা তৈরী কর কেনে। তৈরী করছি মুরগী,—বাবু বললেক—মুরগী তৈরী করবি, তু খাবি না?—হ খাবেক নাই কেনে? বাটনা বাটা করলেক, বাসন ধোয়া করলেক—ই সব—

সাবি বললে,—উ রতন চাকর রইছে না,—উ কি করছে?

—উ ত সন্ধ্যাতক কেবল চোখ বুঁজে রইছে—রাতকে চোখে দেখে না, নড়তে ডর লাগে।

তরী বললে,—তু মুরগী খাওয়া করলি?

—হ, মুরগী খাওয়া করলেক, বাবু চোলাই রস দিলেক, ও খাওয়া করলেক—

—আর কি করলি?

—বাবু যা বললে উ করলে বটে,—বাবু ভাল লোক বটি—উ সব বলবি না—

—ই তুকে শাড়ী দিচ্ছে, টাকা দিচ্ছে—

নোটন হি-হি করে হেসে বললে,—দেবেক নাই কেনে,—উ কত কাজ করছি,—রাতকে ডাঙ্গাকে পাহারা দিচ্ছি,—বাবুর ত ভুতের ডর লাগছে—রাতকে ভুত তাড়া করছি—

নোটন হি-হি করে হাসে,—অর্থ সকলেই বুঝে,—তারা তা জানে। কিন্তু তাদেরই একজন ঠিক এমনি করে দেহ পণ্য করেছে সেটা ঠিক যেন তারা গ্রহণ করতে পারছে না। তাদের সতীত্ববোধ খুব প্রখর নয়—অর্থের জন্যে দেহকে পণ্য করা তারা ঘৃণা করে। তবে প্রেমের জন্যে, অন্তরের আকর্ষণে দেহদানকে তারা নিন্দা করে না।

সাধু হঠাৎ বললে,—চল্ সাবি, উ নোটনকে ভুতে ধরেছে বটে—চল্—

সাবি তার পিছন পিছন উঠে গেল, তরী মুখ বাঁকিয়ে তাকিয়ে রইল সেইদিকে, তারপর সকলেই কাঁদোড়ে গেল স্নান সেরে নিতে।

*

সন্ধ্যার পর জগৎপুরের ডাঙা নির্জ্জন হয়ে গেছে—

রতন একসের পচুই খেয়ে বুঁদ হয়ে বসে আছে। জয়দেব কিছু রস টেনে নোটনকে বললে,—নোটন চা কর—চা'র কেটলিটা তুলে দে, চা করছি—

নোটন চা'র কেটলি ধুয়ে উম্নুনে তুলে দিল,—চা'র জল সিদ্ধ হচ্ছে—

জয়দেব বললে,—রতন, আটা মেখে রুটি কর,—আজ আর ভাত রাঁধা যাবে না। রুটি-মাংস জমবে ভাল। নোটন, তুই মুরগীটা তৈরী করে ফেল—

নোটন বললে,—দাঁড়া কেনে বাবু চা'টো খেয়ে লি—

আকাশে সেদিন চাঁদ উঠেছে, শুক্লা অষ্টমীর চাঁদ। কিন্তু জোছনা ঘোলাটে, সঞ্চরমাণ মেঘে মাঝে মাঝে জগৎপুরের ডাঙাকে অন্ধকার করে দিচ্ছে। নির্জ্জন এই ডাঙার প্রায় এক মাইলের মাঝে কোথায়ও কোন গ্রাম নেই,—ডাঙার উপর তিনটি প্রাণী—রতন, জয়দেব আর নোটন।

জয়দেব কুঁড়ে থেকে খাটিয়া বের করে উন্মুক্ত আকাশের নীচে বিছানা করে শুয়েছে,—দিনের উত্তপ্ত হাওয়া ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। জয়দেব আরাম করে শুয়ে ডাকলে,—নোটন, চা'র জল ফুটেছে রে? আসবো?

—হ;—ফুটতে লেগেছে বটে—

জয়দেব চা করতে উঠে গেল,—তিনখানা পাথর দিয়ে তৈরী উনুনে জল ফুটছে। আগুনের রক্তাভা নোটনের মুখে পড়েছে—জয়দেব বললে,—নোটন, তোকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে—বুঝলি?

—সে ত জানছি বটে,—

রতন বললে,—হ, নোটন ত সুন্দরই হইছে বটে, ডপ্‌কা কামিন ত বটে,—বয়সটা কি!— রতন হাসলে একটা অদ্ভুত শব্দ করে।

নোটন বললে,—তুর তাতে কি, বুড়া কথা বলছে শুনছো—বাবু—

রতন নেশার ঘোরে বললে,—হ, কত বাবু দেখলাম বটে, কত কামিন দেখলাম বটে—জোয়ান ত ছিলাম, তুর বয়স ছিল। কত কামিন এয়েছে গেছে বটে—

রতন আর না বাড়িয়ে ময়দা মাখতে বসে গেল। জয়দেব চা করে বললে,—রতন, খাবি চা?

—খাবেক নাই কেনে,—বাবুর পেরসাদ খাবেক, সব পেরসাদই খাবেক রতন—

রতন কি ভেবে কথাটা বলেছে তা সেই জানে। রতন তার মাটির ভাঁড়টা নিয়ে এগিয়ে এল চা নিতে। নোটন আর জয়দেব উনুনের অদূরে চা ভাগ করছে, রতন এসে তার ভাগ নিয়ে গেল। জয়দেব চারপাইয়ে এসে বসে চা খেতে সুরু করলে। রতন ডাকলো,—নোটন, তু শোন, এ মোরগটা বানা কেনে?

—হ, যাই।

—বুড়াকে ঠাট্টা করলি বটে নোটন, বুড়ার ঝালটা দেখবি বটে—

—হ, দেখছি—

জয়দেবের মুরগী আর মদের পয়সার অভাব নেই। মুরগী সস্তা—এক টাকায়

প্রায় তিনপো একটা হয়। আট আনা দশ আনা মহুয়ার মদের বোতল। আর ভাঙা ইঁটের হাজারও মণ্টুবাবুর নিকট হিসাবে সাত টাকাই। চায়ের পরে জয়দেব বোতল খুলে বসে হাঁকলে,—রতন, মুরগীটা বানানো হ'ল রে ?

—হ, হইছে বটে—

—এধারে আয়, রস খেয়ে নে—

নোটন রস খেয়ে নিলে। জয়দেব মাংসটা চাপিয়ে দিয়ে রতনকে বললে,—রতন, কাঠ দিবি উনুনে—উনুন নিভে যায় না যেন—

জয়দেব নোটনকে বললে,—গা-টা বড় ম্যাজ-ম্যাজ করছে, একটু টিপে দে ত—

নোটন জয়দেবকে সেবা করতে আরম্ভ করলো—ঘোলাটে জোছনা-প্লাবিত আকাশের নীচে।

*

রতনও প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হয়নি। রাত্রের আহারাদির পরে জয়দেব খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে বললে,—নোটন,—ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যা—

রতন কুঁড়ের অদূরে তালাই বিছিয়ে শুয়ে পড়ল,—তার নেশা লেগেছিল—সে গান করতে করতে আবোল-তাবোল বকলে, তার পর এলিয়ে পড়ল –

নোটন জোয়ান, প্রকৃতির কোলে পরিশ্রম করে জীবনধারণ করে। তার প্রতিটি রক্তকণিকা সতেজ—স্নায়ু, পেশী, গ্রন্থি সতেজ সবল। দেহে শক্তি, শীতাতপে অদ্ভুত সহনীয়তা—সে প্রকৃতির মেয়ে। ভালকুড়ি পাহাড়ের চড়াই ভেঙে, শালগাছের পাতা ভেঙে, রৌদ্রে বৃষ্টিতে ধান পুঁতে, ক্ষেত্রে কাজ করে রোদে জলে শীতে গ্রীষ্মে মজবুত হয়ে উঠেছে তার দেহ,—উদার প্রান্তরের হাওয়া-বাতাসে সে-দেহে বৃদ্ধি ও শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ হ'য়েছে। কিন্তু জয়দেব সভ্য জীব—জুতা পায়ে দিয়ে, ছাতা মাথায় দিয়ে, রোদ-বৃষ্টি থেকে দেহকে বাঁচিয়ে সে বড় হয়েছে। ঠাণ্ডার ভয়ে জানালা বন্ধ করে বদ্ধ ঘরের হাওয়ায় নিশ্বাস গ্রহণ ক'রে তার দেহ বড় হয়েছে, কিন্তু পুষ্টিলাভ করেনি। শহরের বাঁধানো রাস্তায় বাঁধা জীবন নিয়ে সে কাটিয়েছে অনেক দিন—তার রক্তকণিকা অপ্রাকৃত, স্নায়ু গ্রন্থি পেশী দুর্ব্বল। তারপর অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতায় দেহ হয়েছে অসার সেগুন কাঠের মত।

নির্জ্জন জগৎপুরের ডাঙায় আকাশের চাঁদের নীচে জয়দেব খাটিয়ায় শুয়ে দেখছিল অনেক কিছু। আকাশের কোলে ভালকুড়ি দাঁড়িয়ে আছে কালো মাথা তুলে। বাঁধের তেঁতুলগাছটির পাতাগুলো চিকচিক করছে

জোছনায়,—ঘোলাটে জোছনায় ডাঙাটা যেন রক্তহীন শুভ্রতায় ঢেকে গেছে। ডাঙায় রয়েছে তিনটি মাতাল—দেহের চেতনা এখনও যায়নি, মন বিভ্রান্ত হ'য়েছে—দেহটা বিকল হয়েছে মাত্র। জয়দেব চাঁদের দিকে চেয়ে ডাকলে,—নোটন, তুই এদিকে আয়—

নোটন বললে,—লিয়ে যা কেনে,— নোটন হি-হি করে হাসলে। বাবুর সঙ্গে সে মশকরা করছে।

—তু যদি হাত ধরে লিয়ে যাবি, তবে যাবেক—

জয়দেব টলতে টলতে এসে নোটনের হাত ধরে টানতে সুরু করলে। কিন্তু নোটন অনড় অচল। সে খিলখিল করে হেসে বললে,—হ বাবু, তু মরদ বটি,—হাতটা ধরে তুলতে লারলি! দেখবি ?— নোটন বাবুর হাত ধরে একটা ঝট্‌কা টান দিলে, জয়দেব হুড়মুড় করে এসে পড়লো নোটনের পাশে।

নোটন হি-হি করে হেসে বললে,—তু কেনে ডাকছিস নোটনকে, বল কেনে ? নোটন ত হেথা রইছে বটে—

জয়দেব বললে,—হাতটা ভেঙে দিলি বুঝি,—টনটন করছে যে!

—ইয়াতে টনটন করতে লেগেছে—হুঁ, তু মরদ বটে—·· ···তুর চেয়ারাটা ভাল বটে বাবু—

নোটন আরও অনেক কথা বললে নেশার ঘোরে, তারপর হঠাৎ জয়দেবকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে দূরে—মাতাল জয়দেব দূরে ছিট্‌কে যেয়ে পড়ল ডাঙায় কাঁকরের উপর—সেখানেই পড়ে রইল সে-রাত্রের মত। নোটন বললে নিজের মনে,—মরদ বটে—হুঁ, ক্ষেমতা তুর কত, নোটন নোটন করতে লেগেছে বটে,—হ বাদুড়-চোষা বাবু, ড্যাক কেনে—

তন্দ্রাচ্ছন্ন জগৎপুরের ডাঙায় সব নীরব হয়ে গেল। ভালকুড়ি পাহাড়ের কোলে শেয়াল ডাকলো কয়েকবার,—নৈশ পাখী উড়ে গেল ডাঙার উপর দিয়ে। রতনের নাক ডাকছে অবিরাম—বটগাছের পাতা কেঁপে উঠল শিরশির করে—জয়দেব পড়ে রইল পাথরের ডাঙায়—

*

পরদিন ঘোড়ামারার দল এসে পৌছল খুব ভোরে—তখনও সূর্য্যোদয় হয়নি, সবে ফরসা হয়েছে মাত্র।

সাবি তরী সাধু এসে দেখলো বিবস্ত্রা নোটন তালাইয়ে শুয়ে আছে, আর ইজের-পরা বাবু তার খাটিয়ার অদূরে ডাঙায় পাথর-কাঁকরের মাঝে পড়ে আছে মুখ গুঁজে। রতন কুঁড়ের দরজায় বসে বিড়ি টানছে—

সাধু এই দৃশ্যটার দিকে ইঙ্গিত করে বললে,—রতন-দা, এ কি হলেক—বাবু ভুঁয়ে রইছেন—

রতন নির্ব্বিকারভাবে বললে,—হ, লোটনের লাথি খেলেক বুঝি রাতকে, আর উঠতে লারছে—

কথাবার্ত্তায় নোটন উঠে বসল। চেয়ে দেখলে, জয়দেব মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সে তাকে তুলে এনে বললে,—বাবু, হেথা খাটিয়াকে শো কেনে—

জয়দেব খাটিয়ায় শুয়ে পড়লো।

ওরা কাজ সুরু করলো যার যার স্থানে। সাবি হাসতে হাসতে সাধুকে প্রশ্ন করলে,—সাধু, বাবু ভুঁয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে কেনে বল সাধু—

সাধু বললে,—কে জানছে। রস খেলেক, তাই মাতাল হ'য়ে ভুঁয়ে গড়াগড়ি দিলেক—

—উ নোটনকে দেখলি বটে, উ ত কেমনে শুয়ে রইছে—কাপড়টো ত লেই-ই— সাবি খিলখিল করে হেসে উঠলো

সাধু বললে,—হ, রাতকে উরা কি করলেক, মু জানবে কেমনে বল কেনে ?

সাবি বললে,—বাবুটো ত ভাল নাই। উ ত নোটনকে খারাপ করলেক।

—হ। নোটনটাই বাবুকে খারাপ করলেক বুঝি, ছাখ কেনে ?

—রতন বললে, নোটনের লাথি খেলেক রাতকে—

—হ। রতন ত মাতাল বটে, উ কি জানছে ?

সাধুর মনে হল, সাবিও এমনি করে ঝুমুরীর প্ররোচনায় মদ খেয়ে বাবুদের সঙ্গে যেয়ে তিরিশ টাকা নিয়ে এসেছিল। নোটনও আজ বাবুর ফাঁদে পড়ে আছে মদ ও টাকার জন্যে। সাধু ইঁট তৈরী করতে করতে বললে,—হ। যা কেনে, মাটি ফুরালে বটে—

সাবি আর এক ঝুড়ি মাটি এনে দিয়ে দাঁড়ালো। সাধু বক্রেশ্বরের মেলায় সেই অন্ধকার আমবনের দৃশ্যটা দেখছিল মনে মনে। সে হঠাৎ বললে,—সাবি, তু ত বক্রেশ্বরে এমনটিই রস খেলি, বাবুদের ঘরকে গেলি—

সাবি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে দপ করে জ্বলে উঠল। বললে,—তুর কি ? তু মোর মনিষ বটি, না মু তোর কামিন বটি ?

সাধু হেসে বললে,—তু মোর কামিন বটে, মু তোর মনিষ নাই—

সাবি বললে,—সাঙ্গা করবি ?

—কেনে করবেক নাই ?

—মু ত রস খেয়ে বাবুদের ঘরকে এক রাত রইলেক—তু সাঙ্গা করবি কেনে ?

—করবেক, করবেক। রসের নেশায় তুকে বাবুদের ঘরকে লিলে, তু ত যাস্ নি? উ ঝুমুরী তোকে ফাঁকি দিয়ে লিলেক—

—তবে উ বলছিস কেনে?

সাবি রাগতভাবে কোমর দুলিয়ে, উদ্ধত পা ফেলে চলে গেল মাটি আনতে।

ওদিকে তরী লগেনকে বললে,—উ নোটনটা সেখানে শুয়ে রইছে, দেখলি লগেন—

—হ, বাবু ভুঁয়ে গড়াগড়ি দিলেক,—রস খেয়ে বেহুঁস হ'য়ে গেলেক রাতকে—

—উ বাবু নোটনের লাথি খেলেক নাই?

তরী হি-হি করে হেসে উঠলো। লগেনও হেসে উঠলো।

ঘোড়ামারার সকলে এই নিয়ে অনেক কথাই বললে। অনেক আলোচনাই ওরা করলে। কিন্তু নোটন রঙীন শাড়ী পরে তাদের সামনে দিয়ে সগর্ব্ব পদক্ষেপে কয়েকবার ঘুরে গেল; তাকিয়ে হাসলে, কিন্তু কোন কথা বললে না।

তরী বললে,—নোটন, ঘরকে যাবি না?

—না। হেথা মাংস খাচ্ছি, রস খাচ্ছি, ঘরকে কোনটো রইছে—

তরী হি-হি করে হেসে বললে,—আর কি রইছে রে? তুয়ার বাবুটো রইছে রে!

—হ, বাবু ত তুদেরও বটে, থাক্ কেনে রাতকে—নোটন হেসে চলে গেল।

*

সেদিন রাত্রে একটি মেঘের আনাগোনা দেখা গেল—

জ্যোৎস্না অস্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। সাদা মেঘের নীচেটা যেন জলকণায় কালো হয়ে উঠেছে—মনে হয়, ঝড়বৃষ্টি না হলেও, ঝিমঝিম বৃষ্টি হতে পারে। দক্ষিণের বেগবান বাতাসটা হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেছে—রাত্রে পশ্চিম থেকে যে হিমেল হাওয়া বইত, তাও থেমে গেছে। গুমোট গরম পড়েছে—এটা বৃষ্টির পূর্ব্বাভাস।

সকালে ঘোড়ামারার দল যখন জগৎপুরের ডাঙায় কাজ করতে গেল তখন সূর্য্য উঠেছে কিন্তু আকাশ মেঘলা,—আলো আছে কিন্তু রোদ নেই।

ওরা ইঁট তৈরী করতে সুরু করলে—

হঠাৎ গরুর গাড়ী করে মণ্টুবাবু এসে উপস্থিত হ'লেন। একটা চঞ্চলতার

হাওয়া বয়ে গেল ডাঙায়। জয়দেব আর রতন ছুটে গেল বাবুর কাছে। জয়দেব তাকে হাত ধরে নামালে। রতন গাড়ী থেকে জুতা বের করে পায়ের কাছে এগিয়ে দিল।

মণ্টুবাবু এগিয়ে এলেন সাজানো ইঁটের কাছে। প্রশ্ন করলেন,—কত শুকনো ইঁট আছে?

জয়দেব বললে,—খাতা নিয়ে আসি—

সে ছুটে গিয়ে খাতা নিয়ে এল এবং বললে,—আজ্ঞে, আশী হাজার হয়েছে—

মণ্টুবাবু বললেন,—আজই পাঁজা দিয়ে দাও। সব কুলি-কামিন লাগিয়ে দাও—রাত্রে আগুন দিয়ে দেব, যদি বৃষ্টি নামে সব ইঁট নষ্ট হ'য়ে যাবে—

—আজ্ঞে তা হ'লে এক্ষুনি আরম্ভ করে দি'—

—হ্যাঁ, এক্ষুনি—

সমস্ত কুলি-কামিন এসে ঘিরে দাঁড়ালো মণ্টুবাবুকে। তিনি চোখ দিয়ে একবার সকলকে দেখে নিয়ে বললেন,—কত আছিস্ তোরা?

জয়দেব বললে,—আজ্ঞে ওরা চৌষট্টি জন আছে—

—বেশ, তোরা ইঁট-তৈরী ছেড়ে দে, আজ পাঁজা সাজিয়ে ফেল, যতক্ষণ না আগুন দেওয়া হয়। দিনে রাতে হয়ে যাবে,—তোদের খাওয়ার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি এখানেই। দেড়া রোজ পাবি—মনিষ আঠারো আনা, কামিন একটাকা রোজ হিসাবে পাবি।

সকলে একসঙ্গেই রাজী হল—বাবু যখন খাবার ব্যবস্থা করবে তখন ভালই হবে। মনে মনে তারা খুশীই হল। লখিমপুরের বলরাম বাউরী হাতজোড় করে বললে,—বাবু, একটা নিবেদন আছে—পাঁজায় আগুন দিলে আমরা ত পেয়ে থাকি—

—হ্যাঁ, পাবি বইকি। পাঁজায় আগুন দিয়ে মদ পাবি, মাংসও যদি মেলে পাবি,—কোন অভাব হবে না। কিন্তু রাত-দুপুরের মধ্যে পাঁজায় আগুন দেওয়া চাই—

কুলি-কামিনদের মধ্যে একটা উল্লাসের কলরোল উঠল—বদান্য মণ্টুবাবুর এই অকৃত্রিম দয়ায় সকলেই খুশী। তারা মহোৎসাহে কাজে নেমে গেল।

বলরামের কর্ত্তৃত্বাধীনে সকলে পাঁজা সাজাতে লেগে গেল—কামিনরা ইঁট ও কয়লা বইতে লাগলো, মনিষরা সাজাতে সুরু করলে—

মণ্টুবাবু বললেন,—হ্যাঁ, চালাও খুব জোর। আমি সব পাঠাচ্ছি বাড়ী থেকে।

গরুর গাড়ীতে উঠে তিনি চলে গেলেন। এরা কাজ করলে, মুড়ি খেয়ে বিশ্রাম করে আবার কাজ সুরু করলে। বেলা দু'টায় গরুর গাড়ী এল,—বড় বড় কড়াই, চাল ডাল মসলা বোঝাই ক'রে। মাছও আসছে জানা গেল। খিচুড়ী, বেগুনী আর মাছের টক হবে এবেলা—

দু'জন লোক এসেই রান্নার তদ্বিরে লেগে গেল। কামিনদের কয়েকজনও সহায়তা করলে তাদের। রান্না চললো—

বেলা চারটায় ইঁটের পাঁজার প্রায় বার আনা সাজানো হ'য়ে গেল। আকাশে তখন মেঘ জমেছে—সমস্ত আকাশ পাংশু কালো, থমথম করছে—মনে হয় শিগ্‌গিরই ভেঙে পড়বে। জয়দেব ব্যস্ত হয়ে হাঁক-ডাক আরম্ভ করেছে—রতন দুই-একজন মনিষ নিয়ে তালপাতা দিয়ে কাঁচা ও আধ-শুকনো ইঁট ঢাকতে লেগে গেছে—মণ্টুবাবু আজ আসছেন, কাজেই আজকার তৎপরতা অন্যরূপ—

বৈকালে মণ্টুবাবু এলেন—দু'টো বড় বড় ডে-লাইট এসেছে তাঁর সঙ্গে, শালপাতা শ'কয়েক। আরও দু'চারজন সাঙ্গপাঙ্গ। একটা তেরপল এসেছে।

মণ্টুবাবু গাড়ী থেকে নেমেই বললেন,—রান্না হয়েছে? রতন?

—আজ্ঞে, হয়েছে—

—সব খাইয়ে দে। জয়দেব আলো দু'টো জ্বালবার ব্যবস্থা করো, আর টাঙানোর জন্যে রলা পুঁতে ঠিক করো—

জয়দেব বললে,—আজ্ঞে, এই যে করি—

মণ্টুবাবু দাঁড়িয়ে থেকে সকলকে খাওয়ালেন,—বড় মাছের টক, প্রচুর বেগুনী আর কাঁচা পেঁয়াজ—এর বেশী আর কাই-বা চাই।

ওরা জিরিয়ে নিতে-না-নিতেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল,—বেলা না ছিল এমন নয়, কিন্তু মেঘের কালিমা ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীর বুকে—তাই অন্ধকার দ্রুত নেমে এসেছে আজ। সন্ধ্যার মুখেই একটা গুরুগুরু শব্দ আকাশের কোণে বহুদূরে ধ্বনিত হল,—পশ্চিম আকাশের কোণে হঠাৎ মেঘটা চিড়িক করে উঠলো, তার বুক থেকে ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে এল বিদ্যুৎ। মণ্টুবাবু হাঁকলেন,—দেখছিস কি জয়দেব,—এই দু-তিনহাজার টাকার মাল যে ভেসে যাবে এক্ষুনি—জোয়ান কামিন ডাক ক'জন—

জয়দেব সাবি-তরী এমনি জোয়ান ক'জনকে নিয়ে এল। মণ্টুবাবু বললেন,—শিগ্‌গির কাদা করে ফেল, যা হয়েছে এতেই আগুন দিতে হবে। কাদা লেপে ফেলতে হবে—

পাঁজা লেপে দেওয়ার জন্যে কাদা তৈরী হতে হতে সন্ধ্যা হল—ডে-লাইট জ্বলে উঠল জগৎপুরের নির্জ্জন ডাঙায়। তার আলো গিয়ে পড়ল তেঁতুল-পাতায়, বটের পাতায়, বাঁধের পাথরের গায়। পুরাতন নির্জ্জন ডাঙাটা হঠাৎ যেন চম্‌কে উঠেছে—

ডে-লাইটের আলোয় ওরা কাজ করছে অবিরাম। মণ্টুবাবু বললেন,—একবার আগুন লেগে গেলে ভয় নেই, খুব বেশী বৃষ্টি না হলে নিভবে না।

হঠাৎ একঝলক হাওয়া এল পশ্চিম থেকে,—কালো মেঘগুলো হালকা হয়ে উড়ে চললো দূরের দিকে। মনে হল ঝড় আসছে—বৃষ্টিও আসবে—

মণ্টুবাবু ব্যাকুলভাবে বললেন,—তবে আর হল না!

*

হাওয়া বেড়ে উঠলো—ঝড় সুরু হল। রাস্তার বালি উড়িয়ে নিয়ে চলল হাওয়ায়—ডে-লাইটের আলোয় ঘূর্ণির মধ্যে ঘূর্ণায়মান বালি পাতা খড় দেখা যাচ্ছে সুস্পষ্ট,—মণ্টুবাবু ব্যাকুলভাবে তাকাচ্ছেন আকাশের দিকে—

জয়দেব হাঁকছে,—মাথা মেরে ফেল, বলরাম, মাথা মেরে ফেল। নোটন, মই দিয়ে উপরে যা—সাবি, তরী—যা, উপরে গিয়ে লেপতে আরম্ভ কর—

পাঁজার চারিপাশে তখন লেপা হয়ে গেছে,—মাথাটা সামলাতে পারলেই হয়। ওদিকে বড় একটা কাঁচা কয়লার গাদায় আগুন দিয়ে দেওয়া হয়েছে—সেটা ঝড়ের হাওয়ায় দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে,—তার কালো ধোঁয়া ডে-লাইটের আলোকে ম্লান করে তুলেছে।

আশি হাজার ইঁটই উঠে গেছে পাঁজায়।

হাওয়ার বেগ কমে এসেছে—মেঘের রং ফিকে হয়ে গেছে। মণ্টুবাবু বললেন,—তবে বুঝি রক্ষা হল—

বলরাম বললে,—না বাবু, পশ্চিমের মেঘ বটে, কিছু-না-কিছু হবেকই—উরা মাথাটা মেরে লামুক কেনে মোরা আগুন নীচেকে দিয়ে দি-··

মণ্টুবাবু বললেন,—তা দিয়ে দে,—ওরা মই দিয়ে নেমে আসবে—

এক জালা মদ এসেছে,—সকলকে একপাত্র মদ দিয়ে পাঁজায় আগুন দেওয়া হল। হাওয়া তখনও বইছে, তবে বেগ নেই। পশ্চিম থেকে আগুন দিতে সেটা হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল ভিতরে। দেখতে দেখতে পাঁজার পূবদিকের ছিদ্রপথে আগুন দেখা যেতে লাগল।

মণ্টুবাবু বললেন,—বলরাম, হাওয়ায় আগুন কেটে যাবে, পশ্চিমের দিকটা বন্ধ করে দে—

কাঁচা ইঁট দিয়ে পশ্চিমের রন্ধ্রগুলি বন্ধ করে দিলে ভিতরের আগুন সোজা ধিকিধিকি উপরের দিকে উঠতে সুরু করল।

আকাশে তখনও মেঘের ঘটা—পশ্চিমের দমকা হাওয়ায় মাঝে মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে,—আবার তারা এসে ঘনীভূত হচ্ছে মাঝ আকাশে। একবার দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল,—ঝড়ের বেগে মেঘখানা উড়ে গেল, তাই জলটাও সরে গেল।

রাত্রি দশটায় কুলি-কামিনরা মদের পাত্র নিয়ে ঘিরে বসল। তার সঙ্গে মণ্টুবাবুর বাড়ী থেকে এসেছে মুড়ি লঙ্কা পেঁয়াজ পেঁয়াজী এবং কিছু মাংস। সকলে মণ্টুবাবুর গুণগান করতে করতে খাচ্ছে।

মেঘ ডাকলো দূরের আকাশে গুরুগুরু,—ফিন্‌কি দিয়ে বিদ্যুৎ বেরিয়ে এল একঝলক। তরী বললে,—জল নামলে মোরা রইব কোথাকে এ ডাঙ্গায়—

সাবি বললে,—উ ঘরকে যাবো—

—ঘরকে কেতে লোক ধরবেক?

আবার মেঘ ডাকলো,—দমকা একটা হাওয়ায় বটের পাতা ঝটপট করে উঠলো। রাত্রি তখন বারটা,—তৈলহীন হ'য়ে একটা ডে-লাইট নিভে গেল।

*

মণ্টুবাবু তেরপল দিয়ে একটা অস্থায়ী তাঁবু তৈরী করে রাতের মত আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে পচুই নয়, তবে মূল্যবান মদ্য না চলছিল এমন নয়। জয়দেব আজ মাত্রা ছাড়ায়নি। রতন মণ্টুবাবুর তদ্বির করছিল—

ঘোড়ামারার দল তেঁতুলগাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছিল—উন্মুক্ত প্রান্তরে পাথরের বিছানায় তারা শুয়ে ছিল সারাদিনের ক্লান্তির পর। এদিকে ছিল নেশার ঘোর, তারপরে ক্লান্তি আসতেই ঘুমোতে চেষ্টা করছিল,—

ডে-লাইটের আলোর কিছুটা এসে পড়েছে সেখানে,—লগেন বললে,—হ, কঁ্যাকড়া রইছে হেথা—উঠ্, সব উঠ্—

তরী বললে,—কামড়াবেক—

—না—উ দ্যাখ কেনে ল্যাজটো খাড়া করে যাচ্ছে বটে!

সকলেই উঠে পড়ল,—আশেপাশের পাথর উল্টিয়ে দেখলে আরো কঁ্যাকড়া বিছে আছে কিনা; তার পর আবার সকলে শুয়েছে—

হঠাৎ গুড়গুড় করে আকাশ ভেঙে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া, পশ্চিমের কালো মেঘ উঠে এসেছে শনশন করে—প্রবল হাওয়া দিচ্ছে। ডাঙার বালি চিটুপিটু করে পাথরে এসে পড়ছে, তার শব্দ পাওয়া যায়। হাওয়ার সঙ্গে

বালি এসে তীরের মত গায়ে বিঁধছে। ওরা সকলে বাঁধের নীচে আশ্রয় নিয়েছে,—ডে-লাইটটা নিবুনিবু হ'য়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে—

জয়দেব হঠাৎ এসে বললে,—সাবি? সাবি কোথা রে?

সাবি বললে,—কেনে?

—বাবু ডাকছে তুকে।

—কেনে? বাবু ডাকছে কেনে?

—হ, তোকে বকশিস করবে, চল্—

সাধু বললে,—উ যাবেক কেনে? কোন কাম লাগছে?

জয়দেব বললে,—তা আমি জানি না, বাবু ডাকছে যাবি কিনা বল?

সাবি একটু চিন্তা করে বললে,—সাধু, বাবু ডাকছে—যাবেক নাই—?

সাধু বললে,—যা, আমি হেথা এই তেঁতুলতলাকে রইব—বাবু যেখন ডাকছে—

জয়দেবের সঙ্গে সঙ্গে সাবি এল। পথে জয়দেব বললে,—দাঁড়া সাবি—আলোটা ঠিক করে দি—

জয়দেব আলোটা ঠিক করতে আলোটাই দপদপ করে নিভে গেল। সমস্ত ডাঙায় নীরন্ধ্র অন্ধকার, আকাশে ঘন মেঘ। প্রবল হাওয়ায় ডাঙার গাছগুলো ঝটপট করছে। জয়দেব সাবির হাত ধরে বললে,—আয়, চল্ আমার সাথে—

মণ্টুবাবুর তাঁবুতে মাঝে মাঝে টর্চের আলো জ্বলছে,—লণ্ঠন ছিল তা নিভে গেছে। জয়দেব সাবির হাত ধরে নিয়ে বটগাছের আড়ালে যেখানে হাওয়াটা কম সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো; জয়দেব বললে,—তোকে দু'টো টাকা দেব, মদ খাওয়াবো, চল এদিকে ওই বাঁধকে যাই—

সাবি বললে,—বাবু ডাকছে বললি তু—

—আমি বাবু নয় বুঝি,—দু'টাকা দেব—

সাবি অন্ধকারে হাসলে। সে জানে জয়দেব দুর্ব্বল, অত্যন্ত ভীতু, সে পরিহাস করলো,—তুর ত লোটন রইছে—

—নোটন রইছে বলে সাবি থাকবে না?

—হ, সাবি তুর লোটন লয় রে বাবু, দু' টাকার লোভ দেখালি মোরে,—হ!

—পাঁচ টাকা দেব,—চোলাই মদ দেব, চল্—

—কোথাকে যাবো? কেনে বল না?

জয়দেব বললে,—কেনে তা জানিস্ না? ডপ্‌কা কামিন তুই জানিস্ না—

জয়দেব হাত ধরে টান দিতে সাবি হাতটা এমন হ্যাঁচ্‌কা টান দিলে যে, জয়দেব পড়ে যাচ্ছিল। সাবি বললে,—এই ত তুর দেহটা, বাবু—তু কামিন কামিন করিস কেনে ?

আকাশের বুক চিরে এক ঝলক আলো বেরিয়ে এল,—কে যেন আসছে এদিকে মনে হয়। জয়দেব সাবির হাত ধরে অনুনয় করলে,—চল্ চল্,—বাঁধে যাই,—জল এসে পড়বে —

সাবি বললে,—তু যা কেনে বাবু, তুর লোটনকে লিয়ে, আমি যাবেক নাই, সাবি তেমনটি নয়—

—অন্ধকারে কে যেন এসে খপ করে জয়দেবকে ধরে ফেললো। জয়দেব বললে,—কে ? কে রে ?

—আমি লোটন বটি। সাবিকে লিয়ে কোথাকে যাবি ? বল কেনে, বাবু ?

—যেখানে খুশী যাবো, তোর কি ?

—লোটন কোথাকে থাকবে—তাকে ঘরে লিলি কেনে বল না ?

—যা তোর যেখানে খুশী, ঘরের বৌ আর কি ?

—লোটন যেথা যাবে তু বাবুও সেথা যাবি— লোটন দৃঢ় মুষ্টিতে জয়দেবের হাতটা ধরে টানতে সুরু করলো। জয়দেব বললে,—ছাড়্ ছাড়্,—লাথি দিয়ে ঠিক করে দেব—

জয়দেব পা দিয়ে নোটনের গায়ে একটা লাথি দিয়ে হাত ছাড়াতে চেষ্টা করলো। নোটন বললে,—বটে—মোকে লাথি মারবেক—হ বটে !

নোটন দুইখানি বলিষ্ঠ বাহুর মাঝে জয়দেবের ক্ষীণ শরীরটা তুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেল দিল—একটা নুড়ির মত—

চট্-পট্ করে বৃষ্টি পড়ল বটের পাতায়। সাবি ছুটে এল তেঁতুলগাছের গোড়ায় ; ডাকলে,—সাধু সাধু, তু কোথা ?

—এই হেথা রে সাবি--

—জল এল সাধু, কোথাকে যাবি—ঝড় রইচেন বটে—

তরী বললে,—জল ভিজে গাঁকে যাই, হেথা কোথা রইবেক—

ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে। চট্‌পট্ করে বৃষ্টি পড়তে সুরু করেছে। সাধু বললে,—হ, চল্ সাবি—চল্, গাঁকে যাই। হোথা গেলে ঘর মিলবেক, কাপড় ছাড়বেক—চল্—

ঘোড়ামারার দল বিপুল অন্ধকার সমুদ্রের তলদেশে উদ্ধত হিংস্র নক্র-শিশুর মত ছুটে চলল ঘোড়ামারার উদ্দেশে। পথ তাদের পরিচিত—

সামনে ভালকুড়ির মাথায় বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে,—বনশ্রেণী ভেসে উঠে আবার ঘনতর অন্ধকারে বিলীন হ'য়ে যাচ্ছে। ওরা ছুটেছে গৃহের পানে—

*

ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে জল নেমে এল—বেগে—

সাধু আর সাবি ভিজে গেছে, ঠাণ্ডা বরফের মত জল,—হাওয়ায় শীত করছে। লগেন হেঁকে উঠল,—পাথর পড়বেক, পাথর পড়বেক—হোথা বনকে সেঁধিয়ে যা সব—

হিমশীতল বৃষ্টি শিলাবৃষ্টির অগ্রদূত। শিলাবৃষ্টি হ'লে এই উন্মুক্ত প্রান্তরে আশ্রয় নেই। ওরা প্রাণপণে ছুটলো ভালকুড়ির পাদদেশে ঘন জঙ্গলের উদ্দেশে। জঙ্গলে আশ্রয় পেলে শিলাবৃষ্টি থেকে হয়ত বা আত্মরক্ষা করা যাবে—

জীবন-সংগ্রামের এই অত্যন্ত বিপন্ন সময়ে ঘোড়ামারার দল ছিট্‌কে পড়ল। টুপটাপ করে শিল পড়ছে,—কার গায়ে যেন একটা পড়ল,—সে 'উঃ' বলে আবার চলল।

সাবি আর সাধু দৌড়ে এসে পৌঁছল এক বড় পলাশগাছের ছায়ায়। গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সাধু বললে,—সাবি, তু এলি ?

—হ, এলাম বটি,—

সাবি কথা বলতে পারছে না, ছুটতে ছুটতে তার দমবন্ধ হয়ে এসেছে।

সাধু তাড়াতাড়ি তাকে টেনে বুকের মাঝে নিয়ে গাছের শিকড়ের উপর বসে বললে,—থাক্‌ হেথা, সাবি। তুর দেহকে পাথর পড়তে দিবেক নাই—

সাবি নির্ভয়ে সাধুর বুকের মাঝে আশ্রয় নিয়ে হাঁপাতে লাগল—

দুপ্‌দাপ্‌ করে শিল পড়ছে,—সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি। বিদ্যুতের আলোয় দেখা যায়, গাছের মাথাগুলো ঝটপট করছে আকাশের গায়।

ঝড় হচ্ছে,—প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হচ্ছে চারিদিকে—

ওরা ভাল আশ্রয়েই আছে। মোটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে বৃষ্টি দু'চার ফোঁটা পড়লেও, শিল পড়ছেনা; হাওয়াও খুব লাগছে না। সাধু সাবিকে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে দেখলে, সাবির শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হ'য়েছে। সাধু বললে,—তুর শীত করছে বটে ?

—হ, জায়গাটা ত হিম বটে—

সাধু তাকে আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে বললে,—হ, থাক্‌ কেনে হেথা,—সাবি,—সাবি…

সাবি বলল,—কি বল কেনে ?

—তু সাঙ্গা করবেক নাই,—চিরটা দিন এমনি ঘুরাবেক তু ? তু ত পাথর বটি—

আজ সাবি সাধুকে আপনার বাহুর আলিঙ্গনে বেঁধে বললে,—তু সাঙ্গা করবি ?

—কেনে করবেক নাই—

—মু ত ঝুমুরী-দলে গেলেক,—মদ খেলেক—

—তু কর কেনে, তু ত মোর সাবি বটে ! সাঙ্গা করবি—

সাবি সম্মতি দিল,—হ, করবেক নাই কেনে ? মহিম খুড়োকে বল কেনে, মোর মনিষটা কি হলেক—

চারিদিকে দুরন্ত ঝড় তখন নীরন্ধ্র অন্ধকারে এই পাহাড়-জঙ্গলে ময়াল সাপের মত ফুসিয়ে বেড়াচ্ছে। সাধুর বুকের মাঝে আজ ঝড় উঠেছে—সে সাবিকে টেনে নিয়ে বললো,—সাবি-সাবি, তুর জন্যে মু সব করবেক,—কত ভালবাসছি তু জানিছিস্ না—

সাবি বললে,—জানছি ত সাধু, কিন্তু মোর যে মনিষ রইছে—

*

ধীরে ধীরে ঝড় থামলো.—আকাশে তারার মালা জ্বলে উঠলো—

সাধুর মনের ঝড় আজ থেমে গেছে,—সেখানে উঠেছে চাঁদের আলো। সাবি সাধুর কোলে মাথা রেখে ভিজা কাপড়ে শুয়ে ছিল। সে বললে,—সাধু, ঘরকে যাবি না—

—না, আর ঘরকে যাবেক নাই। তু কে নিয়ে হেথা বনকে ঘর বাঁধবেক—

সাবি হি-হি করে হেসে বললে,—হ, চল্ ঘরকে যাই, জাড় লাগলেক বটে—

ওরা উঠে চললো ঘোড়ামারার দিকে—কাছেই তাদের গাঁ—

ঝড় তখন থেমেছে,—তারার আলোয় পথ দেখা যায়। অস্তায়মান চাঁদ ভালকুড়ির মাথায় যেন ডুবতে ডুবতে বেধে রয়েছে—মেঘের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ আলো এসে পড়েছে ভিজা রাস্তার উপর—

ওরা চললো—সাধু আর সাবি। ঘরে ফিরে যখন ওরা এল তখন প্রায় ফরসা হয়ে এসেছে। সাবির মা উঠে দাওয়ায় বসে চুটি খাচ্ছে—

পৃথিবী তখন শান্ত হয়েছে—শীঘ্রই নবারুণের আলোকে ভিজা পৃথিবী চিকচিক করে উঠবে।

পরদিন ঘোড়ামারার কেউ কাজে যায়নি—নোটন ডাঙায়ই আছে।

ওরা সেইদিন সংসারের কাজকর্ম কিছু গুছিয়ে নিল। সাধু দেখলে, যা জল হ'য়েছে তাতে বীজ-তলাটায় চাষ দেওয়া যায়। সে ভোরেই বীজতলায় ছু'চাষ দিয়ে এল। লগেন প্রভৃতি আর-সকলেও এ সুযোগ ত্যাগ করলে না। সাবি বুড়ো মায়ের সংসারটায় কিছু এগিয়ে দিল—তার বীজতলা নেই। ছু'বিঘা জমি যা আছে তার 'আফর' অর্থাৎ ধানের চারা সে চেয়ে-চিন্তেই জোগাড় করে নেয়।

ছুপুরবেলা একটা ঘুম দিয়ে সাধু বিকেলে মহিম খুড়োর কাছে সাঙ্গার কথাটা প্রস্তাব করলে,—সাবি ত রাজী বটে, উকে মু সাঙ্গা করবেক। তা, খুড়ো তু ত মোড়ল বটি, তুর কাছে নালিশ করছি, তু একটা রায় দে কেনে।

মহিম একটু ভেবে বললে,—হ, সাঙ্গা ত করবি। উর মনিষ রইছে।

—কোথা মুনিষ—খাদকে গেলেক, আর ত ফিরলেক নাই।

—ছ'সাত বছরকে ঘরকে এলেক নাই বটে— মহিম খুড়ো ভেবেচিন্তে বললে,—

—হ, ঘরকে ত লেই বটে, উর ত খোঁজটো লিতে হবে,—রইছে, না মরলেক খাদকে—

—হ, খোঁজটো কে লিবে বটে?

মহিম বললে,—আমি লিব বটে. উ ত মোড়লের কাজই বটে। হ, তুরা কাজ কর কেনে, মু দেখছি—খোঁজটো লিয়ে লি—সাবিকে পুছি—

সন্ধ্যার প্রারম্ভে মহিম নিজেই সাবির বাড়ীতে এসে ডাকলে,—সাবি, সাবি?

—কে বটে? মহিম খুড়ো? বস কেনে?

সে একটা ভাঙা মোড়া এনে দাওয়ায় পেতে দিল। সাবির মা বারান্দায় ভাত রাধছিল—

মহিম বললে,—সাবি, তু সাধুকে সাঙ্গা করবি? সাধু ত মোর কাছে আরজি করলেক—

সাবি নিরুত্তর।

—বল কেনে, লজ্জা কি? সাঙ্গার কথা ত বলতেই হবেক তুকে! এত বিয়ে লয়?

সাবির মা বললে,—হ, মু ত বলছি—নকুড় আসবেক নাই, সাঙ্গা কর কেনে। সাধু ত ভাল জোয়ান বটি। উঁদের ত মিলও হইছে বটে—

মহিম সস্নেহে বললে,—সাবি, তু বল কেনে—তু সাঙ্গা করবি সাধুকে ?

সাবি বললে,—কি করবেক—তু খুড়ো বল কেনে ? মোর কি হবেক ?

মহিম বললে.—হ, নকুড়ের খোঁজটো লিয়ে লি, তবে আরজি বার করবেক। তু সাঙ্গা করবি সাধুকে ?

সাবি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে,—উ ত বলছে,—মু আর কি বলবেক ! উ ত বিয়া করলেক নাই মোর তরে,—মু আর সাঙ্গা করবেক নাই কেনে ?

মহিম একটু হাসলে। হয়ত অতীত যৌবনের কোন অধ্যায় তার জীর্ণ মনের কোণে উঁকি দিয়েছিল। সে একটু হেসে বললে,—হ, অমনটি হয় বটে। সাধু ত তুর সঙ্গে কাজ করছে,—উর জমি রইছে, গরু রইছে— মহিম উঠতে উঠতে বলল,—হ, মু খোঁজটো লিয়ে জবাব দিবেক বটে—তুরা কাজ কর কেনে--

মহিম চলে গেল। সাবির মা বললে,—সাবি, মোর আর দিন লাই রে, সাবি, মু আর বাঁচবেক লাই। দেহে ত বল নাই, দাঁত নাই—চোখ নাই,— তু একটা মনিষ ধর। সুখে মরবেক—

সাবি ঝাঁঝের সঙ্গে বললে,—মরবেক-মরবেক বলছিস্ কেনে ? তুর কি হইছে ! উ তুর বড় সব কামিন্ বেঁচে লাই ? উ মহিম খুড়োর খুড়ি, কালীর মা,—উরা ত—

—হ, বাঁচবেক নাই কেনে ? মোর যে বল নাই—

সাবি কৃত্রিম রাগেব সঙ্গে বললে,—হ, উ সব বলবি না !

*

পরদিন ভোরে রতন ঘোড়ামারার দলকে ডাকতে এল—ওরা কাজে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল, রতন আসতেই রওনা হল। রতন ঝড়ের খবর বললে,—কোন্ গ্রামে কি ক্ষতি হ'য়েছে তার একটা ফর্দ্দ দিয়ে বললে,— পাঁজাটো ঠিক পুড়ছে, কিছু হয়নি—এবার বাবু এক লাখের আর-একটা দিবে বটে—

ওরা যেয়ে কাজ করতে লাগবার পূর্ব্বেই দেখে, কিছু ইঁটের ক্ষতি হ'য়েছে। কিছু ইঁট পাঁজায় চলবে। নষ্ট ইঁটগুলিকে পুনরায় গড়তে হবে যাতে তাড়াতাড়ি আর একটা পাঁজা দেওয়া যায়। কালবৈশাখী যখন সুরু হ'য়েছে

তখন শিগগিরই আবার হবে,—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইঁটের পাঁজায় আগুন দেওয়াই লাভের।

জয়দেবের মাথায় পটি-বাঁধা। মাথা ফেটে গেছে, ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ করা হয়েছে। নোটন জয়দেবের চা নিয়ে এল। জয়দেব বললে,—তোরা ভাঙা আর গলে-যাওয়া ইঁটগুলো ভাল করে গড়ে দে। বাবু বলেছে, এর হাজার পাঁচটাকা পাবি। দু'দিনে আর একলাখের পাঁজা দিতে হবে,—আবার সব ভোজ পাবি—

গরুর গাড়ী থেকে মণ্টুবাবু নামলেন,—জয়দেব গিয়ে ধরে তাকে নামালো। রতন জুতো এগিয়ে দিল। মণ্টুবাবু বটতলায় এসে একটা মোড়ায় বসে বললেন,—রতন, সাবি বাউরীকে ডাক—

কথাটা সাবির কাণে গিয়েছিল। সে সভয়ে বললে,—সাধু, মোকে বাবু ডাকছে কেনে?

সাধুও অবাক হ'য়েছিল, এত কুলি-কামিন থাকতে সাবিকেই ডাকছেন কেন বাবু! সাধুও একটু ব্যাকুলভাবে বললে,—তুকে ডাকছে?

—হ বটে।

—কি একটা গোল হইছে,—উ জয়দেব হারামজাদা ডাকলেক তুকে?

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই রতন এসে সাবিকে ডাকলে, সাবির সঙ্গে সঙ্গে সাধুও এসে বটতলায় মণ্টুবাবুর সামনে দাঁড়ালো।

মণ্টুবাবু বললেন,—সাবি, আমার কর্ম্মচারীকে অপমান করলে, আমাকে অপমান করা হয় তা জানিস্?

সাবি সভয়ে বললে,—হ বাবু, উ জানছি—

—জয়দেবকে তুই ঝড়ের রাতে ফেলে দিয়েছিলি কেন? ওর মাথাটা ফেটে গেছে, খুন হ'য়ে যেত—

—মু ত কিছু করি লাই বাবু, আমি করবেক কেনে?

—কে করেছে তবে? কে ওকে ফেলে দিলে—

সাবি বললে,—লোটন উকে পাঁজাকোলা করে ফেলে দিলেক, ঝড়ের মাঝে,—পুঁছা কেনে লোটনকে?

—নোটন কে?

নোটনকে ডেকে আনা হ'ল।

নোটন আসতেই মণ্টবাবু বললেন,—নোটন সত্যি কথা বলবি—মিথ্যা বললে মরবি—

নোটন বললে,—মিথ্যা বলবেক কেনে ?

—জয়দেবকে কে ফেলে দিয়েছিল ঝড়ের রাতে ?

—উ বাবুটো খচ্চোর বটে,—আমি উকে ধরে ফেলে দিলেক বটে।

—কেন ?

—উঃ সাবির হাত ধরে টানতে লেগেছে আঁধারকে কেনে? সাবি উর কি ?

—তা, তোর তাতে কি ?

—হ, মোর কি ? আমি ত ডাঙ্গাকেই রইছি, দিনকে—রাতকে। বাবুকে খাওয়াচ্ছি, উর কাজ করছি—তা আরেক কামিনকে ডাকবে কেনে ? উর হাত ধরে টানবে কেনে ?

সাবিকে জিজ্ঞাসা করতে সাবি আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনাই বললে। মণ্টুবাবু তখন হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন,—জয়দেব, তুই আমার নাম করে কামিন ডেকে এনেছিস্, এত বড় তোর স্পর্দ্ধা ?

তিনি হাতের ছড়ি নিয়ে উঠে জয়দেবের পানে যেতেই, জয়দেব তাঁর পায়ের তলায় পড়ে বললে,—মারুন হুজুর,—অপরাধ হয়েছে—মারুন বাবু, তবে ডাঙার মাঝে ঝড়ে বৃষ্টিতে রোদে পড়ে আছি আপনারই জন্যে। মারুন, অন্যায় যখন করেছি তখন মার খাবো,—মেরে হাড় ভেঙে দিন—

মণ্টুবাবুর উদ্যত ছড়ি নেমে এল। তিনি বললেন,—যা সব, কাজ কর গিয়ে—

কুলি-কামিনরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ফিরে এল কাজের জায়গায়। মণ্টুবাবু জয়দেবের হাত ধরে তুলে সান্ত্বনা দিলেন, উপদেশ দিলেন। জয়দেব নিজেই কাণমলা খেয়ে বললে,—এই কাণ মলছি হুজুর, আর এমন কাজ করবো না—করবো না,—করবো না—

মণ্টুবাবু কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আবার গরুর গাড়ীতে উঠলেন। জয়দেব এসে কুলি-কামিনদের উদ্দেশে রাজোচিত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে হুকুম দিল,—ভাঙাচোরা ইঁট সব গুন্‌তিতে বাদ যাবে, ভাল করে তৈরী কর। বাঁকাচোরা হ'লে খারিজ করে দেব,—

ওরা মুখ টিপে হাসলো,—ওরা কান মলতে দেখেছে জয়দেবকে।

*

চৈত্রের শেষে তিনলাখ ইটের পাঁজায় আগুন দেওয়া হয়ে গেল—

ওরা নিয়মিত কাজ করেছে। খরচ বাদে সাবি প্রায় আড়াই কুড়ি টাকা রোজগার করেছে এরই মধ্যে। সেদিন সন্ধ্যায় সাবি কাঁদোড় থেকে স্নান করে

এসে উঠানে দাঁড়িয়ে ডাকলে,—মা !— মা আকস্মিকভাবে কেঁদে উঠল—সাবি তাকিয়ে দেখে বারান্দায় একটি অপরিচিত লোক বসে আছে। সাবির মায়ের কান্নার মাঝে যে কথা কয়েকটা সে বুঝতে পারলো তার অর্থ অতি সরল—নকুড় এতদিন পরে ফিরে এসেছে—

সাবির বুকের মাঝে হঠাৎ ছ্যাঁক করে উঠলো,—দুলে উঠলো সমস্ত দেহটা। সে ভাল করে চেয়ে দেখলে,—কৃশ, বিগতযৌবন নকুড় তার জীর্ণ দেহ নিয়ে বসে আছে দাওয়ায়, সাবির দিকে চেয়ে আছে পরম বিস্ময়ে—

সাবির মা বললেন কেঁদে কেঁদে,—সাবি ডাগর হল, কামিন খেটে খেটে দিন কাটালো—তু কোথা এতেদিন ছিলি রে নকুড় ? কোথা ছিলি ? তুর পথ চেয়ে মু ত মরতে লারলেক।

সাবি ভিজা কাপড় নিয়ে উঠানে দাড়িয়ে রইল পাথরের মত—এই তার স্বামী! কোলিয়ারীর শত কলঙ্কে কালো হয়ে, জীর্ণ দেহের শেষ সম্বল নিয়ে এসেছে তার কাছে। সাবি হঠাৎ তীক্ষ্ণস্বরে বললে,— উঃ কে ? মা রে—উ কে ?

—ও ত জামাই বটে, তুর মনিষ, সোয়ামী বটে সাবি—

—হ, মোর মুনিষ ত লেই, সে ত খাদ্‌কে মরেছে বটে—

সাবি নকুড়ের কাছ দিয়ে এসে ঘরে ঢুকলো,—অত্যন্ত উদ্ধত পদক্ষেপে। তার পর ঘরের ভিতর থেকে সজলকণ্ঠে তারস্বরে বলে উঠলো,—মু ত বিধবে বটি, মোর কেউ লেই এ-জগতে—মু ত বিধবে বটে—খাদ্‌কে ছিলেক খাদ্‌কে যাক্ কেনে ? হেথা উর কি আছে—

জীর্ণদেহ নকুড় পাথরের মত বারান্দায় বসে রইল, কোন জবাব দিল না। সে জানতো সে প্রথম অপরাধী—এই ভাবাবেগের মাথায় তাই সে কিছুই বললে না।

সাবি ঘর থেকে বললে,—উর কামিন যে খাদ্‌কে রইছে, তাকে ছেড়ে আসলেক কেনে ? ছাড় করতে এলেক, তা হেথা কেনে ? মহিম জেঠা হোথা যাক্ কেনে—

সাবি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। বহুদিন পরে অজ্ঞাত অপরিচিত স্বামীর আগমনে—ক্রোধ, অভিমান ও হতাশায় সাবি উত্তেজনায় অধীর হ'য়ে উঠেছিল। সাধুর কথা তার মনে পড়েনি। তাদের ভালবাসা যখন মিলনের জন্যে উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে তখনই নকুড় বৃহৎ এক পাথরের প্রাচীরের মত নেমে আসবে আকাশ থেকে, এ কথা তারা কখনও ভাবেনি। তথাপি অজ্ঞান মনে হয়ত

একটা ভয় ও শঙ্কার ঝড় উঠেছিল। সাবি তাই উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করলে,—তুর কামিন কোথাকে রেখে এলি ?

নিশ্চল পাথর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব এল—নকুড় বললে,—মোর কামিন নেই।

—মরেছে, না ছাড় করে হেথাকে এলি ?

সাবির মার ক্রন্দন প্রশমিত হ'য়েছিল ; সে প্রশ্ন করল,—এতদিন কোথা ছিলি রে নকুড়—সাবি মোর ডাগরটি হল, উর ঘর লেই, ঘর বাঁধলেক লাই। মু ত মরতে লারছি—

নকুড় আবার নির্ব্বাক। সাবি গর্জ্জন করে উঠছিল—তার মা বললে,—উ সব বলবি না, সাবি, সোয়ামী ঘরকে এলেক, উর জল-তামুক দে কেনে—সোয়ামীকে উ সব বলতে লাইরে—

নকুড় বললে,—উ কি জানছে। উ ত ছোটটি ছিল তখুন—বিয়ার সময়—

কথাটি সাবির প্রাণে হঠাৎ যেন ঠাণ্ডা একটা প্রলেপ দিয়ে দিল। সাবি তবুও বললে,—হ, তু ত বড়টি ছিলি,—তু ত সব জানছিলি—তবে কোথাকে ছিলি এতদিন !

নকুড় নীরব হয়ে রইল। সাবির মা বললে,—উ সব থাক্ কেনে এখুন। নকুড়, তু হাত-পা ধুয়ে খেয়ে লে। ভাত খেয়ে লে—

নকুড় কোলিয়ারীতে কাজ করেছে। সে ভীতকণ্ঠে বললে,—চা লাই ঘরকে, একটু চা করলে খাই মা ?

—সাবি—চা মু ত করতে জানছি নাই, সাবি তু আয়, চা করে লে।—সাবির মা সাবিকে ডাকলো। সাবি তার অনাবৃত মাথায় একটু আঁচল তুলে দিয়ে বারান্দায় উনুনের পাড়ে এসে বসলো চা তৈরী করতে। দূরে একটা কেরোসিনের লম্প জ্বলছে। সাবি খানিকটা জল তুলে দিয়ে শুকনো পাতা উনুনে দিতেই তা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। নকুড় বারান্দায় বসে বসে সাবির রক্তরাঙা মুখখানি বার বার দেখলো—উনুনের আগুনের লালিমা তার মুখে এসে পড়েছে। সেই আলোকে সাবিও একবার তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর মুখের পানে চেয়ে দেখলো। নকুড় হতশ্রী হলেও শক্তিশালী,—শীর্ণ হলেও পরিশ্রমী। ঘোড়ামারার প্রকৃতির মাঝে থাকলে হয়ত এমন হত না ; কয়লার কালি মেখে, খাদের অন্ধকারে জীবন কাটিয়ে শ্রীহীন হ'য়েছে হয়ত। প্রশস্ত বলিষ্ঠ বুক তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

উনুনের আগুনের আলোকে ওদের আজ প্রথম শুভদৃষ্টি হল।

সাবি চা তৈরী করে দিলে, নকুড় বসে বসে খেয়ে বিড়ি বের করলো। সাবিকে একটা দিয়ে বললে,—উঃ খেয়ে লে, সাবি—রানীগঞ্জের বিড়ি ভাল বটে।

সাবি চা খেতে খেতে বিড়ি ধরালে। সাবি তাকিয়ে দেখলে তার মা নেই' হঠাৎ যেন কোথায় চলে গেছে।

নকুড় বললে,—হ, অন্যায় টো ত হইছে বটে, খাদ্‌কে ছুটি নাই—তুর খোঁজও লি নাই। নেশার ঘোরে কেটে গেলেক বছরগুলি—

সাবি বললে,—হ, নেশার ঘোরে রইলি না কেনে? এলি কেনে?

নকুড় বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে একটু হাসলো, কোনো জবাব দিল না। নকুড় বিদেশে গেছে, অনেক দেখেছে—তার নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতাও আছে। সে জানতো, বিষম সময়ে হতবাক হওয়াই আত্মরক্ষার উপায়। সে বিড়ি টেনে-টেনে ধোঁয়া ছাড়লো, আর মাঝে মাঝে হাসলো মাত্র।

সাবি অবাক হয়ে গেল, তার এত তিরস্কারেও লোকটা এতটুকু উত্তেজিত হ'ল না।

*

সাবির মা কিছুক্ষণ বাদে মহিম খুড়োকে নিয়ে এলো, সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার আরও অনেকে এসে হাজির হল নকুড় তথা সাবির স্বামীকে দেখতে—

মহিম মোড়ায় বসে হাসলো,—হ, নকুড় কোথা রে?

সন্ধ্যার পরে অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না উঠানে এসে পড়েছিল—জ্যোৎস্নাটা এতক্ষণে স্বচ্ছ হয়ে উঠছে। উঠানে সাবির মা তালাই পেতে দিলে সকলকে বসতে—

মহিম গ্রামের মোড়ল,—তার আদেশ বা সালিশী অকাট্য, তা সকলকে মানতেই হবে। চিরকাল তাই হয়েছে। ন্যায় হোক অন্যায় হোক, তার নির্দ্দেশ ঘোড়ামারায় সকলে পালন করে, তাই তাদের মাঝে বিভেদ নেই। বিভেদ হলেও, তা মহিম খুড়োর মীমাংসায় দূরীভূত হয়। একটা সভ্য-শিক্ষিত সমাজ নয় যে মোড়ল নেই, সকলেই এত বেশী বুদ্ধিমান নয় যে—অন্যকে মানাটা অনাবশ্যক মনে করে। মহিমের চিত্তবৃত্তি ও জ্ঞানকে কেন্দ্র করে চলে ঘোড়ামারার সমাজ-জীবন।

মহিম ডাকলে,—নকুড় কোথা?

নকুড় এসে প্রণাম করে একপাশে বসল। সাবির মা দাওয়া থেকে লম্পটি এনে একটা কাঠের পিলসুজে বসিয়ে দিল। মহিমের পিছনে সাধু একখানা পাকা

বাঁশের লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—অত্যন্ত ব্যথিত ভাবে। সাবি দাওয়ায় বসে একবার সাধুর দিকে তাকালে,—অন্তরটা তার বেদনায় টনটন করে উঠছে। আজ সে বোঝে সাধুকে সে ভালবেসেছে, সে সাধুকে কি বলবে? তাদের সাঙ্গা আর হয়ত হবে না—সে তাকিয়ে তাকিয়ে সাধুর মুখখানি দেখছিল—তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছিল। তরী দাঁড়িয়ে আছে আর-একটু দূরে,—সে ঘন ঘন সাধুর মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হাসছে—পাশে কামিনীর কাণে কাণে কি যেন বলছে—

মহিম বললে,—নকুড়, তু হেথা ঘর করবি সাবিকে লিয়ে, না খাদ্‌কে যাবি?

নকুড় একটু ভেবে বললে,—হেথা কোন্ কাজ রইছে,—রোজগারটা কি করবেক?

—কেনে? মনিষ খাটবি, চাষ করবি। জমি রইছে বাবুদের—ভাগে করবি। সাবিকে লিয়ে খাদ্‌কে যাবি বল কেনে?

নকুড় বললে,—খাদ্‌কে চাকরি রইছে বটে, সাবিকে লিয়ে দু'জন কাম করবেক—

মহিম বললে,—সাবি, তু খাদ্‌কে যাবি?

সাবি বললে,—বুড়া মা-টিকে কোথাকে রেখে যাবেক। উঃ খাদের কালি মু মাখবেক নাই। হোথা কোন্ সুখ রইছে বটে!

মহিম বললে,—নকুড়, তু খাদ্‌কে যাবি ত, ছাড় কর কেনে? তু খাদ্‌কে সাঙ্গা কর—সাবি হেথা সাঙ্গা করবেক—

নকুড় সাবির দেহের পানে চেয়ে চেয়ে এতক্ষণ দেখেছে। কোলিয়ারীর জীবন সে জানে, সাবিকে নিয়ে যেতে পারলে অনেক সুযোগ-সুবিধা ছিল। নকুড় ভেবে ভেবে বললে,—উর জন্মেই ত আসছি বটে। সাবি যাবেক নাই ত, আমিও যাবেক নাই। হেথা মনিষ খাটবেক। ঘরকে রইবেক—আর সাবি খাদ্‌কে যাবেক ত, তাকে লিয়ে যাবেক—

সাবি শানিত কণ্ঠে বললে,—খাদ্‌কে মু যাবেক নাই। হোথা ত জাত ধরম রইবে নাই, ঘোড়ামারাকে ছেড়ে যাবেক নাই—

জন্মভূমি এই ঘোড়ামারা, এই ভালকুড়ির শাল-পলাশ বনের বিশ্বপ্রকৃতি ছেড়ে সাবি কোলিয়ারীর কালো গহ্বরে প্রবেশ করতে চায় না। সে সাধুকে ভালবেসেছে,—ঘোড়ামারাকে ভালবেসেছে।

মহিম তার রায় প্রকাশ করলে,—হ, বেশ, হেথা থাক্ তবে নকুড়।

ডাঙ্গাকে ইঁট কাটবি সাবি আর তু—চাষ করবি। দেখ কেনে, বনিবনা হলে থাকবি, লয় ছাড় করে খাদ্‌কে যাবি—

সকলে বললে,—হ, এ ভাল বটেক।

মহিম তার নির্দ্দেশ দিয়ে উঠে গেল—গ্রামেরও সকলে একে একে চলে গেল। কেবল সাধু উঠানের এক কোণে তখনও লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ চম্‌কে উঠে সে দেখলে উঠান জনশূন্য। সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে রওনা দিল—রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পাকুড় গাছের নীচে অন্ধকারে একবার দাঁড়িয়ে ফিরে চাইল—

সাবি দেখেছে সাধুকে—তার ব্যাকুল ব্যথিত মুখখানিকে সে বার বার দেখেছে লক্ষ্য করে। সে ছুটে এল সাধুর পিছন পিছন। বাড়ীর পিছন দিয়ে ঘুরে এসে পাকুড়তলায় সাধুকে এসে ধরল। সাবি সাধুর কাঁধের উপর হাত তুলে দিয়ে বললে,—সাধু, মুঁ কি করবেক? উ আস্‌বেক কে জানছে—তু দুখ করিস না, সাধু,—মু ত তুরই বটে—

সাধু অবসন্ন হাত দিয়ে সাবিকে বুকের মাঝে সাপ্‌টে ধরল। চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল অন্ধকারে গড়িয়ে এল তার চিবুকে; সে রুদ্ধকণ্ঠে শুধু বলল,—তু কি করবি, সাবি? তু ভালবাসছিস্‌?

সাঁবি সাধুকে ভালবেসেছে এই তার পক্ষে যথেষ্ট, তার বেশী আর কিছু সে চায় না। সাবি ব্যাকুলভাবে বলল,—সাধু, তু বিয়া কর, তরী তুকে ভালবাসছে—বিয়া কর—

সাধু সংক্ষেপে বললে,—হুঁ, করবেক—

অন্ধকার পাকুড়-ছায়ায় তাদের জীবনের বোঝাপড়া মুহূর্ত্তে যেন শেষ হ'য়ে গেছে এমনি ভাবে দু'জন ফিরে এল বাড়িতে। রাত্রি তখন গভীর হয়নি,—তথাপি মনে হয় গভীর রাত্রির একটা বিরাট বিষণ্ণ অন্ধকারের নিস্তব্ধতায় যেন সমস্ত গ্রাম ছেয়ে গেছে—

তখন চাঁদ ঢলে পড়ছে ভালকুড়ির মাথায়। তার পাদদেশের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে শ্বাপদ,—নিশাচর পাখী ডাকছে গাছের ডালে। ময়াল সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে।

সাবি অপ্রসন্ন চিত্তে নকুড়কে দেখছে আর ভাবছে এই তার স্বামী!

*

পরদিন জগৎপুরের ডাঙায় ইঁট কাটতে গেল নকুড় আর সাবি। সাধুর সঙ্গে কাজ করবে তরী, দামু গেছে লগেনের সঙ্গে—

মণ্টুবাবু বলেছেন, এ সপ্তাহের মধ্যে এক লাখ ইঁট চাই। বৃষ্টির যে রকম তাতে শিগগির আর একটা পাঁজা না পোড়ালে চলবে না। সামনের শীতের মাঝে হাসপাতাল তৈরী শেষ করতে হবে—ইঁট চাই-ই।

পুরাদমে কাজ চলছে—বাবু বলেছেন, যারা সবচেয়ে বেশী ইঁট তৈরী করবে তাদের একখানা করে কাপড় দেবেন। কাজেই প্রতিযোগিতায় সকলেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ চালাচ্ছে—হাজার-করা ইঁটের দামও বাড়িয়েছেন আট আনা।

জয়দেব সেদিন নকুড়কে প্রশ্ন করলে,—সাবি—তোর কে?

নকুড় বললে,—মোর কামিন—

—বিয়ের না সাঙা—

—বিয়ের কামিন—

জয়দেব প্রশ্ন করে জানলে নকুড় কোলিয়ারী থেকে এসেছে। তার পরিচয় সব নেওয়ার পরে মাঝে মাঝেই নকুড়ের ডাক পড়ছে জয়দেবের ঘরে। বিশেষতঃ সন্ধ্যার পরে নকুড়কে সে আট্‌কে রাখে কিছুক্ষণ—চা দেয়—মদও দেয়। নকুড় মাতাল হ'য়ে ফেরে সন্ধ্যার অনেক পরে—সাবি ফিরে আসে আগেই।

প্রথম টাকা পাওয়ার পরেই নকুড় চলে গিয়েছিল কাঁকুড়গাছির মদশালে—ভরপেট মদ খেয়ে পড়ে ছিল রাস্তায়। তাই নিয়ে সাবির সঙ্গে বচসা হ'য়েছে দু'একদিন। এখন সাবি টাকা তার হাতে দেয় না,—দু'জনের টাকা থেকে আট-আনা দেয় মদ খেতে। পাঁচ-আনার মদ আর তিন-আনার তেলেভাজা। নকুড় ঝগড়া করেছে তা নিয়ে, অনুরোধ-উপরোধ করেছে—কিন্তু গোলমাল করতে সাহস করেনি। মহিম এর মাঝেই একদিন তাকে শাসন করে দিয়েছে—কোলিয়ারীর মত এখানে চলবে না। দু'জনে রোজগার করে গরু কিনতে হবে, চাষ-আবাদ করতে হবে। ঘর বাঁধতে হবে। বড়জোর, হপ্তার দিনে এক সের মদ খেতে পারবে সে—কোলিয়ারীর বেপরোয়া জীবন এখানে চলবে না—

নকুড় তাই সাবধান হ'য়ে গেছে,—নইলে যে-কোনদিন ছাড় করবার হুকুম হবে, আর তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে বিনা ওজরে। নকুড় তাই রোজগারের উপায়ান্তর চিন্তা করছিল—

সেদিন কাজের শেষে জয়দেবের ঘরে ডাক পড়ল নকুড়ের। নকুড় সাবিকে বললে,—তু দাঁড়া কেনে, সাবি—এক সঙ্গে যাবেক মোরা। বাবু কি বলছে শুনে লি—

সাবি বটতলায় দাঁড়িয়ে দেখছিল—নোটন জয়দেববাবুর চা তৈরী করছে,

রতন বসে বসে বিড়ি টানছে। কিছুক্ষণ বাদে নকুড় বেরিয়ে এল ঘর থেকে, তার চোখে মুখে একটা প্রসন্নতা। কথা বলতেই সাধু বুঝলো নকুড় মদ খেয়ে এসেছে। নকুড় বললে,—চল্—চল্ ঘরকে যাই—

দু'জনে চলছিল—সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। পথ অন্ধকার; নকুড় আপন মনে বলছিল,—হ, হেথা কোন্ সুখটি রইছে? মদ লেই, মাংস লেই—হ, হোথা খাদ্‌কে কত মজা রইছে। মাঝে মাঝে তামাসা হইছে, লাচ গান কত কি রইছে। এতে খাটছি তা মদ লেই—উই আট আনা মিলছে হপ্তা, ওয়াতে কি হবেক? একসের পঁচুইতে কি হবেক মোর? এক পাঁট চোলাইতে হবেক নাই—

সাবি নীরব ছিল, কিন্তু আর থাকতে পারল না। বললে,—যা কেনে খাদ্‌কে যখন এতে সুখ রইছে। হেথা এলি কেনে তু?

—তুর জন্যে ত আসছি, সাবি—তু ত কিছু দিলি নাই! মোর কথা শুনবি সাবি, কত টাকা রোজকার করবি! তু গরু-বাছুর কেন কেনে, মু মদ খাই—

—টাকা পথে পড়ে রইছে তুর জন্যে।

নকুড় চট্ করে কাছে এসে সাবির কাঁধটা ধরে বললে,—হ, রইছেক, তু জানছিস না। তিনদিনে দু'জনে ত সাত টাকা রোজগার করলেক, এক রাতকে মদ খাবি, ফুর্তি করবি, পাঁচটাকা রোজগার করবি—মাংস খাবি—

সাবি কথাটা বুঝেছিল। সে জবাব না দিয়ে চলতে সুরু করলো। নকুড় বললে,—উ বাবু বলছিল রাতকে হোথা রইবি, মদ খাবি, মাংস খাবি, পাঁচটাকা পাবি। মোরও মদ হবেক মাংস হবেক—

সাবি নীরব।

নকুড় বললে,—শুন্ কেনে, মোর কথা মু ত বলছি তুকে—

সাবি চলতে চলতে বললে,—মু তোর খাদের কামিন বটি! বাবুর ঘরকে রাত কাটাবে, টাকা লিয়ে তুকে মদ খাওয়াবে! উ বলবি ত এক লাথিতে দূর করে দেবেক—মহিম খুড়োকে জানছিস্ নাই—

নকুড় থেমে গেল। সে নিজের মনে বকবক করতে লাগল,—হ, সব কামিনই ত করতে লেগেছে বটে। উ নোটন রইছে না,—কে জানছে বটে! আমি ত রইবেক ডাঙ্গাকে—

সাবি বললে,—মু জানছি, ধরম জানছে—

নকুড় এগিয়ে এসে বললে,—ধরম রইছে কোথা? কুথা ধরম রইছে—টাকা ত ধরম বটে! সাবি, যাবি বাবুর ঘরকে— সাবি তার বলিষ্ঠ হাত দিয়ে

নকুড়কে একটা ধাক্কা দিয়ে বললে,—যা তু—খাদ্‌কে। তুর বাবুর ঘরকে পাঠা কেনে!

নকুড় মাতাল হ'য়েছিল, ধাক্কাটি সামলাতে না পেরে ধুপ্‌ করে পড়ে গেল। তার পরে হঠাৎ কেঁদে উঠল বিকট চীৎকার করে,—হ সাবি, তু মোকে মারলি রে? মোর হাড় ভেঙ্গে গেলেক বটে!

সাবি আবার হাত ধরে তাকে তুলে দাঁড় করালো। বললে,—চল্‌, রাত হলেক নাই?

নকুড় পিঠের ধুলা ঝেড়ে ভাল ছেলেটির মত সাবির পিছন পিছন চলল। সাবি বলল,—চল্‌ গাঁকে, মহিম খুড়োকে বলবেক সব—

নকুড় অনুনয়-বিনয় করলো,—সাবি, মোড়লকে বলবি না। আর বলবেক নাই—তু ভাল তা ত জানছি না—আজকাল কোথা ভালটি রইছে—

সাবির ধাক্কা খেয়ে, আর তার কথা শুনে নকুড়ের শ্রদ্ধা যেন অকস্মাৎ শতগুণ বেড়ে গেল। সে তাই বললে,—সাবি, খাদ্‌কে কি তুর মত কামিন রইছে রে! তাইত হেথা ছুটে আসলেক তুর কাছটিতে। মোরা ইঁটের টাকা দিয়ে গরু কিনবেক, চাষ করবেক—ধান পুঁতবেক—

নকুড়ের নেশা লেগেছে,—সে সাবির সঙ্গে টলতে টলতে চলছে। সাবির প্রতি তার অকুণ্ঠ ভালবাসা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে প্রলাপ বকছে। সাবি চলেছে আগে আগে—সে মাতালের কথায় হাসছে।

সাবির হাসি অন্ধকারে নকুড় দেখতে পায়নি।

*

তরী কাজ করে সাধুর সঙ্গে—

কথা তাদের কমই হয়। হাজার ইঁটের দাম পেলে তারা অংশ মত ভাগ করে নেয়। তরী সেদিন টাকা ভাগ করে নিয়ে বললে,—তু সাবিকে সাঙ্গা করলি না সাধু?

তরী হিহি করে হাসছে। তরী কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পা দিয়েছে, সাবির মত সুডৌল দেহ তার নয়, তবুও যৌবনশ্রী তাকে সুন্দর করে তুলেছে। তরীর ব্যঙ্গ সাধু বুঝেছিল। সাধু বিষণ্ণভাবে তরীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে,—উর মনিষ নকুড় ত ফিরলেক, তু দেখিস্‌ নাই—

তরী আবার হিহি করে হেসে বললে,—চোখ-দুটা ত কপালকে রইছে, দেখবেক নাই কেনে—দেখছি ত বটে—

সাধু বললে,—হ, দেখছিস্ ত সাবির সাঙ্গার কথা বলছিস্ কেনে ? মস্‌করা করছিস্ তু !

তরী গম্ভীর হয়ে বললে,—তু ভালবাসলি তাই বলছি বটে !

—তু বলবি কেনে ? সাঙ্গা করবেক নাই সাবিকে, তা বিয়া করবেক—

—বিয়া করবি তু ?

—করবেক নাই কেনে ? কেনে, তুর কি ?

তরী ক্ষণিক সাধুর মুখের দিকে চেয়ে রইল, তার পর কি যেন একটা বলতে চেষ্টা করল—কিন্তু না বলেই চলে গেল মাটি আনতে।

সাধু ইঁট তৈরী করছে একমনে। তরী মাটি আনছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে দেরী হওয়ায় সাধুকে বসে থাকতে হচ্ছিল। তাই সাধু বললে,—মাটি আনতে লারছিস্, তরী। কাজ কামাই যাচ্ছে বটে !

তরী বললে,—হ, আমি ত সাবি লয়,—

—কাজ কর কেনে,—

—করছি ত বটে !— তরী আবার হিহি করে হাসলো। বললে,—মাটি ত আনছি, আর তু ফুরাই দিচ্ছিস বটে—এতে মাটি টানছি—

সাধু বিরক্তির সঙ্গে বলে,—হোথা কি করছিস্ তরী ? এতে দেরী হচ্ছে এক ঝুড়ি মাটি লিতে—

—হোথা মোর ভালবাসার মনিষ রইছে রে সাধু— তরী আবার হাসলে হিহি করে।

সাধু তাকিয়ে দেখে তরীর মুখের দিকে,—চোখ বুলিয়ে নেয় সমস্ত দেহের উপর দিয়ে। তরীর দেহও সুঠাম সুন্দর হয়ে উঠেছে। কোমরে আঁচল জড়িয়েছে এঁটে, তাই বুক আর নিতম্ব যেন উদ্ধত হ'য়ে উঠেছে দেহের রেখার মাঝে। সাধু দেখছিল—

তরী বললে,—কি দেখছিস্ বটে !

সাধু হেসে বললে,—তুকে দেখছি।

—সাবির রকমটি ত লয় ?

—তা লয় বটে ! তুরও ত দেহটি বেশ হইছে রে তরী—

তরী আবার হিহি করে হাসে। কিছু না বলেই ঝুড়ি মাথায় করে মাটি আনতে যায়। ওরা দু'জনে কাজ করে, মাঝে মাঝে হাসে—

সাবিরা কাজ করে একটু দূরে—সাবি লক্ষ্য করেছে তরীর হাসি, সাধুর চাহনি সে মনে মনে জানে তরী সাধুকে ভালবাসে।

সেদিন বৈশাখের রুদ্র দ্বিপ্রহরে জগৎপুরের ডাঙা মরুর মত উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছিল। বাঁধের ধারে তেঁতুলতলায় বসে ওরা মুড়ি খাচ্ছিল। সাধু আর তরী বসে ছিল কাছেই,—উত্তপ্ত এই ডাঙায় এই সামান্য ছায়ায় ভাড় হয়েছে মানুষের।

তরী হিহি করে হাসছিল। বললে,—সাবি, তুর মনিষ কবে এলেক রে?

নকুড় জবাব দিলে,—হ, দেখিস্ নাই?

পরিহাস চলতে চলতে নকুড় বাঁধে জল খেতে গেল। সাবি বললে সাধুকে,—সাধু, তু তরীকে বিয়া কর কেনে?

তরী চট্ করে বললে,—উঃ বিয়া করবেক নাই, সাঙ্গা করবেক।

সাবি বললে,—সাঙ্গা হবেক নাই। সাধু, তরী তুকে ভালবাসছে, জানছিস্ নাই—

তরী বললে,—উ জানছে নাই।

—তু ত জানছিস্?

—জানছি বটে! হঁ—ভালবাসছি বটে— তরী আবার হিহি করে হাসছে।

সাধু বললে,—পাগলা ত বটি, তু পাগলা কামিন ঘরকে লিব কেনে?

সাবি বললে,—হ পাগলা, উ তুর তরে পাগলা হলেক রে, সাধু—

তরী জবাব দিল,—সাধু ত তুর জন্যে পাগলা বটে! কি হবেক?

তরী হাতে তালি দিয়ে নাচার ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে লাগল। সাবি আর সাধু হেসে উঠল। তারা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে কি যেন একটা বুঝলে। তার পর হেসে সাধু বললে,—উ তরীকে কেনে বিয়া করবে বল্ কেনে—লাচতে লেগেছে হেথা ছাখ কেনে!

জগৎপুরের ডাঙায় ইঁট তৈয়ারী হয় ইমারতের জন্যে—ওরা রৌদ্রে বসে-বসে ইঁট তৈরী করে। মাথায় করে টেনে নিয়ে পাঁজায় সাজিয়ে দেয়। কুলি-কামিন একসঙ্গে কাজ করে,—ওদের মনেও কখন কামনার ইমারৎ তৈরী হয়—ভালবাসা কখনও ভেঙে পড়ে। ওরা ভাঙা ইমারতের আবর্জ্জনায় বসে চোখের জলও ফেলে না, মনের ইমারতে বসে স্বপ্নও দেখে না। জী[illegible] প্রেম-বিরহ, সুখ-দুঃখ ওদের জীবনকে খণ্ডিত করে না, ওরা তাকে [illegible] অঙ্গ করে নিয়েছে—নিরবধি কাজের মাঝে জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম্মকে ভুলিয়ে-

কাঁপিয়ে বৃহত্তর করে নিয়ে তার জন্যে চোখের জল ফেলবার সুযোগ ওদের নেই। জীবন ওদের সরল স্বাভাবিক, সুখ-দুঃখ ওদের পায়ের ভৃত্য—মানব নয়।

*

বৈশাখের মাঝামাঝি শেষ পাঁজায় যে দিন আগুন দেওয়া হ'ল, সেইদিনই ওদের কাজের আপাততঃ শেষ। পরে হাসপাতাল তৈরীর সময় হয়ত আবার কুলি-কামিন প্রয়োজন হবে। মণ্টুবাবু সেই রাত্রে জয়দেবকে বললেন,—ওদের সব এখানে আজ পেট ভরে খাওয়াও;—মদ আর খিচুড়ি-মাংস।

সেদিন আকাশ পরিষ্কার;—নির্মেঘ, নীল আকাশে ক্ষীণ চাঁদ উঠেছে। দখিনের হাওয়া ঝিরঝির করে বইছে। ধীরে সুস্থে পাঁজা-দেওয়া ও লেপা-পোঁছার কাজ হ'য়েছে। সন্ধ্যায় কয়লার গাদায় আগুন দেওয়া হ'য়েছে। ওদিকে পানের ব্যবস্থা হ'য়েছে—এক হাঁড়া পঁচুই মদ। মণ্টুবাবুর আদেশে ডে-লাইট এসেছে একটা। রতন, নকুড় কয়েকজন রাঁধছে।

—মণ্টুবাবু বললেন,—হ্যাঁরে কামিনরা, তোরা নাচগান কর না—

সাধু প্রভৃতি যুবকরা সম্মতি দিল, কামিনরাও রাজী হল। মাদল, জুড়িও জুটে গেল। জগৎপুরের নির্জ্জন ডাঙায় আলো জ্বলেছে, সাধু মাথায় গামছা দিয়ে পাগড়ী বেঁধে মাদল নিয়েছে; দু-একজন আড়বাঁশী নিয়েছে। ঢোলকের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে কামিনরা সারিবদ্ধভাবে নাচতে সুরু ক'রল।

ওদিকে মিস্ত্রী-মুরুব্বিরা পাঁজায় আগুন দিয়েছে। আগুনের ধোঁয়া পাঁজার উপর দিয়ে বেরিয়ে বাতাসে মিলে যাচ্ছে—

মণ্টুবাবু সকলকে উৎসাহিত করে একবার ঘুরে এলেন। জয়দেব খাটিয়াটায় কম্বল বিছিয়ে তাঁকে বসতে দিল। মণ্টুবাবু কামিনদের নাচ দেখতে দেখতে দ্রব্যগুণে ধীরে ধীরে ঢলে পড়লেন খাটিয়ায়।

গানের পরে খাওয়া হল—সকলে মণ্টুবাবুর জয় দিলে সমস্বরে। মাতাল নকুড় টলতে টলতে এসে বললে,—অলেক বাবু দেখলেক বটে, এমন বাবুটি দেখি লাই। আমি তোর জুতার গোলাম বটি!

নকুড় টলতে টলতে গিয়ে মণ্টুবাবুর পায়ের কাছে শুয়ে পড়ল। মাতালের কৃতজ্ঞতার বাড়াবাড়িও আনন্দে উচ্ছ্বাসে রাত্রি গভীরতর হ'য়ে উঠল। জগৎপুরের পাথরে ডাঙা দিনের উত্তপ্ত নিশ্বাস ছেড়ে শীতল হয়ে এসেছে। [illegible] চাঁদ ভালকুড়ি পাহাড়ের মাথায় ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। ডে-লাইটের আলো ক্ষীণপ্রভ হ'য়ে উঠেছে—

নেশাখোর কুলি-কামিনরা শুষ্ক তৃণের বিছানায় গামছা বিছিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছে;—কেউ নেশার ঘোরে, কেউ ক্লান্তিতে। উন্মুক্ত আকাশের নীচে রাত্রিযাপন এদের নতুন নয়, উঠানে খাটিয়া পেতে আকাশের নীচেই এরা ঘুমায়। শয্যার কোমলতা এদের নিষ্প্রয়োজন—উষর মৃত্তিকা, পাথর-কাঁকর এদের নিদ্রাকে প্রতিহত করতে পারে না। পরম নিশ্চিন্তে এরা শুয়ে পড়েছে জগৎপুরের ডাঙায় ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে—

সাধু কেবল জেগে ছিল কিসের এক উদগ্র আশায়। সে ধীরে ধীরে গিয়ে সাবিকে ডাকল। সাবি চোখ মেলে চেয়ে দেখে জগৎপুরের ডাঙা সুপ্ত—গভীর নিদ্রায় অচেতন। ডে-লাইট নিভে গেছে, চাঁদ ডুবে গেছে ভালকুড়ির আড়ালে। স্বচ্ছ অন্ধকারে কেবল গাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে কালো ছায়ার মত, আকাশের তারাগুলো জলজল করছে—চোখ মেলে তাকিয়ে আছে তন্দ্রাগত পৃথিবীর দিকে। নিষুতি-রাতের একটা কা-কা শব্দ একটানা কানে আসছে। ইঁটের পাঁজার ফাঁকে ফাঁকে লাল আগুন লক্‌লক্ করছে—আর পাঁজার উপরে কয়লার কালো ধোঁয়া বাষ্পের সঙ্গে মিশে কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠছে—বটগাছের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে ঘোড়ামারার দিকে। দূরে কাঁকুড়গাছির কোলিয়ারীতে শব্দ হচ্ছে ঘটাঘট্—

সাবি উঠে বসল। সাধু তার হাত ধরে যেতে ইঙ্গিত করল সঙ্গে সঙ্গে। সাবি দাঁড়িয়ে দেখলে চারিপাশে তাকিয়ে,—নিঝুম রাত্রি। আজকার জনবহুল জগৎপুরের ডাঙাও নিঃশব্দ অচেতন। নকুড় নেশার ঘোরে পড়ে আছে বাবুর পায়ের পাশে—

সাধুর পিছন পিছন সাবি এসে দাঁড়াল বাঁধের ধারে তেঁতুলগাছের আড়ালে। সাধু মৃদুকণ্ঠে ডাকল,—সাবি!

—কি বলছিস্—

—মু কি করবেক সাবি? তু ত ঘরকে এলি না, মু কি করবেক?— সাধুর কণ্ঠস্বর জড়িয়ে এসেছে—সে সাবিকে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে চোখের জল ছেড়ে দিল।

সাবি বললে,—মু কি করবেক সাধু! মোর মানষ ঘরকে এলো—কি করবেক? তু বিয়া কর—

সাধু জড়িতকণ্ঠে বললে,—মু বিয়া করবেক নাই—

সাবির হৃদয় করুণায় আর্দ্র হয়ে উঠেছিল। সে বললে,—তু তরীকে বিয়া কর। তরী তুকে কত ভালবাসছে তু জানছিস্ না—

—আমি সাবিকে জানছি, সাবি ছাড়া কোনো কামিনকে জানছি না—তু কি করলি সাবি !

সাবি মৃদুকণ্ঠে বললে,—মু কি করবেক, তুকে ভালবাসাছ, ঘর করছি নকুড়ের। তু বিয়া কর তরীকে,—মোকে ভুলে যাবি—

—তু ভালবাসছিস্—

—হ, সাধু তু ত জানছিস্ না !— সাবির চোখ দিয়ে একফোঁটা জল গড়িয়ে এল অন্ধকারে। সে জড়িতকণ্ঠে বললে,—তু বিয়া কর তরীকে, মু ত তুরই রইছি সাধু, তুরই থাক্‌বেক্—

সাধু সাবিকে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কেঁদে উঠল।

নির্জ্জন নিশীথের গভীর অন্ধকারে তারার মালা চেয়ে রইল পৃথিবীর পানে পরম বিস্ময়ে। অন্ধকারে তেঁতুলগাছের ছায়ামূর্ত্তি হঠাৎ যেন দক্ষিণা বাতাসে একবার নড়ে চড়ে উঠল, কিন্তু আবার থেমে গিয়ে মিশে রইল অন্ধকারে। অন্ধকারের গভীর তলদেশে চলেছে আদিম পৃথিবীর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার স্রোত—যুগযুগান্ত ধরে পুরুষানুক্রমে। আকাশ ঘুরছে তার তারায়-ভরা বসন পরে পৃথিবীকে ঘিরে। নীচের পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে স্থির, অচঞ্চল—

সাবি আর সাধু দু'জনই কাঁদছে, দু'জনকে বুকের মাঝে নিয়ে—মাথার উপরে আকাশ আবর্ত্তিত হ'চ্ছে, নিঝুম শ্রান্ত জগৎপুরের ডাঙা নেশার ঘোরে ঘুমুচ্ছে। ওধারে কাঁকুড়গাছির বয়লার হুস্‌ হুস্‌ শব্দ করছে—নির্জ্জন প্রান্তরের উপর দিয়ে সে-শব্দ ভালকুড়ি পাহাড়ের গায়ে এসে ফেটে পড়ছে—শোনা যাচ্ছে ঘোড়ামারা থেকে।

জগৎপুরের ডাঙায় হাসপাতাল হয়েছে—

সামনে বড় হাসপাতাল,—দশটি বিছানা। বাইরের রোগী দেখবার ঘর, অস্ত্র-চিকিৎসার ঘর, ওষুধের ঘর, প্রসব-গৃহ নিয়ে বিরাট পাকাবাড়ী, উপরে ঢেউ-টিন! তার পিছনে ডাক্তারের বাসা, নার্সদের বাসা, কম্পাউণ্ডার, অ্যাসিস্ট্যাণ্টবাবু, রাঁধুনী প্রভৃতির ছোট ছোট বাসা। মেথরের এক কোঠার বাসাটা একটু দূরে। হাসপাতালের ডাঙায় নার্স প্রভৃতি সব এসে গেছে, হাসপাতাল চলছে—

ঘোড়ামারা আর কাঁকুড়গাছির মাঝে এই ডাঙা একদিন বিষণ্ণ নির্জ্জনতায় পড়ে ছিল। শুধু একটা পায়েচলা পথ বটগাছের পাশ দিয়ে নেমে গেছে কাঁকুড়গাছির হাটের দিকে। ক্লান্ত পথিক কখনও সেখানে এসে বসত, চাষীরা দ্বিপ্রহরে ওখানে বসে মুড়ি খেত; গরুর দল নিয়ে রাখাল ছেলে আসত। সরকার-বাঁধের জলসেচ হত পাশের জমিতে, তেঁতুলতলায় রাখাল ছেলে বসে বাঁশী বাজাত। সেখানে আজ সভ্যতার আলোক ঢুকে পড়েছে, নিরন্ন বুভুক্ষিত দেশবাসীর খাদ্যের ব্যবস্থা না হলেও, বুভুক্ষা-জনিত ব্যাধি-চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত হ'য়েছে। শিক্ষিত বেকার সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়েছে—

ডাঙাটা জমে উঠেছে, লোকজন বসবাস করছে। দিনে বহু রোগী ওষুধ আনতে যায়, দুধওয়ালা যায়, মাছ নিয়ে জেলেব মেয়েরা যায়, তরকারী নিয়ে ঘোড়ামারার লোকও যায়। জগৎপুরের ডাঙার মাধ্যমে কাঁকুড়গাছি-ঘোড়ামারায় যোগাযোগ হ'য়েছে। নার্স, ডাক্তারের স্ত্রী প্রভৃতি অনেকে মাঝে মাঝে ভালকুড়ি পাহাড় পর্য্যন্ত বেড়াতে আসে। রোগী আনতে, নিতে, রোগী দেখাতে বটতলাতে গরুর গাড়ীর ভীড় জমে যায়। এমন কি, উৎসাহী দু'একজন ডাঙার মাটি খুঁড়ে, তাতে গোবর ভর্ত্তি ক'রে কুমড়ো লাউগাছ করেছে। ডাক্তার সৌখিন লোক, তিনি ফুলের বাগান করেছেন—বিলাতী মরশুমী ফুলের গাছ।

ভাদ্র থেকে আরম্ভ করে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত হাসপাতাল তৈরী হ'য়েছিল। ঘোড়ামারার অনেকেই কুলি-কামিন খেটেছে। সাবি, নকুড়, সাধু, তরী সকলে ইঁট বয়েছে, মসল্লা নিয়ে মই বেয়ে উপরে উঠেছে, ইঁট ভেঙে খোয়া তৈরী করেছে, দুরমুশ দিয়ে পিটে হাসপাতালের পুস্তন শক্ত করেছে, বারান্দার

মাটি পিটে বসিয়েছে। বাঁধ থেকে মাটি বয়ে এনে সমান করেছে গর্ত্ত, উঁচু-নীচু জমি। ইঁট থেকে ওর চালা মারা পর্য্যন্ত আগাগোড়া ছিল ওরা,—ওরা কাজ করেছে,—ওদের শ্রমে, ওদের রক্তের বিনিময়ে তৈরী হয়েছে হাসপাতাল। মণ্টুবাবু, জয়দেব ছাতা মাথায় দিয়ে কাজ দেখেছেন, ওরা রোদের মাঝে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খোয়া ভেঙেছে, দুরমুশ করেছে পুস্তন। সন্ধ্যায় রোজ নিয়ে গেছে বাড়ীতে।

সরকারী হাসপাতাল।

সামনে বড় অক্ষরে লেখা আছে 'কাঁকুড়গাছি স্বাস্থ্যকেন্দ্র'। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ বহুবিধ—কেবল চিকিৎসাই নয়, গ্রামে গ্রামে সংক্রামক রোগ নিরোধ, সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা, ছাত্রগণের স্বাস্থ্যপরীক্ষা, এবং টি-ডি অর্থাৎ ট্রেন্‌ড্‌ দাই আছে সন্তানসম্ভবা রমণীগণকে উপদেশ দিতে। পাঁচটি বিছানা মেয়েদের জন্যে—প্রধানতঃ মাতৃমঙ্গলের জন্য।

সভ্যতার আলোর ছোঁয়া লেগেছে ঘোড়ামারা গ্রামে—এতদিন কাঁকুড়গাছি হাটে যাওয়াই ছিল ঘোড়ামারার সকলের সৌখিনতা—মাঝে মাঝে মেলায়ও যেত, আজ তারা দেখছে অনেক কিছু। ঔষধ, যন্ত্রপাতি, শিক্ষিত লোক, জুতা-পায়ে-দেওয়া শিক্ষিতা চাকুরে মেয়ে। কোট-পেণ্টলুন-পরা সাহেব—এমন কি দুই-একবার জীপগাড়ী পর্য্যন্ত এসেছে জগৎপুরের ডাঙা অবধি। মাঠে কাজ করতে করতে ঘোড়ামারার লোকেরা অবাক বিস্ময়ে দেখেছে ধুলা উড়িয়ে হাওয়া-গাড়ী যেতে।

সাবি আর নকুড় যা রোজগার করেছিল তাতে একজোড়া গরু কিনেছে তারা। জমি চাষ করে, লাঙল বিক্রি করে, পরের ক্ষেতে মনিষ-কামিন খাটে। ভাঙা ঘরটা বাগিয়ে ভাল একখানা ঘর করেছে তারা,—একঘরে থাকে বুড়ী-মা, অন্য ঘরে থাকে তারা। হাট থেকে একখানা ৺কালীর বাঁধানো ছবিও এনে ঝুলিয়েছে ঘরে—

সাবির বোঝা বেড়েছে, কমেনি। নকুড় রোজগার করে, কিন্তু কেড়ে না নিলে, সে তার রোজগারটা মদশালেই রেখে আসে। কোলিয়ারীর সভ্য জগতে থেকে নকুড় দুটো জিনিষ কলাবিদ্যা হিসাবে শিক্ষা পেয়ে এসেছে,—নিয়মিত মদ খাওয়া একটি। স্ত্রীলোকের সতীত্ববোধ সম্বন্ধে তার কোন সংস্কারও নেই। দ্বিতীয়তঃ, কাজে কি করে ফাঁকি দিতে হয় সেটা সে কলাবিদ্যা হিসাবে আয়ত্ত করেছে। তার ফলে নকুড়কে কেউ মনিষ ডাকে না,—যদি সাবি কামিন থাকে তবেই ডাকে। মুজুরীর পয়সা সাবি জোর করে কেড়ে নেয়,

তবুও রক্ষা নেই—ফাঁক পেলেই ঘরের টাকা চুরি করে মদ খেয়ে আসে কাঁকুড়-গাছির মদশাল থেকে, এসে হৈ-চৈ করে বাড়ীতে। নইলে সাবিদের অবস্থার উন্নতি হত আরও অনেক। ঘরের চাল মাঝে মাঝে চুরি করে নকুড় পচুই তৈরী করে, এর মাঝেই ধাঙড়পাড়ায় দু'চারজনকে বন্ধু করে মদ তৈরীর আখড়া খুলে দিয়েছে। মা আর মেয়ে দু'জনে চোখ রেখেও নকুড়কে সামলাতে পারে না। বচসা হয়, মারামারিও হয় মাতাল হ'য়ে—নালিশ হয় মহিম খুড়োর কাছে।

মহিম হুকুম দেয়,—নকুড়, এসব করবেক ত ছাড় করে খাদ্‌কে যা—এটো গাঁ বটে, হেথা খাদের বেলেল্লাপনা চলবেক নাই—

নকুড় জবাব দিলে মহিম হুঙ্কার দিয়ে ওঠে,—ঠেঙিয়ে জ্যান্ত পুঁতবেক ভালকুড়ির জঙ্গলে, তুর কোন্ বাবা আসবেক রে শালা—

নকুড় ঠাণ্ডা হয়ে যায় কিছুদিনের জন্য।

সাধুর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তরীর, তারা ঘর পেতেছে। তারা সাবিকে নিয়ে মাঝে মাঝে ঝগড়া করে, কাজ করে, চাষ করে। তরীর ধারণা সাবির সঙ্গে সাধুর এখনও পূর্ণ-বিচ্ছেদ ঘটেনি, সাধু সাবিকে ভালবাসে।

হাসপাতাল তৈরী হওয়ার পরে নোটন গ্রামে ফিরে এসেছিল, কিছুদিন ছিল। তারপর নাকি বিয়ে হ'য়ে কোথায় গিয়েছিল—কিন্তু স্বামীর ঘর না করে আবার ফিরে এসেছে ঘোড়ামারায়। ধাঙড় আর বাউরীপাড়ার ছোকরাদের সঙ্গে মশকরা করে ঘুরে বেড়ায়, কামিন খাটে। কালীধাঙড় কিছু বলে না,—সংসারে তার কামিন না হলে চলে না। গোবর ঘুঁটে কাঠ জোগাড় করা, ধানপোঁতা ধানভানা একা কালীর স্ত্রী পেরে ওঠেনা ছেলে-পুলে নিয়ে।

ঘোড়ামারার জীবন চলেছে একই তান লয়ে—

ঘোড়ামারার গাঁ থেকে হাসপাতালটা দেখা যায় স্পষ্ট। ভোরের আলোয় সাদা বাড়ীগুলো ভেসে ওঠে পুবদিকে,—রাত্রে সেথায় আলো ঝলমল করে। জ্যোৎস্নারাত্রে সাদা ঘরগুলি ছবির মত দেখায়—ভালকুড়ি পাহাড়ের উপর থেকে দেখা যায় কতকগুলো সাদা দেশলাইয়ের বাক্স যেন পড়ে রয়েছে শ্যাওড়া গাছের পাশে। তার মাঝে পিঁপড়ের মত মানুষগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হাটের পথে ওরা উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে আসে হাসপাতালটা,—নতুন জিনিষ যা দেখে তা নিয়ে গল্প করে, গবেষণা করে। লেখাপড়া-জানা চাকুরে মেয়েদের দিকে বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে তাকায়, এসে নানা গল্প করে।

ডাক্তারের স্ত্রী নাকি খুব লেখাপড়া-জানা ওরা শুনেছে,—তাকে দেখবার কৌতূহল ওদের অদম্য।

সেদিন সাবি কাঁকুড়গাছি থেকে ফিরে এসে মায়ের নিকট তাই বললে,—মা রে, ডাক্তারের বৌটা খুব লেখাপড়া জানছে, চেহারা কি সুন্দর, দুর্গা-ঠাকুরের মত রংটি, তেমনি সাজ-পোষাক করছে, মা—খয়রাশোলের ঝুলনের পুতুলের মত মনে লাগছে বটে। হাঁ—সুন্দর বটে!

—তু দেখলি সাবি?

—হ, দেখলেক। জুতাটি পায়ে দিয়েছে, পলাশ ফুলের রং কাপড়টি পরেছে, বাগানকে ঘুরে বেড়াতে লেগেছে—আলো হ'য়েছে বটে···

—ডাক্তারটো—

—উ ভাল বটি। রংটো ময়লা,—সাহেব বটে। উর কাছকে কে যাচ্ছে? রুগী দেখছে, ছুরি দিয়ে ফোঁড়া কাটছে, সূচ দিচ্ছে বটে—হোথা কোন্ দাঁড়াবেক? কড়া সায়েব বটি—

সাবি কিছুক্ষণ থেমে বললে,—হোথা কত রুগী যাচ্ছে, লাল লীল ওষুধ লিয়ে যাচ্ছে, বাবুরা যাচ্ছে। ইধারের রুগী ত লাই—রুগী সব বাবুরাই ত—

—কামিন-মনিষ যাচ্ছে নাই?

—তাদের কোন্ রোগ রইছে? জ্বর-জ্বালা হলে ত যাবেক!

সাবি দেখে এসেছে রোগী সবই ভদ্রঘরের বাবুরা—নানাবিধ ওষুধ নিয়ে যাচ্ছে। ছোটলোক চাষা-মুজুর যারা, তারা সেখানে যায় নাই। তাদের রোগ-ব্যধি নাই, ওষুধও তারা হামেশা খায় না। বাবুদেরই অসুখ বেশী, তাদেরই ওষুধের প্রয়োজন। সামান্য অসুখে তারাই ওষুধ খায়—সাবিদের তার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ জ্বর, সর্দ্দি-মাথাধরা তাদের হয়ও না, হলেও, তার ওষুধ দরকার হয় না, এমনিই ভাল হয়। দু'একজন যারা যায়, তারা ওষুধ নিয়ে আসে—

*

হাসপাতালের ডাক্তার রবীন সেন। তাঁর স্ত্রী রমলা গ্রাজুয়েট। দু'টি নার্স আছে,—একটি টি. ডি। ট্রেন্‌ড্ দাই, কম্পাউণ্ডার ও অ্যাসিষ্টাণ্টবাবুও সস্ত্রীক বাস করেন। আর চাকর-ঝিও জুটেছে স্বামী-স্ত্রী এক দম্পতি। রাঁধুনী তথা কুক্ আছে শরতের মা।

ডাক্তার ভাল লোক। লোক হিসাবে এবং ডাক্তার হিসাবে দেখতে দেখতে সুনাম হয়েছে। হাসপাতালের বেড প্রায় ভর্ত্তিই থাকে সর্ব্বদা, ডাক্তার

যথেষ্ট যত্ন নেন তাদের। কর্ত্তব্যের ত্রুটি তাঁর নেই, কারও ত্রুটি হলে ক্ষমাও করেন না। দুর্নামের মধ্যে লোকে বলে অত্যন্ত কড়া মেজাজ—তাঁর কথা না শুনলে রোগীদের যাচ্ছেতাই গালাগালি করেন, এবং রোগীরা নিয়ম না মানলে এক কথায় বিদায় করে দেন—সেখানে দয়া-ধর্ম্ম তাঁর নাই। বাহিরের ডাক তাঁর যথেষ্ট থাকলেও যান না—নিয়ম মত চলেন। সখও তাঁর আছে—ফিট্‌ফাট্ থাকা, বন্দুক নিয়ে শিকার করা, মাছ ধরা বাতিকও তাঁর আছে। অন্যদিকে স্ত্রীটিও সুশিক্ষিতা, গানবাজনাও তাঁর কিছু কিছু জানা। একটি মাত্র মেয়ে, বছর সাতেক বয়স। ডক্তারের বয়স বছর পঁয়ত্রিশ, কিন্তু দেখলে মনে হয় একটু বেশী,—সামনে একটু টাক দেখা দিয়েছে—

ডাঙা জমজমাট হ'য়ে ওঠে সন্ধ্যায়। কাঁকুড়গাছির ইস্কুলটা জগৎপুরের ডাঙার পরের ডাঙায়—পোয়াটাক রাস্তা। বিকেলে ছড়ি দোলাতে দোলাতে হেডমাস্টার আর পণ্ডিতমশায় বেড়াতে আসেন রোজই। পণ্ডিতমশায় হোস্টেলে থাকেন, হেডমাস্টারের ভ্রমণ-সঙ্গী। গ্রামের ভাঙা জমিদার বংশের অবস্থাপন্ন সরিক মানু মিত্তিরও প্রায়ই আসেন। কখনও কখনও মণ্টুবাবু আসেন বেড়াতে। হাসপাতালের সামনেই সুন্দর প্রাঙ্গণ, তার পরেই মাঠ। সেখানে লোহার বেঞ্চি পেতে সন্ধ্যায় আড্ডা বসে, রাত্রি আটটা অবধি চলে গল্পগুজোব; রমলা চা তৈরী করে পাঠান—চা খেয়ে বিড়ি-সিগারেট পুড়িয়ে কাঁকুড়গাছির সকলে ফিরে যান টর্চ্চ জ্বালাতে জ্বালাতে।

আড্ডাটা রোজ বিকেলেই বসে—জ্যোৎস্নারাত্রি লোক হলে সমাগম বেশী হয়। অন্ধকারপক্ষে কম,—ঝড়বৃষ্টি বা দুর্য্যোগ হলে মোটেই বসে না। রমলা দেবী মাঝে মাঝে বিরক্ত হন চা করতে, কিন্তু ডাক্তার বলেন,—এই নির্জ্জন কারাবাসে ওঁরা না এলে থাকি কি করে? চা বন্ধ করলে ওঁরাও আসবেন না—

পণ্ডিতটি সনাতনপন্থী, হেডমাস্টারটি আধুনিক শিক্ষা লাভ করলেও অনেকটা গোঁড়া, মানুবাবু প্রগতিবাদী। মণ্টুবাবু সংস্কারমুক্ত কন্‌ট্রাক্টর—তাঁর নীতি যুক্তি সবই স্বর্ণমানের পরিমাণে। কাজেই এই আড্ডার আর একটি অঙ্গ আলোচনার মাঝে অন্যকে আক্রমণ। ডাক্তারের মতবাদ আছে—তবে তিনি নিজেই যখন হোতা, অতিথিগণকে তাই আক্রমণ করেন না। হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নার্সরাও মাঝে মাঝে তাঁদের আলোচনা শোনে এবং হাসে। ওটা তাদেরও একটা পরোক্ষ প্রমোদ। নার্সদের মধ্যে বাসন্তী নবীনা, দেখতেও ভাল। শীর্ণ সুঠাম দেহ, বর্ণ সুন্দর—শোনা যায় ভালঘরের মেয়ে,—ব্যবহারেও তা বোঝা যায়। সে বিধবা কিন্তু বৈধব্যের কৃচ্ছ্রসাধন চাকুরী রক্ষা করে সম্ভব

হয় না। তাই খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তার তেমন সংস্কার নেই। মান্নুবাবু আর মণ্টুবাবুর চরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট সুনাম নেই, তাই ডাক্তার চোখ রাখেন বাসন্তার দিকে এবং সাবধানও তাকে করে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে।

সেদিনও আড্ডা হচ্ছিল,—সন্ধ্যা হয়েছে, ভালকুড়ির মাথার উপরে নবোদিত চাঁদের আলো পড়েছে। বটগাছের ছায়াটা আড্ডাস্থানের পিছনে পড়েছে কালো হ'য়ে রাস্তার উপর। হাসপাতালে তেমন কঠিন রোগী নেই, ডাক্তারের মনটা আজ প্রসন্ন।

ওয়ার্ড-সারভেণ্ট মধু চা দিয়ে গেল সকলের,—ডাক্তারের মেয়ে অর্চ্চনা চা নিয়ে এল পণ্ডিতমশায়ের। ডাক্তারই প্রথম খোঁচা দিলেন পণ্ডিতমশায়কে, —পণ্ডিতমশায়, আচ্ছা, আপনি বাইরে গেলে চা খান না দোকানে?

পণ্ডিতমশায় অর্চ্চনার হাত থেকে চা'র পেয়ালা নিয়ে বললেন,—খাই।

—চা'র দোকানের লোক কি জাত তা ত জানেন না, সেখানে যদি চা খান তবে এখানে মধু চা আনলে খান না কেন?

মান্নুবাবু বললেন,—এই—এই, এই হচ্ছে ভণ্ডামি। বাইরে গেলে খাই, অথচ এখানে খাইনে। ডুবে ডুবে জল খেলে একাদশীর উপোস বন্ধ হয় না—এর কোন মানে হয়?

'এর কোন মানে হয়?'—বলাটা মান্নুবাবুর মুদ্রাদোষ—সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি সঞ্চালন করাটাও তাঁর একটা দোষ, যার অর্থ স্থান-বিশেষে নানারূপ হয়।

হেডমাস্টারটি কথা কম বললেও রসিক লোক, চুট্‌কি গল্পে বিশারদ। তিনি বললেন,—আহা-হা, তাই বলে কলা দেখাচ্ছেন কেন? মানে থাক্‌ বা না থাক্‌, তাই বলে কলা-দেখানটা?

মান্নু মিত্তির বললেন,—এই কুসংস্কারের জন্যে বামুনরা ত মরেছেই, হিন্দু-সমাজটাকেও মেরেছে। জাতিভেদ প্রথাটাই হিন্দুকে বিচ্ছিন্ন করে দুর্ব্বল করেছে—

পণ্ডিতমশায় অর্চ্চনার হাত থেকে চা নিয়ে খাচ্ছিলেন আর হাসছিলেন। হেডমাস্টার বললেন,—ওসব ত রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মহাত্মা বলেছেন, জহরলাল এ নিয়ে আইন করেছেন। নতুন যুক্তি কি দেখলেন মিত্তিরমশায়—জাতিভেদ ত বহুকালের, কিন্তু ভেদবুদ্ধিটা যে নতুন আমদানী।

ডাক্তার বললেন,—কতদিনের আমদানী, মান্নুবাবু—

—যতদিন জাতিভেদ আছে তত দিনই—পণ্ডিতমশায় যদি আমার বাড়ীর ভাত না খান তবে ওঁর বাড়ী খাবো কেন?

ডাক্তার বললেন,—তাতে ত লাভই হবে পণ্ডিতমশায়ের—২৫।২৬৲ টাকার চাল বাঁচবে দু'চারসের।

হেডমাস্টার বললেন,—হ্যাঁ, তা বটে। তবে ভেদবুদ্ধিটা অত পুরোনো নয়, ওটা ইংরাজি শেখার সমবয়সী হবে। জাতিভেদ থাকলেও প্রীতির অভাব ছিল না। ধর্ম্মভয় আর ব্রাহ্মণ-ভক্তি প্রভৃতির মধ্যে সততা সাধুতা কিছু ছিল, পরস্পরে প্রীতি ছিল—কিন্তু এখন আর নেই।

মানুবাবু বললেন,—এখন শিক্ষা পেয়ে সবাই চোর হয়েছে।

ডাক্তার বললেন,—এটা কিন্তু সত্যি। সরকারি চাকুরি করে সেটা বুঝতে পারি। হাসপাতালের ওষুধ আনতে গেলেও কেরানীকে ঘুষ দিতে হয়, নইলে শহরে বিনাশয্যায় রাত্রিবাস এবং মশকদংশন।

পণ্ডিতমশায় চা'র পেয়ালা নামিয়ে রেখে বললেন,—সমগ্র ভারতে আজ একটু খাঁটি গব্যঘৃত মিলবে না, কিন্তু একদিন মিলত। ব্রাহ্মণকে জল খাওয়াবো এই ভয়েতে দুধে জল দিত না—আজ জলহীন দুধ নেই, মাঝে মাঝে দুধে চিংড়িমাছও পাওয়া যায়—

ডাক্তার বললেন,—চিংড়িমাছ অবশ্য পাইনি, তবে ছোট পানা পেয়েছি—

মানুবাবু বললেন,—সেটা শিক্ষার অভাব—আপনারা ঠিক শিক্ষা দিতে পাচ্ছেন না তাই।

হেডমাস্টার বললেন,—এইটা ডিস্‌পুট দিলাম—

—দিতেই হবে, আঁতে ঘা লেগেছে যে!

—হ্যাঁ, ঘায় আঘাত। বাবা মা লম্প ধরে ছেলেকে এঁচোড় চুরি করতে গাছে ওঠাবেন, মাস্টারমশায়কে প্রহার করতে বলবেন, নিজেরা জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা বলবেন, কালোবাজারে লাভ করবেন—কিন্তু ছেলেটিকে যুধিষ্ঠির করবার ভার আমাদের—

ডাক্তার বললেন,—খেয়ে খেয়ে উদরাময় করবেন, আরোগ্যের ভার আমাদের উপর—

মণ্টুবাবু নির্ব্বাক ছিলেন, তিনি বললেন,—এ আরোগ্যের জন্যে হাসপাতাল হবে—তৈরীর ভার আমার।

সকলে মণ্টুবাবুর কথায় হেসে উঠলেন। মানুবাবুর মনে হচ্ছিল তিনি হেরে যাচ্ছেন, তাই তিনি বললেন,—এ সমস্ত সংস্কার—কুসংস্কার, কোন মানে হয়? আমরা মানুষ না? পণ্ডিতমশায়ও মানুষ, আমরাও মানুষ—তবে আমার ছোঁয়া খেলেই জাত যাবে!

ডাক্তার বললেন,—সত্যিই এটি বাড়াবাড়ি,—ছোঁয়া খাবেন না কেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে—মানুবাবু শিক্ষা দীক্ষা আচারে অনুষ্ঠানে কম ত নয়—

পণ্ডিতমশায় বললেন,—বেশী, বলবানও বটে, সমান ত নয়ই—

হেডমাস্টার হেসে বললেন,—পণ্ডিতমশায়, বলবান দেখে ভয় পেয়েছেন—

আলোচনাটা জুড়িয়ে যাচ্ছে দেখে ডাক্তার আবার খুঁচিয়ে তুললেন,—সংস্কারটা ভাল নয় কিন্তু যতই বলুন—

মানুবাবু ডাক্তারের সাহায্য পেয়ে চটে উঠলেন,—ভাল নয় মানে? একেবারে খারাপ। সংস্কারই আমাদের ক্ষতি করেছে সমাজের—

—শুধু ক্ষতিই করেছে মিত্তিরমশায়?— ক্ষীণকায় পণ্ডিতমশায় সভয়ে বললেন।

—তা ছাড়া কি?

সংস্কার থাকলে একটা বিষয়ে কিন্তু আপনারা অনেকটা বেঁচে যেতেন, যেমন ধরুন এদেশে একটু পচুই বা কারণ-বারি পান প্রায় সকলেই করেন। জাত-বিচারটা যদি ঠিক থাকতো, মানে ঐ ছোঁয়াছুঁয়ির সংস্কারটা থাকলে অন্ততঃ ওটা অতদূর যেত না—শুঁড়ির ছোয়াটা বাঁচিয়ে চলতেন—

মানুবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, তিনি মনে মনে ভেবেছিলেন তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি বললেন,—বাজে ভড়ং আমাদের নেই, কারণ একটু স্বাস্থ্যের জন্যে খেলে ক্ষতি কি!

হেডমাস্টার বললেন,—কিন্তু যদি জমি, বাসন-কোসন বিক্রি করে হয় তবে সেটাই খারাপ—

—হ্যাঁ, সবাই তাই করছে, দেশটা-সুদ্ধ মাতাল বুঝি—

পণ্ডিতমশায় বললেন,—আর ধরুন, এই-যে বাগদী বাউরী ধাঙড় মেয়ে নিয়ে কেলেঙ্কারী এগুলোও অন্ততঃ এত হত না—ছুঁতে নেই এই সংস্কারটা থাকলে—

মানুবাবু আরও উত্তেজিত হয়েছিলেন। মনে মনে তিনি এটাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ মনে করে বললেন,—ছোটলোক, ওদের আবার কি? বয়সকালে একটু এধার-ওধার হয়ই—তাতে কি আসে যায়—ওটা বাইওলজিক্যাল প্রয়োজন—

হেডমাস্টার বললেন,—যদি এধার-ওধার হয়ই, তবে ধরুন যুধিষ্ঠির তৈরী করাটা আর আমাদের চলে কি করে? যারা বাইওলজি পড়বে তারা কি আর ইংরিজিতে পাস করে?

একবার দমকা হাওয়ার মত একটা হালকা হাসি চলে গেল। পণ্ডিতমশায় কোণঠাসা মানুবাবুর উদ্দেশে বললেন,—সকলেই যদি সমান, তবে বিয়ে শ্রাদ্ধে বামুন ডাকেন কেন মন্তর পড়াতে? আপনারা নিজেরাই ব্যবস্থা করলে পারেন—

—করা উচিত, কিন্তু সমাজ ত এখনও সংস্কারমুক্ত হয়নি—

—ও, তা হলে সংস্কারটা কেবল বামুনেরই নয়, আপনাদেরও আছে!

ডাক্তার বললেন,—নেই কেবল বৈদ্যজাতির। আমরা সকলেরই ইন্‌-জেক্‌শন দি'—কেটে চৌচির করে দি'—

—কিন্তু পুজোর বেলায়?

—খরচার ভয়ে ওটা করি না।

পণ্ডিতমশায় বললেন,—নিজেরা করলে আর খরচা কি? বামুনকে ত দেওয়া লাগল না, ঘরে-ঘরেই হ'ল।

হেডমাস্টার বললেন,—কাল সমাধান হবে,—আজ রাত্রির মত থাক্‌—তিনি উঠলেন।

সভাভঙ্গ হল। টর্চ্চ জেলে জুতা পায়ে দিয়ে কাঁকুড়গাছির সকলে উঠলেন।

ডাক্তার বললেন,—ঐ টায়ফয়েড রোগীর জ্বর কত, বাসন্তীদেবী!

—জ্বর হয়নি, ৯৭৷৷০ ডিগ্রি—ভাত খেতে চাচ্ছে—

—কাল খাবে—

মানুবাবু পরিহাস করলেন,—আপনাদের জন্যেই খাদ্যের স্বল্পতা ঘুচচে না—কিছু মানুষ না মরলে খাদ্যাভাব নিশ্চিত—হওয়াটা বাড়ছে, মরাটা কমছে। এর পরে যে তিল ধারণের স্থান থাকবে না।

হেডমাস্টার বললেন,—ভয় কি, হাইড্রোজেন বোমা আছে—

ওরা রওনা দিলেন। টর্চ্চের আলো ফেলে পথ চলতে আরম্ভ করলেন। ঘোড়ামারা থেকে মাদলের শব্দ আসছিল। পণ্ডিতমশায় বললেন,—বাজছে কোথা?

মানুবাবু বললেন,—কারণ-বারি পান করে নাচ-গান হচ্ছে ঘোড়ামারায়। বাউরী-ধাঙড় সব—

হেডমাস্টার বললেন,—ওরা কিন্তু শিক্ষিত লোকের চেয়ে ভাল। মদটা গোপনে খায় না, প্রকাশ্যে খায় এবং সকলে মিলে খেয়ে নাচে—

ওঁরা চললেন।

ডাক্তার ফিরে যেতেই রমলাদেবী বললেন,—আড্ডা ভাঙলো ?

—হ্যাঁ—

—আজ ত হৈ-চৈ হল না—

—হত,—হাতাহাতিও হ'তে পারতো, তবে সামলাতে হয় ত—

রমলাদেবী বললেন,—এর কোন মানে হয় ?— তিনি মানুবাবুকে ঠাট্টা করেন তাঁর মুদ্রাদোষ নিয়ে।

—আজ কি নিয়ে কথা হল ?

—জাতিভেদ প্রথা—সংস্কার—

রমলাদেবী বললেন,—তোমাদের ঐ পণ্ডিতের কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি। অর্চ্চনাকে চা দিতে হবে রোজ—তার কোন মানে হয় ? বৃথা সংস্কার—

খাবার জায়গা করতে করতে তিনি বললেন,—বড় গোঁড়া তোমাদের ঐ পণ্ডিত—

ডাক্তার বললেন,—সত্যিই, কিন্তু লোকটা আজ ভাবনায় ফেলেছে।

—কেন ?

—সংস্কারটা আমরা খারাপ বলি, কিন্তু সর্ব্বদা ত খারাপ নয়। ডাক্তার পণ্ডিতের যুক্তি অনুসরণ করে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলে অবশেষে উপসংহার রূপে মন্তব্য করলেন,—মানাটাও সংস্কার আর না-মানাটাও সংস্কার, তবে মানার মাঝে পতনের ভয় কম, না-মানার মাঝে পতনের ভয় বেশী। যারা মানবে না, তাদের চরিত্রবল, যুক্তি, বুদ্ধি প্রচুর পরিমাণে থাকা চাই—যেমনটা সাধারণের নেই ; কাজে কাজেই মানাটা ভাল।

—তোমারও মত বিগড়ে গেল।

—যায়নি, তবে ভাবছি কথাটা। একটা দিক ত আছে যুক্তির। বাপের শ্রাদ্ধের মন্তর নিজে পড়বার সাহস ত নেই।

—সেইটাই ত সংস্কার।

—হ্যাঁ তাই ত কথা, সংস্কারমুক্ত কেউ নয়। না-মানার বাতিকটাও সংস্কার বৈ ত নয়—আর ধর, গাওয়া ঘি ত সত্যিই সর্ব্বভারতে মেলে না, কিন্তু একদিন ত খাঁটি দুধ-ঘি মিলত—তাই ভাবছি।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন আলোচনা হয়—আড্ডা-ফেরৎ। আড্ডার ঘটনা নিয়ে দু'জনে উপভোগ করেন। রমলাদেবীর ত কোন সহচরী নেই—জগৎপুরের ডাঙায় তাঁদের মিশবার লোক কই ?

*

সাবি, তরী, কামিনী, নোটন প্রভৃতি ঘোড়ামারার মেয়েরা হাটে যায় জগৎপুরের ডাঙা দিয়ে—হাসপাতালের ভিতর দিয়ে সভয়ে এবং সকৌতুকে আশেপাশে দৃষ্টি রেখে ওরা দেখতে দেখতে যায়, দেখতে দেখতে ফেরে। যা দেখে যায় তা সবিস্তারে সকলকে বলে। হাসপাতালে কোন্ কোন্ রোগী আছে, ডাক্তার কেমন, কি নতুন যন্ত্র বা বস্তু দেখেছে,—এসব এসে গাঁয়ে গল্প করে। সকলে অবাক হ'য়ে শোনে। তারাও হাটে যাবার সময় দেখতে দেখতে যায়—পুরুষ মানুষরা হাসপাতাল কোয়ার্টারের ভিতর দিয়ে যেতে সাহস পায় না—ভদ্রলোকের মেয়েরা আছে, যদি কিছু বলে,---তবে মেয়েরা তথা কামিনরা যায় তাতে আপত্তির হেতু থাকতে পারে না।

সেদিন রবিবার, হাসপাতালের বহির্বিভাগ বন্ধ। সকালে ডাক্তার কোয়ার্টারের বারান্দায় মোড়ায় বসে চা খাচ্ছিলেন। রমলাদেবী দরজার ধারে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিলেন। বাইরের অর্থাৎ আউট-ডোর নেই আজ, ডাক্তারেরও তাড়া নেই। কয়েকটা সামান্য রোগী আছে ইন-ডোরে,—গেলেও হয়, না গেলেও ক্ষতি নেই।

দূরে ভালকুড়ি পাহাড়ের মাথায় সকালের রোদ চিক্‌মিক্ করছে—কার্ত্তিকের প্রথম, একটু শিরশিরে হিমেল হাওয়া বইছে সকালে। রমলাদেবী আঁচলটা জড়িয়ে দিয়েছেন গায়ে, ডাক্তার গেঞ্জিটার উপরে একটা চাদর গায়ে দিয়েছেন। রমলা বললেন,—একদিন চল পাহাড়ে উঠি—

—এই উঠবার সময় হল। একটু শীত পড়লেই যাবো একদিন—

—কেন ?

—সাপগুলো এখনও বাইরে ঘোরাফেরা করে। আর একটু শীত পড়লে ওরা গর্ত্তে ঢুকবে---নইলে অঘ্রাণের আগে কেউ পাহাড়ে ওঠে না। ওরা তাই বলেছে—

সাবি, তরী, কামিনীরা একদল হাটে যাচ্ছিল ;--মাথায় কারও শালপাতা, কারও ধামায় আমলকী বা আমড়া এমনি সব পাহাড়ী ফল। ওরা চারিপাশে দৃষ্টি রেখে এগিয়ে আসছিল—ডাক্তারের বাসার সামনে আসতেই, ওরা ডাক্তারকে বসে থাকতে দেখে একটু যেন ভীত হল। ডাঃ সেন ডাকলেন,—এই,—এদিকে আয়—

ওরা ভয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। ডাক্তার আবার ডাকলেন,—এদিকে আয়—

ওরা মনে করেছে সরকারী হাসপাতাল-কোয়ার্টারের ভিতর দিয়ে যাওয়া বোধহয় অন্যায় হ'য়েছে তাই ডাক্তার বকবেন। ওরা তাই অত্যন্ত মন্থর

গতিতে এসে ডাক্তারের বাসার সামনে দাঁড়ালো। ডাক্তার বললেন,—মাথায় কি ?

তরী বললে,—আমড়া।

সাবি বললে,—আমলকী।

সেন বললেন,—নামা ত দেখি—

বেশী কিছু নেই, আমড়া আর আমলকী। ন্যাকড়ায় বাঁধা কি একটা জিনিষ একপাশে দেখে ডাক্তার বললেন,—এটা কি ?

—ডিম।

—ডিম তোর ?

সাবি হি-হি করে হেসে বললে,—মোর ডিম হবেক কেনে,—মুরগীর ডিম।

ডাক্তার ডিম দেখে দর জিজ্ঞাসা করে জানলেন,—ডিম এক আনা করে, এবং সবগুলি ডিম নিয়ে রমলাদেবীকে বললেন,—ছ'আনা দিয়ে দাও।

রমলা বললেন,—আমড়া আমলকী কিছু রেখে দাও—

—ও কি হবে ?

—আমড়ার চাটনী হবে, আমলকীর মোরব্বা করবো। রাখো না—

সেন বললেন,—কি দর ?

সাবি বললে,—আনায় চার গণ্ডা। আমলকীর দরও তাই।

ডাক্তার বললেন,—দু'আনার দিয়ে যা।

ওরা এক আনার আমলকী ও এক আনার আমড়া নামিয়ে দিল। রমলাদেবী ঘর থেকে পয়সা এনে দিলেন—সাবিকে সাত আনা, তরীকে এক আনা।

ডাক্তার ওদের দেখছিলেন আর মনে মনে অ্যানাটমি করছিলেন—সাবির দেহটাকে দেখে বিস্মিত হলেন—সুঠাম সুন্দর দেহ। তিনি প্রশ্ন করলেন,—তোরা এ-পথেই ত যাস্, যা নিয়ে যাবি হাটে—দেখিয়ে নিয়ে যাবি।

সাবি বললে,—তু ত হাসপাতালকে থাকবি—

ডাক্তার রমলাকে দেখিয়ে বললেন,—ওরা ত থাকবে বাসায়, ওদের কাছে দিবি—ডিম যা হয় সব আমাদের এখানে বিক্রি হ'য়ে যাবে।

তরী বললে,—হ বটে।

ওরা চলে গেল হাটের দিকে, তাদের বোঝা মাথায় নিয়ে। ডাক্তার চা'র পরে একটা সিগারেট ধরিয়ে হাসপাতালের চাকরকে হাটে পাঠালেন। রমলাদেবীর রান্নার তাড়া নেই। বি-এ পাস হলেও রান্নাটা তিনিই করেন।

শরীরটা একান্ত যদি খারাপ না হয়—তবে ঝামেলা নেই। শরীর মাঝে মাঝেই খারাপ তাঁর হয়। তিনিও লাল চটি পায়ে দিয়ে বারান্দায় একটা মোড়ায় এসে বসলেন। ডাক্তার একটু থেমে বললেন,—ডিম ত পাঁচপয়সা-ছ'পয়সা বিক্রি হয়—সস্তাই হল—

—লোক দিয়ে আনলে অমনিই হয়। একপয়সা লভ্য না নিলে আনবে কেন? তা ছাড়া এদিকে কোলিয়ারীতে টান রয়েছে—

—ওদের স্বাস্থ্য দেখলে—মাথায় ত প্রায় একমণ করে নিয়েছে অথচ দিব্যি চলছে। ওই মেয়েটার স্বাস্থ্য দেখলে,—ওই ডিম ছিল যার?

—হ্যাঁ ভালই ত—বনে-বাদাড়ে থাকে, খেটে খায়—হবেই ত—

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর রমলা উঠে গেলেন গৃহকর্ম্মে। ডাক্তার ভাবছিলেন। ডাক্তার কলেজে ভাল ছাত্র ছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল তিনি কলকাতায় কোন হাসপাতালে থেকে গবেষণা করবেন। কিন্তু তা হয়নি। চাকুরী নিয়ে চলে আসতে হ'য়েছে দূরদেশে,—কলকাতায় ভাইকে পড়াতে হয়, বিধবা ভ্রাতৃ-বধূকে সাহায্য করতে হয়। তবে গবেষণার আকাঙ্ক্ষা তাঁর যায়নি—একখানা বাঁধানো খাতায় ডাইরী বইএর মত রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে নোট করেন। মেডিকেল-পত্রিকা পড়ে ওষুধ প্রভৃতির গুণাগুণ, নিজের অভিজ্ঞতা-লব্ধ বিশেষ বিশেষ চিকিৎসা-পদ্ধতি বা লক্ষণ তিনি লিখে রাখেন—যদি ভবিষ্যতে কখনও সুযোগ আসে হাতে, কাজে লাগতে পারে।

রমলা সুন্দরী শিক্ষিতা কিন্তু স্বাস্থ্যবতী নয়। স্ত্রীরোগে তাঁর দেহকে মাঝে মাঝে অকেজো করে দেয়। প্রতিমাসে অত্যন্ত স্রাবহেতু পাঁচ-সাতদিন উঠতে পারেন না—বুকের মাঝে হৃৎযন্ত্রের বেদনা বোধ করেন। ডাক্তার নানারূপ ইনজেকৃশন ও ঔষধ দিয়েও রমলাকে সারাতে পারেন নি—সে জন্যেও পড়াশুনো করেন। ঐ পাঁচ-সাতদিন অনেক সময় অসহনীয় হয়ে ওঠে—হাসপাতাল থেকে এসে রাঁধতেও হয়, না হয় হাসপাতালের লোক ডাকতে হয় রাঁধতে। অফিসার হিসাবে তাদের কাছে ঋণ-করাটা তিনি পচ্ছন্দ করেন না মোটেই। তাদের কাছে কৃতজ্ঞ হ'য়ে থাকলে কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হয়ে হয়ত ন্যায়বিচার করতে পারবেন না এমন একটা ভয়ও তাঁর আছে।

সাবির দেহটাকে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন,—সুঠাম, ঋজু—আঙ্গিক অনুপাতের সাম্য সব মিলে সাবি দর্শনীয়। তাঁর মনে প্রশ্ন এসেছিল,—এদের এমন দেহ এমন স্বাস্থ্য হয় কি করে? এরা কি খায়? এদের জীবনযাত্রা-প্রণালী কি রকম, এই নিয়ে একটা কৌতুহল দেখা দিল। তাঁর মাঝে সৃষ্টির

প্রেরণা ছিল তাই বীক্ষণশক্তির প্রাচুর্য্যও ছিল। সাধারণে যা দেখে না, তিনি তাই দেখতে পান।

ঘর থেকে একখানা মেডিকেল জার্নাল এনে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ তাঁর মনে হল—এমন স্বাস্থ্য ও এমন একটা দৈহিক সৌষ্ঠব ত সভ্যজগতের মেয়েদের মাঝে তিনি দেখেননি। কেন এমন হয়? তিনি তাঁর নোট-খাতাটা এনে লিখলেন,—এর কারণটা অনুসন্ধান করতে হবে। তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক ডাক্তারী প্রশ্নও লিখে রাখলেন, কোন্ কোন্ বিষয়ে অনুসন্ধান বা গবেষণা করতে হবে।

ঘরের মাঝে বসে লিখছিলেন, হঠাৎ বাইরে থেকে কে যেন তাঁকে ডাকলো। কাঁকুড়গাছিতে রোগী দেখবার ডাক,—তিনি পথের হদিস নিয়ে তাকে বললেন,—যাও, আমি একঘণ্টার মধ্যেই যাচ্ছি—

মানুবাবু পত্র দিয়েছেন একটা 'কেসে' যেতে। না-যাওয়াটা ভাল দেখায় না। রবিবার—অজুহাতও কিছু নেই না-যাওয়ার। ডাক্তার বেরিয়ে পড়লেন সাইকেল আর তাঁর বাক্স নিয়ে।

*

অর্চ্চনা পড়ছিল ঘরে বসে -রমলা কুটনো কুটতে কুটতেই পড়াচ্ছিলেন তাকে। অর্চ্চনা কাঁকুড়গাছি বেসিক ইস্কুলে পড়তে যায়, সেটা একপোয়া রাস্তা হবে।

বারান্দায় রোদ এসে পড়েছিল, বেলার সঙ্গে সঙ্গে রোদটা সরে বারান্দার কোণে এসে পড়েছে। রমলা বারান্দায় বসেই কুটনো কুটছিলেন—আমলকী-গুলোকে তৈরা করে রোদে দিতে হবে মোরব্বার জন্যে—

সাবি আর তরী বাইরে থেকে ডাকলো,—মা কোথা গো—উ ডাক্তার-মা—

রমলা বঁটি কাৎ করে রেখে বাইরে এসে বললেন,—কি রে? কি হয়েছে—

সাবি বললে,—হবেক কি? এই লে দু'গণ্ডা আমড়া—

তরী বললে,—লে দু'গণ্ডা আমলকী লে—

—না না, আর দরকার নেই,—অত নিয়ে কি হবে!

রমলার সংসার ছোট, শুধু শুধু আবার পয়সা খরচ করে কি হবে, তাই তিনি 'না'-ই বললেন।

—লিবেক নাই কেনে মা?

রমলা তাড়াতাড়ি বললেন,—দরকার [illegible] কেন?

সাবি বললে,—হ, লিবেক নাই কেনে? হাট্‌কে আনায় ছ'গণ্ডা দর দিলেক, তু মা দু'গণ্ডা ত পাবেকই বটে! তা লিবেক নাই কেনে?

রমলা বললেন,—হাটে আনায় ছ'গণ্ডা দর গেছে? তাই দু'গণ্ডা দিচ্ছিস্?

—হ্যাঁ বটেক।

—আমরা ত চার গণ্ডা দরেই নিয়েছি—ওই দরেই ত পয়সা দিয়েছি,—তা আবার দিবি কেন? তরা বললে,—হ, ধরম নাই? হাট্‌কে ছ'গণ্ডা দিলেক আর তুকে চার গণ্ডা দিবেক!

রমলা একটু ভেবে প্রশ্ন করলেন,—ডিম কত করে হাটে?

সাবি চুপড়িটা মাথায় তুলে নিয়ে বললে,—উঃ দেখি লাই। ডিম ত তুরা সব লিলি।

—কি কিনলি হাটে—

—উ সব বেসাত বটে—

—কি বেসাত—

—পেঁয়াজ, লঙ্কা, নুন ই সব রইছে—

ওরা মাথায় চুপড়ি তুলে নিয়ে বটগাছ পেরিয়ে ঘোড়ামারার পথ ধরলো। রমলা অবাক হ'য়ে গিয়েছিলেন, হাটে ছ'গণ্ডা বিক্রি হ'য়েছে বলে বাকী দু'গণ্ডা বাড়ী বয়ে দিয়ে যায়, আজকার যুগে এমন ঘটনা যেন বিশ্বাসই করা চলে না। রমলা তাই অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের যাওয়া দেখছিলেন।

ডাক্তার এসে সাইকেল থেকে নেমে, রমলার পায়ের কাছে আমড়া আর আমলকী দেখে বললেন,—আবার এগুলো কিনলে কেন?

—কিনিনি।—রমলা ঘটনাটা বর্ণনা করে বললেন,—আশ্চর্য্য নয় কি? আজকাল, এবং বিংশ শতাব্দীতে 'ধরম' রক্ষার জন্যে এমন কাণ্ড ত শুনিনি,—ওরা ত একেবারেই বোকা আছে—

ডাক্তার বললেন,—সততার নামান্তর বোকামী।—সাইকেল তুলতে তুলতে বললেন,—এটা ত অবাক ব্যাপারই বটে। এ নিয়ে একটু গবেষণা করা চলবে,—আপাততঃ চা কর একটু, এক্ষুনি হাসপাতালে যাবো—

—কেন? রবিবারে—

—জরুরী লেবার-কেস,—দেখতে গিয়ে বুঝলাম জটিল অবস্থা তাই হাসপাতালে নিয়ে আসতে বললাম। হয়ত কাটাকুটি করতে হবে।

—আবার কাটাকুটি! তাহলে ত খেতে বেলা দু'টো—

—হ্যাঁ, ঐরকমই হবে। প্রথম পোয়াতী—হয় প্রসূতি না-হয় সন্তান একটিকে ত্যাগ করতে হবে—শর্ট পেলভিস্—ছেলে বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ—

রমলা বললেন,—তবে কিছু খেয়ে নাও।

তিনি চা তৈরী করতে চলে গেলেন।

*

আজও জ্যোছনায় ভেসে গেছে ভালকুড়ি আর ঘোড়ামারা।

হাসপাতালের সামনে আড্ডা বসেছে,—পণ্ডিত, হেডমাস্টার, মানু মিত্তির এসেছেন। ডাক্তারও এসেছেন। তবে তিনি আজ নির্ব্বাক,—সারা দুপুর অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রসূতির ছেলেটাকে কেটে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করতে হ'য়েছে—প্রসূতি কোনক্রমে রক্ষা পেয়েছে এই পর্য্যন্ত। এখনও পর্য্যন্ত বিপদ কাটেনি—

ডাক্তার মধুকে দিয়ে একখানা ইজিচেয়ার আনিয়ে শুয়ে পড়ে বললেন,—বড্ড ক্লান্ত আজ আমি,—কিন্তু আপনাদের মুখ বন্ধ কেন?

হেডমাস্টার বললেন,—দু'পুরে তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে ততোধিক ক্লান্ত আমরা—

মানুবাবু বললেন,—সাংঘাতিক পরিশ্রম হয়েছে, ডাক্তারবাবু, ইজিচেয়ারটা ওঁকেই দিন—

কিন্তু এই প্রাথমিক রসিকতার পর আড্ডা ঠাণ্ডা হ'য়েই রইল, কেউ কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন না। হেডমাস্টার বিড়ি ধরিয়ে নিঃশেষ করলেন, মানুবাবুও একটা বিড়ি ধরিয়ে শেষ করলেন, পণ্ডিত মহাশয়ের একটিপ নস্য নাসারন্ধ্রে ঢুকল—তথাপি সকলে নির্ব্বাক।

ডাক্তার বললেন,—ঠাণ্ডা একটু পড়েছে বটে, কিন্তু সভাস্থল ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে এত ঠাণ্ডা ত পড়েনি—

মানুবাবু বললেন,—হ্যাঁ পণ্ডিতমশায়, একটা সংস্কৃত গৎ-টৎ ঝাড়ুন। গীতা—চণ্ডী—

পণ্ডিতমশায় টিপ্পনী করলেন,—মহিষাসুর এলেই মহামায়া বধ করবেন, ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি···

—এই ত, এই ত, কই সালাজারকে ত গোয়া থেকে মহামায়া তাড়াতে পারলেন না। মহামায়া কি আছেন?

—আছেন বৈকি,—মহামায়া মানে বিশ্বস্য বীজং অর্থাৎ আদ্যাশক্তি। স্বভাব থেকেই, প্রকৃতির বিধানে অসুর বিনাশ হবে। হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কার করেই অসুর-বধ হবে আপনা থেকে।

হেডমাস্টার বললেন,—প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, বিশ্বপ্রকৃতিই মহামায়া,—মহিষাসুর যখন আসুরিক শক্তিতে উন্মাদ হ'ল তখন মহামায়া বধ করলেন, অর্থাৎ প্রকৃতির বিধানে তার নিধন হ'ল। তেমনি আসুরিক শক্তির বলে যারা হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কার করে মহিষাসুর বা রক্তবীজ হয়েছে তারা প্রকৃতির বিধানেই নিহত হবে—অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতিই হয়ে যাবে রেডিও-অ্যাক্টিভ, এবং তারা মরবে। এইটাই মহামায়ার কাণ্ড। অর্থাৎ মহামায়ার অসুর-বধ—

মানুবাবু বললেন,—এটা ৺চণ্ডীর একটা আধুনিক ব্যাখ্যা বটে। যেমন পুষ্পক-রথই এরোপ্লেন—

পণ্ডিতমশায় নস্যের হাতটা ঝেড়ে ফেলে বললেন,—অত্যাধুনিক,—'দ্বিতীয়া কা মমাপরা' অর্থাৎ তিনি ছাড়া আর কে আছে,—সবই তিনি। যে প্রকৃতির বিধান মানবে না, সে মরবে—

ডাক্তার বললেন,—এটা কিন্তু সত্যি, মানুবাবু। প্রকৃতির প্রতিশোধ। আজ একটা ঘটনা ঘটেছে— ডাক্তার সকালে সাবিদের আমলকী একগণ্ডা দিয়ে যাবার ঘটনা বর্ণনা করে বললেন,—একটি জিনিষ এর মধ্যে লক্ষ্য করবার আছে। প্রথমতঃ, ওই মেয়েগুলোর স্বাস্থ্য দেখবার মত—মণটাক বোঝা মাথায় করে অবলীলাক্রমে চলে যাচ্ছে,—দেহে যেন স্বাস্থ্য ফেটে পড়ছে, এমন নিখুঁত দেহের গঠন সভ্যজগতে নেই-ই। চামড়া ফরসা হয়ত আছে, কিন্তু এমন মজবুত সুন্দর দেহ নেই। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষিত সমাজে এমনি সততা কেউ আশাই করতে পারে না। হাটের দরে একগণ্ডা পাওনা হওয়ায় বাড়ী বয়ে দিয়ে যাওয়া—

হেডমাস্টার বললেন,—হ্যাঁ, ওই ভালকুড়ির ওপারের মেয়েগুলো ত? একদিন বৃষ্টি ভিজে অমনি কুঁচিকাঠি দিতে এসেছিল বাসায়। আমি বললুম, বৃষ্টি ভিজে এসেছিস কেন? সে বললে, কথা দিয়েছি যে। কথা দিয়েছে তাই রক্ষা করতে বৃষ্টি ভিজে দু'মাইল পথ এসেছে দু'আনার কাঠি দিতে।

মণ্টুবাবু বললেন,—কিন্তু তারা জংলী হলেও আমাদের চেয়ে সৎ। 'ধর্ম্ম-রক্ষার্থে তারা অর্থাৎ মহামায়ার পূজারী বলেই—হয়ত—

মানুবাবু ধৈর্য্য হারিয়ে বললেন,—ওই ত ওরা 'ধরম'-এর সংস্কার মেনে বোকার মত দু'গণ্ডা লোকসান করলো, আর আপনি তার সুযোগ নিয়ে সেটা বিনিপয়সায় নিলেন—এর কোন মানে হয়?

পণ্ডিতমশায় সুযোগ পেয়ে বললেন,—অর্থাৎ সংস্কার মানে বলেই তারা ওই সততা রক্ষা করেছে, আর আপনি শিক্ষিত হ'য়ে তা মানেন না বলেই তাদের সততাকে বোকামী বলছেন—

ডাক্তার হো-হো করে হেসে উঠে বললেন,—এই ত পণ্ডিতমশায় ঠিক ঝোপ বুঝে কোপ দিয়েছেন—মানুবাবু, এর উত্তর নেই। সংস্কারটাই ওদের সৎ করেছে,—সংস্কার না মেনে চলতে যে বুদ্ধি ও সংযম চাই তা নেই বলেই আপনি ঠকে যাচ্ছেন—

—ঠকলাম কোথায়?— মানুবাবু অসহায়ের মত বললেন। হেডমাস্টার কথাটার খেই নিয়ে বললেন,—ওই স্বাস্থ্যটি ত আর যুক্তির ব্যাপার নয়, সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু—ওটা কি ক'রে হল? যতদূর জানি—গরুর দুধ, মুরগীর ডিম সব ওরা বিক্রি করে, আর আমরা সেগুলো কিনে খাই—অথচ স্বাস্থ্যটা ওদের, আর আমরা খেয়ে দেয়ে স্বাস্থ্য হারিয়েছি। হেঁটে ঘোড়ামারা যেতে হ'লে বসতে হয় দু'বার।

—চাষীভুষোরা ত হাঁটবেই, অভ্যাস রয়েছে তাদের—খেটে খায়—

ডাক্তার বললেন,—অর্থাৎ আমরা বসে খাই,—প্রকৃতি তথা মহামায়ার বিধান মানি না তাই আমরা স্বাস্থ্যহীন। অথচ ওরা খেতে পায় না—ভিটামিন এ-বি-সি-ডি'র বালাই নেই ওদের—তাই ওরা স্বাস্থ্য বলে বলীয়ান্? এই ত বলছেন মানুবাবু?

মানুবাবু হঠাৎ চুপ করে গেলেন। বললেন,—এমনি যুক্তির সঙ্গে পারা মুস্কিল তা হলে। এই সভ্য জগতটাই মিথ্যে—জ্ঞান-বিজ্ঞান সব মিথ্যে—ওই অসভ্য মেয়েগুলোই সত্যি, ওরাই সব—

হেডমাস্টার বললেন,—আহা-হা, রাগ করছেন কেন, মানুবাবু। গবেষণা-মূলক যুক্তি দেখানো হচ্ছে এসব—খাই আমরা, স্বাস্থ্যটা হ'ল ওদের; শিক্ষা-দীক্ষা সব আমাদের আর সততাটা ওদের—এগুলো যে একেবারে গরমিল ব্যাপার হচ্ছে, তার একটা মীমাংসা চাই ত?

ডাক্তার বললেন,—এটা তর্কের ব্যাপার নয়, গবেষণার ব্যাপার। আমি না হয় ডাক্তার—স্বাস্থ্য নিয়ে গবেষণা চালাবো, হেডমাস্টারমশায় না হয় শিক্ষাহীন সততার বিষয় করবেন, পণ্ডিতমশায় সংস্কার নিয়ে না হয় স্মৃতির ব্যবস্থা দেখবেন। এখন আপনি!

হেডমাস্টার বললেন,—কেন মানুবাবু ওদের সতীত্ববোধ সম্বন্ধে করবেন গবেষণা—

—তার মানে ?—মানুবাবু রেগে গেলেন, তাঁর চরিত্রের প্রতি এটা কটাক্ষ। বললেন,—আমি বুঝি ওই কুলি-কামিন নিয়ে থাকি ?

পণ্ডিতমশায় বললেন,—ছিঃ ছিঃ, এটা কি বলছেন ! ডাক্তার বা আমরা বিদেশী লোক ওই জটিল বিষয়টা নিয়ে গবেষণা করতে গেলে প্রহারেণ ধনঞ্জয়—

সকলে হো-হো করে হেসে ব্যাপারটাকে হালকা করে দিলেন। মানুবাবুও হাসলেন দেখাদেখি—পৈতৃক জমিদারী এখনও আছে তাই বললেন,—হ্যাঁ, ওদের আবার সতীত্ব—ওসব বালাই নেই। এক বোতল মদ আর মাংস দিন খেতে, সততার বালাই থাকবে না—

হেডমাস্টার বললেন,—চলুন, রাত হ'ল—একটু যেন কুয়াশা হ'য়েছে—

ডাক্তার বললেন,—বসুন বসুন, রাত হয়নি—এই ত সাতটা। প্রশ্নটার সমাধান হোক,—শিক্ষাটা আমাদের কাজে লাগছে না কেন ?

পণ্ডিতমশায় বললেন,—এটা বুঝতে হ'লে একটা গল্প শুনুন। এক ব্রাহ্মণের কন্যা অল্পবয়সে বিধবা হ'ল। বালবিধবা মেয়েটিকে নিয়ে ব্রাহ্মণ বিব্রত। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র পড়াতে আরম্ভ করলেন,—ধর্ম্মভাবের উদয় হ'লে জীবনের ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে ব্যাকুল হবে না। কয়েক বৎসর পড়িয়ে প্রায় সব শেষ করলেন। একদিন প্রশ্ন করলেন,—মা, তুমি ত শাস্ত্র সবই পড়লে, কি বুঝলে বল ত মা ? মেয়ে বললেন,—দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ছিলেন অথচ সতী হিসাবে তার নাম প্রাতঃস্মরণীয়। পঞ্চস্বামী থাকলেও ত মেয়েরা সতী হয়।—

সকলে হো-হো করে হেসে উঠলেন।

পণ্ডিতমশায় বললেন,—শিক্ষার দোষ নেই, পাত্রের দোষ হ'য়েছে। পূর্ব্বে গুরুগৃহে তাই প্রথম সংযম, পরে শিক্ষা ছিল—নিজের দরকার মত আমরা সেটার ব্যাখ্যা করে নি', সামগ্রিকভাবে দেখি না—

ডাক্তার বললেন,—অর্থাৎ ?

হেডমাস্টার বললেন,—যেমন গয়লারা বলে, দুধে জল না দিলে গরু মরে যায়—এটা তাদের শাস্তর,—অর্থাৎ রাত্রি হ'ল, কাল এ সম্বন্ধে গবেষণা করা যাবে···

পণ্ডিতমশায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—অর্থাৎ শিক্ষা আছে অথচ সংস্কার নেই—

মানুবাবু খিঁচিয়ে উঠে বললেন,—সংস্কার ! সংস্কার ! পণ্ডিতকে একদিন মুরগীর ঝোল জোর করে খাইয়ে দেব।

ডাক্তার বললেন,—ভাই, আমাকে নেমন্তন্ন করতে ভুলবেন না--

সভা ভঙ্গ হ'ল। ওরা চলে গেলেন কাঁকুড়গাছির দিকে। ডাক্তার ইজি-চেয়ারে বসে ভাবতে লাগলেন, সাবির কথা। ওরা এমন দেহ পেল কোথায়? কি খায়? ভিটামিন থিওরীটাই কি ভুল?

ভালকুড়ির নীচে খ্যাঁকশিয়াল খ্যাঁক খ্যাঁক করে ডাকছে—দূর গ্রাম থেকে মাদলের শব্দ ভেসে আসছে। আকাশে সুন্দর চাঁদ—চাঁদের আলোয় বন-প্রান্তর উদ্ভাসিত হ'য়ে গেছে—স্বপ্নাচ্ছন্নের মত তারা নীরব। পিছনে হাসপাতালে লণ্ঠন জ্বলছে রোগীর ঘরে। চারিপাশে যেন একটু একটু কুয়াশা জীবনের জটিলতার মত পরিব্যাপ্ত হয়ে দূরকে অস্বচ্ছ করে রেখেছে। ডাক্তার তাকালেন,—কালো একটা স্তূপের মত দাঁড়িয়ে আছে ভালকুড়ি—তার পিছনে কালো বনশ্রেণীর রেখা।...

একটা প্রাণীকে আজ কেটে কেটে বের করছেন তিনি,—হয়ত বা জীবিত ছিল। যদি জীবিত থাকে তবে নরহত্যা করেছেন তিনি,—একটা প্রাণ-রক্ষার্থে অন্য একটা প্রাণকে নষ্ট করেছেন। কোন্‌টা বড় প্রাণ ছিল তা কে জানে? ওই গর্ভস্থ শিশু যে মহাত্মার মত হত না তাই বা কে বলতে পারে! মনটা তাঁর বিষণ্ণ হ'য়ে ওঠে। ভগবান তাঁরই হাতে এই কর্ত্তব্য কেন এনে দিলেন? তাঁর কি অপরাধ হয়নি?

ডাকলেন,—বাসন্তীদেবী!

—বলুন— বারান্দা থেকে উত্তর দিলেন নার্স বাসন্তীদেবী।

—ঐ অপারেশন কেস্‌টা কেমন?

—ভাল,—কোন গোলমাল নেই—

—জ্ঞান হয়েছে?

—হ্যাঁ—

—কিছু বললে?

—না।

—ওষুধটা ঠিক-ঠিক খাওয়াবেন। খেতে দেবেন না কিছু, বমি হতে পারে।

—জল খেতে চাইছেন—

—গ্লুকোজ দিন—

ডাক্তার আশ্চর্য্য হলেন,—এই নরহত্যার জন্যে মেয়েটার বাবা, তার স্বামী কত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। টাকা দিতে চেয়েছেন তাঁকে খুশী করে,

কিন্তু হাসপাতালের কেসে তিনি তা নেননি। তিনি নিজেই নিজেকে তিরস্কার করলেন,—এমন নরম মন নিয়ে এ ব্যবসায় আসা ঠিক হয়নি তাঁর।

*

তবুও মনটা তাঁর ভাল নেই। রমলা জিজ্ঞাসা করলেন,—ওরকম দেখাচ্ছে কেন? শরীর ভাল নেই?

—শরীর খারাপ হয়নি,—তবে পরিশ্রম হ'য়েছে ত—

—না, অবেলায় খেয়ে শরীর খারাপ হ'ল। রাত্রে কি খাবে?

—রাত্রে আর কিছু খাবো না, একটু দুধ গরম করে দাও।

রমলা দুধ গরম করে আনলেন, ডাক্তার সেটা একচুমুকে খেয়ে ইজিচেয়ারে বসে সিগারেট ধরালেন। মনটা বিক্ষিপ্ত ছিল, রমলার চোখ এড়ায়নি। তিনি বললেন,—আড্ডায় কোন গোলমাল হ'য়েছে?

—না।

—তবে অমনি চুপচাপ করে আছ কেন? কি হ'য়েছে?

—ভাবছি। জীবহত্যা করলাম হয়ত,—

—রক্ষা করেছ, বল। মা'টিকে ত বাঁচিয়েছ, সেইটে ভাবো না কেন?

—সেটা ঠিক মনে হচ্ছে না—শিকারও করি, মনে কষ্ট হয় না ত। সেও জীবহত্যা, কিন্তু ঠিক যে ভাবে করতে হয় সেটা সত্যিই·· ভাবছি এই ব্যবসাটা ঠিক যেন আমার জন্যে নয়—

—অত নরম মন হ'লে সার্জ্জারী করবে কি করে? ডাক্তারই বা হ'লে কেন?

—সার্জ্জারী ত করি, নম্বরও অনেক পেয়েছিলাম—কিন্তু তুমি ত জানো না, শিশুটির ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটো করে মাথাটাকে ঘেঁটে দিয়ে ছোট করে ফেলতে হয়—অথচ সে শিশু মায়ের উদরে, চীৎকার করবারও উপায় নেই,—তাই মনটা ভাল নেই—নীরব চীৎকার হয়ত করেছে—

ডাক্তার ভাবছিলেন,—কর্ত্তব্যের জন্যে তিনি করেছেন সবই, প্রসূতি বেঁচে উঠেছে তাতে প্রশংসাবাদও পেয়েছেন, তখন সফলতার আনন্দও এসেছিল—কিন্তু এখন সেই অসহায় শিশুর কথাটা মনে করে মনটা ঝিমিয়ে পড়ছে। ডাক্তার বার বার ঘুরে ফিরে যেন সেই অপরিচিত অসহায় শিশুর মন্ত্রে মুগ্ধ হ'য়ে ভাবছিলেন তার কথা।

রমলা তাঁকে বিমনা করতে প্রশ্ন করলেন,—তোমাদের আড্ডার কি হ'ল?

—ঐ জংলী মেয়েগুলোর অমন স্বাস্থ্য কি করে হয়, ওরা অমন সৎ-ই বা হয় কি করে?

ডাক্তার বৈকালিক আড্ডার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করে প্রশ্ন করলেন,—ওরা একবেলার বেশী খেতে পায় না, খায়ও শাকপাতা আর ভাত, অথচ অমন স্বাস্থ্য হয় কি করে? আমরা দুধ মাখন ডিম খাই অথচ রোগ-বালাই সব আমাদের···

—আরও আশ্চর্য্য, ওরা ত হাসপাতালে ওষুধ নিতে আসে না। কোন রোগীই ওদিক থেকে আসে না।

রমলা বললেন,—আসবে কেন? ঝাড়ফুঁক করে, শিকড়-বাকড় খায়—ওদের ওতেই বিশ্বাস।

—শুধু বিশ্বাস নয়, সারেও। মৃত্যুর হার দেখছিলাম সেদিন,—তাও ত কম। শিশুমৃত্যুও কম—হাসপাতালেই ত রেকর্ড আছে। পণ্ডিতমশায় বললেন একটা কথা—মহামায়া অর্থাৎ প্রকৃতির বিধান যে মানবে না, তাকেই ভুগতে হবে। আমরা সভ্য হয়ে প্রকৃতির থেকে সরে এসেছি তাতেই কি আমাদের রোগ ভোগ বেড়েছে? ওদের ত রোগ তেমন নেই, স্বাস্থ্যও চমৎকার—

রমলা বললেন,—রোজ না খাটলে পেট চলে না, তার চিকিৎসার সময় কোথা? তুমি শুয়ে পড়—

ডাক্তার শোবার জন্যে ঘরে এলেন, ডাইরী বইটা খুলে লিখলেন,—ওদের স্বাস্থ্য এমন হয় কেন? ভিটামিন থিওরী কি ভুল? প্রকৃতির প্রতিশোধেই কি শহরে সভ্যজগতে রোগ এত বেশী?—এ প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। ইত্যাদি—

তিনি মনে মনে একটা গবেষণা পদ্ধতি ঠিক করে শুয়ে পড়লেন। মনে মনে তিনি সাবির স্বাস্থ্যবান দেহখানাকে ডিসেক্ট করে যেন দেখছিলেন, ওর মাঝে কি আছে? এই শক্তি ও লাবণ্য ও কোথা থেকে পেল? চামড়াটা কেটে তুলে ফেললে মাংস ও পেশীর রূপ কেমন হবে? হৃৎযন্ত্রের ভিতরের দুটি ঘর হয়ত বা প্রশস্ততর, রক্তটা হয়ত বা গভীর লাল। মাইক্রোস্কোপে দেখলে দেখা যাবে শ্বেতকণিকার সংখ্যা বেশী এবং তারাও শক্তিমান। তাই রোগব্যাধি ওদের কম,—শরীরে রক্ত চলাচলের বেগ হয়ত বেশী।

ডাক্তার ঘুমিয়ে পড়লেন,—রমলা অদূরে অর্চ্চনাকে নিয়ে শুয়ে আছেন। হাসপাতালে সন্তানহারা মা তখনও থেকে থেকে কাতরোক্তি করছে। গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে সামান্য কাতরোক্তি যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চার দেয়ালে। মনে হয় যেন ঘরের আশেপাশে কে কাতর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে

কয়েকদিন পরে রবীন ডাক্তারের সংসারে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল—

একটা ঝি এবেলা ওবেলা এসে জল তুলে বাসন মেজে দিয়ে যেত, কাপড়-জামা ধুয়ে দিয়ে যেত। হাসপাতালের মাঝে একটা মাত্র ইঁদারা, তাতে পাম্প ফিট করা। সেই জলেই সব করতে হত—জল তুলে বাড়ীতে এনে বাসন মাজতে হত। কিন্তু ঝি আজ আসেনি, এঁটো বাসন বারান্দায় বের করে রেখে রমলা ভাবছিলেন, ডাক্তারও চিন্তিত হ'য়েছিলেন। রমলা কোনদিন বাসন মাজেননি। ডাক্তারই বা কি করবেন ? হাসপাতালের চাকরের সাহায্য বেলা এগারটার আগে পাওয়ার উপায় নেই।

ডাক্তার বললেন,—জল তুলিয়ে দিলে, বাসন ক'টা ধুতে পারবে না—

রমলা চোখটা তুলে তাকালেন—ডাক্তার সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়লেন। রমলাকে ঠিক এমনি অনুরোধ করা চলে না। বললেন,—অভ্যাস নেই, কোন কালে করনি জানি—কিন্তু বড়ই বিপদে ফেলেছে হতচ্ছাড়ী—

এঁটো বাসন ক'খানা সামনে করে দাঁড়িয়ে ডাক্তার-দম্পতি খুবই বিপন্নমুখে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়েছিলেন,—খুবই অসহায় মনে হচ্ছিল তাঁদের। ডাক্তার বলছিলেন,—আমরাই ওদের উপর নির্ভর করে বিপন্ন হ'য়েছি—পরাধীন—কিন্তু ওরা স্বাধীন—

রমলা রুষ্টস্বরে বললেন,—তোমার ফিলজফি রাখো এখন—

বাইরে থেকে কে যেন হাঁকলো,—ডাক্তার-মা—

রমলা তাকিয়ে দেখলেন—সাবি বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ; বললেন,—এদিকে আয়—

সাবি বাড়ীটা ঘুরে পিছনের দরজা দিয়ে এসে বললে,—ডিম লেবেক মা ?

ডাক্তার বললে,—নেব, কি দাম—

—উই দাম ত রইছে, এক আনা দিবেক—

—ক'টা আছে ?

—এক গণ্ডা আছে বটে।

রমলা বললেন,—রাখ্।

তিনি ঘরে গিয়ে চার আনার পয়সা এনে সাবিকে দিলেন। সাবি পয়সা গুনে নিতে নিতে থেমে গিয়ে হঠাৎ বললে,—এঁটো বাসন রইছে কেনে ? তুর কি হ'ল বটে ?

রমলা বললেন,—ঝি আসেনি, কে মাজবে ?

—তু পারবি না ? হ—তু লিখাপড়া জানছিস্, বাসন মাজতে জানছিস্ না ? দে কেনে ও মাজা করবেক—

ডাক্তার পরিত্রাতা সাবির দিকে চেয়ে বললেন,—মেজে দিবি বাসন ক'টা ?

—দেবেক নাই কেনে ? কোথাকে মাজবে বল কেনে ?

রমলা বুঝিয়ে দিলেন। সাবি জল এনে বাসন মেজে দিল ; ঘর ঝাঁড় দিয়ে, কয়লা ভেঙে, কাপড় ধুয়ে দিল। ডাক্তার-গিন্নী চা-মুড়ি তাকে দিয়ে বললেন, —খেয়ে নে—

সাবি বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে চা-মুড়ি খেয়ে বাসন ধুয়ে উপুড় করে রাখলো। রমলা বললেন,—নে, এই দু'আনা নিয়ে যা—

—কেনে, দু'আনা দেবেক কেনে ?

—বা, এত কাজ করলি।

—ওয়ার জন্যে পয়সা দিবেক কেনে ? চা-মুড়ি খেলেক ত—

—ডাক্তার হাসপাতাল গিয়েছিলেন, হঠাৎ ফিরে এসে সাবিকে প্রশ্ন করলেন, —তোর নাম কি ?

—সাবি বাউরী—

—তোর বাড়ী কোথা ?

—উই ত হোথা, ঘোড়ামারা গাঁকে—ভালকুড়ির বগলে—

—তুই কাজ করবি, সকাল-বিকাল এই কাজ—

—করবেক নাই কেনে ? মোরা ত বাউরী বটে। মোদের জল তুরা খাবি কেনে ?

—সে খাবো,—আমাদের জাত নেই।

—উ পারবেক নাই। তুরা বামুন-ভদ্দর বটি, তুদের জাত মারবেক নাই। মোদের জল খাবি কেনে ?

ডাক্তার মনে মনে সাবির এই সংস্কার দেখে ক্ষুব্ধ হলেন ; বললেন,—খাবো। খাওয়ার জলের না হয় অন্য ব্যবস্থা আছে। তুই কাজ করবি ?

—হ্যাঁ, করবেক নাই কেনে ?

—কত মাইনে চাস্ ?

—পাঁচ টাকা মাসকে, পূজায় রঙীন শাড়ী দিবি, চা-মুড়ি দিবি—

—আচ্ছা, তাই পাবি। বিকাল থেকে কাজ করবি—

—হ আসবেক্। বর্ষাকে চাষ-আবাদ, উ সময়কে ভোরে আস্বেক বটে আর সাঁজকে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই আসবি।

ডাক্তার পরিত্রাণ পেলেন, যা হোক একটা ব্যবস্থা হ'য়েছে। এই ডাঙায় লোক পাওয়া যাবে কোথা থেকে—হয় কাঁকুড়গাছি, না হয় ঘোড়ামারা থেকেই লোক চাই। এতদূরে কেউ আসতে চায় না, একবেলার আসা-যাওয়ায়ই ত প্রায় দুই মাইল হাঁটতে হয়।

সাবি চলে যাচ্ছিল, রমলা বললেন,—কোথায় যাবি?

—উঃ কাঁকুড়গাছি বাজারকে—

—হুঁ, এই পথেই যাবি ত—

—হাঁ—দেখা করে যাবেক। দোকানকে কিছু দিবি সদা করতে—

—না।

সাবি চলে গেল। ডাক্তার বললেন,—যাহোক একটা গতি হ'ল। মেয়েটা সৎ-ও আছে মনে হয়—সে ঝিটা ত চুরি ক'রত। কোলিয়ারীর লোক ত? ভয়ে কিছু বলিনি, যদি ছেড়ে দেয়—তবে এরা তেমন নয়—সেদিন এরাই ত আমলকী আর আমড়া দিয়ে গেল।

—হ্যাঁ ওরাই, ওই মেয়েটাই ডিম এনেছিল—

ডাক্তার সাবিকে চিনেছেন।

সাবির চাকরী হ'ল ডাক্তারের বাসায়। রমলা তার চটপটে কাজে খুশী হ'য়েছেন, কাজও পরিচ্ছন্ন। এখন কতদিন থাকবে, সেইটেই কথা। ডাক্তার ভাবলেন, সাবির সঙ্গে পরিচয়ে তাঁর সমস্যার সমাধান হয়ত পাবেন,—অন্ততঃ রহস্যের একটা সূত্র নিশ্চয়ই পাবেন তিনি। শক্তি ও স্বাস্থ্যের মূলে কি রহস্য আছে এইটাই তাঁর ডাক্তারী প্রশ্ন।

বিকালের দিকে ডাক্তারের মনটা খুশী ছিল। হঠাৎ একটা ডাক আসল দূর গ্রাম থেকে,—রোগী হঠাৎ বমি করে অজ্ঞানের মত হ'য়ে পড়েছে। এক্ষুনি যেতে হবে। ডাক্তার প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে অনুমান করলেন, ব্লাড-প্রেসার তথা রক্তের চাপজনিত রোগ—তাই যন্ত্রটা নিয়ে, আনুষঙ্গিক ওষুধপত্র নিয়ে রওনা দিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে যথারীতি হেডমাস্টার, পণ্ডিত প্রভৃতি সকলে এসে পড়লেন, ডাক্তার না থাকায় তাঁরা একটু বিব্রত বোধ করছিলেন। মধু তাঁদের বসতে দিয়ে বললে,—বসুন, ডাক্তারবাবু এখুনি আসবেন, যখন আলো নিয়ে

হেডমাস্টার বললেন,—না, গৃহস্বামী যখন নেই তখন অতিথি হওয়াটা ঠিক নয়—

নার্স বাসন্তীদেবী এসে বললেন,—মাস্টারমশায়, ডাক্তারবাবু আজ নেই বলে আপনারা যদি ফিরে যান, তবে ডাক্তারবাবু এসে কি ভাববেন? —আমরা আপনাদের বসতে বলিনি, এ বদনামটা আমাদের দেবেন?

মানুবাবু বললেন,—না, নিশ্চয়ই না, আজ বাসন্তীদেবীই আমাদের হোস্টেস। এই বসলুম, ডাক্তার না আসলে নড়ছি না। কেমন বাসন্তীদেবী—

মণ্টুবাবু টিপ্পনী করলেন,—মানু আজ নট-নড়ন-চড়ন।

—হ্যাঁ বসুন, আমি চা'র ব্যবস্থা করছি—

পণ্ডিতমশায় বললেন—না না, চা'র দরকার কি? আর সেটা রোজই দিতে হবে কেন?

মানুবাবু বললেন,—এর কোন মানে হয়? রোজই চা,—আপনি বরং বসুন, গল্প করা যাক্—

বাসন্তীদেবী হেসে বললেন,—গল্প আমরা করি না বটে, তবে শুনি রোজই। আপনাদের আড্ডাটাই ত আমাদের একটা পরোক্ষ আনন্দ—

—কি মুস্কিল, পরোক্ষ হবে কেন? প্রত্যক্ষ করে নিতে আপত্তি কি? এর কোন মানে হয়?— মানুবাবু ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। বাসন্তীদেবীর এত নিকটে এ পর্য্যন্ত ঘেঁসতে পারেননি তিনি। —বসুন না চেয়ারটায়। মধু, একটা চেয়ার দাওনা ওঁকে?

—না, না—আমি অন-ডিউটি।

—তা হোক্ না,—তেমন সিরিয়স রোগী ত নেই—

ক্রিং-ক্রিং সাইকেলের বেল শোনা গেল। ডাক্তার এসে পৌছে গেলেন। মধু সাইকেল ব্যাগ প্রভৃতি নিয়ে গেল। ডাক্তার বললেন,—বাসন্তীদেবী, ব্লাড-প্রেসার যন্ত্রটা টেবিলে রাখুন না— বাসন্তীদেবী যন্ত্রটা হাতে নিয়ে চলে গেলেন। মানুবাবু দুঃখিতভাবে বললেন,—এত সকালেই ফিরলেন?

—দুঃখিত হচ্ছেন কেন? অন্ধকারে আছাড় খেলে কি খুশী হতেন?

মণ্টুবাবু বললেন,—একটা ভদ্রতা আছে ত? বলেন কি করে!

—রামচন্দ্র—কি বলছেন? এর কোন মানে হয়?

হেডমাস্টার বললেন,—কিছু দক্ষিণা হ'ল তাহলে মোটামুটি—

—হ্যাঁ, হল বৈকি? ছ'মাইল সাইকেল করার জন্য ছ'টাকা আর দক্ষিণা দু'টাকা।

—কি রোগী ?

—ব্লাড-প্রেসার।

পণ্ডিত বললেন,—সে কি ? গ্রামে আবার এসব রোগ আমদানী হ'ল কি করে ? ওসব ত শহরের বাবুভায়াদের রোগ,—গাঁয়ের লোকের ত রক্তই নেই, তার আবার চাপ ?

ডাক্তার বললেন,—আছে, তবে রোগ-নির্ণয় হয় না তাই লোকে বলে ভিরমী হ'য়ে মরেছে—

পণ্ডিত বললেন,—না, ওসব রোগে গ্রামের লোক মরেছে শুনিনি। কলেরা, বসন্ত, জ্বর, আমাশয় এতেই এরা মরে—রাজসিক ব্যাধির দরকার হয় না।

হেডমাস্টার বললেন,—বেচারাম ক্ষুদিরাম ন'রে হ'রে জ্বরে ভুগে, নেবে উঠে মরে, তাই বলে রাজা-রাজড়ারা ত তেমনি মরতে পারেন না,—তাঁরা মরবেন থ্রম্বসিস, ক্যান্সার, সিরোসিস-অব-লিভার হ'য়ে। জ্বর-আমাশয়ে মরলে কি আভিজাত্য থাকে !

পণ্ডিত বললেন,—হ্যাঁ, আমরা পণ্ডিত-ফণ্ডিত মরবো অমনি রোগে—মানুবাবু জমিদার, তাঁর যদি না একটা বলবার মত রোগ হয় তবে মানায়ই না।

মানুবাবু বললেন,—আলাই-বালাই,—এখনো কত সাধ-আহ্লাদ রয়েছে মনে—

সকলে হাসলেন। ডাক্তার বললেন,—মধু চা'র কথা বলেছ ?··· তাহলে আপনাদের মত ঐসব রাজসিক ব্যাধি গ্রামে হয় না ?

হেডমাস্টার বললেন,—হয় না—যেহেতু এরা কাজ করে, খেটে খায়—খেয়ে হজম করে, প্রকৃতির সঙ্গে থাকে—তাদের দেহ সক্ষম সুন্দর। যেমন ওই ঘোড়ামারার সেই মেয়েটার মাঝে দেখেছেন—

ডাক্তার বললেন,—তার নাম সাবি, বর্ত্তমানে সে আমার বাড়ী কাজ করছে। বেতন পাঁচ টাকা।

মানুবাবু ঠেস দিয়ে বললেন,—হ্যাঁ, ডাক্তারের এবার গবেষণার সুবিধে হবে—পাঁচ আনার এক সের পচুই দিলেই পূর্ণাঙ্গ গবেষণার কাজ চলবে—

পণ্ডিত বললেন,—যাদৃশী ভাবনা যস্য। যাক্, তবে এটা সত্যি ডাক্তারবাবু, শহরে রোগ-বালাই যত শুনি গ্রামে অত নেই। সেখানে মেঠাইও যত রকমের, ব্যাধিও তত রকমের। বিলাসও যত, ব্যাধিও তত। এখানে ভাত মাছ শাক—ব্যাধিও ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত।

মানুবাবু পণ্ডিতমশায়ের ইঙ্গিতে ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন,—তার মানে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বলে যে সুখ-সমৃদ্ধি করেছে—নগর যন্ত্র-যান গড়ে তুলেছে, মানুষকে এত সুখী করেছে—তারই ফল হ'য়েছে এই অসুখ। বাগদী-বাউরী কিসে মরছে কে খোঁজ করছে বলুন না? এত ওষুধপত্র আবিষ্কার হ'য়েছে—মানুষ ত দুদিন পরে মৃত্যুঞ্জয়ী হবে—

হেডমাস্টার বললেন,—সর্ব্বনাশ, মৃত্যুঞ্জয়ী হলে রক্ষে নেই। শিয়রে মৃত্যু দাঁড়িয়ে জেনেও মানুষ মানুষের গলায় ছুরি দিচ্ছে, ওষুধে ভেজাল দিচ্ছে—আর যদি অমর হয় তবে পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হ'য়ে যাবে। আমার কি মনে হয় জানেন, ডাক্তারবাবু, ভগবান বললেন,—মানুষ যখন জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছে তখন—যাও পৃথিবীতে যেয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রুটি রোজগার কর। মানুষ পৃথিবীতে এসে অবাধ্য হ'ল,—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কল-কারখানা করলে, কল ঘামতে লাগল, মানুষ বসে রইল—তাই ভগবান নানারকম রোগ পাঠালেন তাদের ঘামাবার জন্যে। কেউ ব্লাড-প্রেসারে ঘামছে, কেউ হৃৎযন্ত্রের যন্ত্রণায় ঘামছে, কেউ কলিক যন্ত্রণায় ঘামছে—ভগবানের অভিসম্পাতে ঘামতে তাকে হবেই।

পণ্ডিতমশায় বললেন,—

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপেষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্ত্তেঽতিমহান্ধকারে বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্॥

ডাক্তার পরিহাস করলেন,—যাক্, এতদিনে চণ্ডী আর বাইবেলের সংমিশ্রণ ঘটল হাসপাতালে—

হেডমাস্টার বললেন,—ঠিক তাই, জগৎপুরের ডাঙার হাসপাতালের মত। হাসপাতাল তৈরী হ'ল রোগ-চিকিৎসার জন্য, অথচ রোগ-নিবারণের জন্য খাদ্যের সংস্থান হ'ল না। কলকাতার আশেপাশে পঞ্চাশ মাইলের মাঝে শিশু-রোগীতে দুধ পায় না খেতে, সব ছানা হ'য়ে চলে যায় কলকাতা মেঠাই হতে— আবার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হয় টি-বি চিকিৎসার জন্যে। খাদ্য না পেলে টি-বি ত হবেই—

ডাক্তার বললেন,—অর্থাৎ—মল্লিনাথ কি বলেন?

পণ্ডিতমশায় চট্ করে বললেন,—সভ্যজগৎ দুধ টেনে নিয়ে ব্যাধির সৃষ্টি করছে,—আর বিজ্ঞানীরা ওষুধ আবিষ্কার করছে,—

হেডমাস্টার বললেন,—কারখানায় ওষুধ তৈরী হচ্ছে, বিক্রি হচ্ছে। ব্যাধি না থাকলে ওষুধ বিক্রি হয় না, কারখানা চলে না। খেতে না দিয়ে ব্যাধি-

সৃষ্টি করছে—আর ওষুধ বিক্রি করছে—কত মাইসিটিন অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্য থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে আর তাল সামলাতে পারছে না—ঘুরপাক খাচ্ছে।

মানুবাবু টিপ্পনী করলেন,—মহিষ মারতে গিয়ে মহিষাসুর বেরিয়ে পড়ছে—

সকলে হাসলেন। পণ্ডিতমশায় বললেন,—এই এতদিনে শ্রীশ্রীচণ্ডী মানুবাবুর কিছুটা বোধগম্য হচ্ছে। অর্থাৎ কামনায় মহিষকে ভোগ দিয়ে বধ করতে গিয়ে মহিষাসুর বেরিয়েছে—স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল জয় করবে কিন্তু নিপাত হবে আদ্যাশক্তি বিশ্বস্য বীজং মহামায়ার হাতেই—

চা এসে পড়ল। আলোচনাটারও মোড় ফিরল। চা খেতে খেতে ডাক্তার বললেন,—ব্লাড প্রেসারের রোগীটি অবশ্য শহর থেকেই এসেছেন—চাকুরী করতেন, অবসর নিয়ে এসেছেন।

মানুবাবু বললেন,—যাক্, আপনার ঝি-পরিবর্ত্তন হ'ল হঠাৎ?

মণ্টুবাবু বললেন,—গবেষণার জন্যে এটাও বুঝলে না, মানু? স্রেফ গবেষণা—

ডাক্তার বললেন,—মেয়েটা স্বাস্থ্যবতী, দেখতেও মন্দ নয়, যুবতীও বটে। এতে গবেষণার সুযোগ যথেষ্ট—কি বলেন মানুবাবু?

মানুবাবু বললেন,—আমাকে ঠাট্টা করেন নাকি? আমি কি তাই বলছি—হঠাৎ ঝি পালাল নাকি?

—হ্যাঁ পালিয়েছে। এবং ভাগ্যচক্রে ওটি এসে জুটেছে—ঝি-তত্ত্ব ছেড়ে এখন গবেষণা চলুক। আপনাদের সকলেরই কি মত গ্রামে ওসব রোগ হয় না—

মণ্টুবাবু বললেন,—আমার মত হয়, তবে তার চিকিৎসাও হয় না, ধরাও পড়ে না।

পণ্ডিতমশায় জানালেন,—হয় না। শুনিনি,—দেখিওনি—

হেডমাস্টার বললেন,—তা হলে একটা হিসেব নেওয়া হোক্। গ্রামের যত লোক আছে তাদের বাড়ীর যারা মরেছে, তারা কি রোগে মরেছে তার একটা স্ট্যাটিস্টিক্স নেন সকলে। তার পর—

মণ্টুবাবু বললেন,—মানু, তুমি বাউরী বাগদী পাড়ার হিসেব নেবে—আর ঘোড়ামারার—

ডাক্তার বললেন,—ঠাট্টা নয়, একটা হিসেব ধরাই যাক্ না। আপনারাও ত বহু দেখলেন, দেখুন না হিসেব করে—

হিসেব চলল।

হিসেবের শেষে দেখা গেল, তাদের জানার মধ্যে একটা মাত্র সন্ন্যাস-রোগে মৃত্যু পাওয়া যায়, বাকী সবই সাধারণ অসুখে।

হেডমাস্টার বললেন,—ব্যাপকভাবে হিসেব নিতে হবে, কাল থেকে সব নোট করবেন। কাজেই সকাল সকাল বাড়ী ফেরা দরকার।

তিনি উঠলেন।

মানুবাবু বললেন,—মাস্টারমশায়ের গৃহের শাসনে বড় ভয়—কণ্টোলার বড় কড়া—

মণ্টুবাবু ঠাট্টা করলেন,—চল মানু, ডাক-তার যখন এসেই গেছে তখন আর বসে কি হবে?

সকলে হাসতে হাসতে প্রস্থান করলেন।

*

একটু শীত পড়েছে। ডাক্তার খেয়ে উঠে বারান্দায় সিগারেট ধরিয়ে বসলেন। চারিদিকে ঘোলাটে জ্যোৎস্না, অল্প কুয়াশা জমেছে। আকাশের তারাগুলি স্তিমিত। ডাক্তার ভাবছিলেন—

রমলা এসে বলল,—শোবে না?

—হ্যাঁ, যাই। তোমার ঝি কেমন কাজ করছে?

—ভাল,—চট্‌পট্‌ একঘণ্টায় সব কাজ সেরে দিয়ে চলে যায়। কাজও পরিষ্কার—এখন টিকলে হয়!

—টিক্‌বে। কোলিয়ারীর দিকের ত নয়, ওরা এখনও চালাক হয়নি। সভ্যজগতের হাওয়া গায়ে লাগেনি।

—তোমাদের আড্ডার সংবাদ কি?

—আজ বাজে কথা হ'য়েছে। গ্রামে নাকি ব্লাড-প্রেসার, থ্রম্বসিস, ক্যানসার রোগ হয় না।

রমলা পরিহাস করলেন,—তোমার অন্ন উঠলো, সকলেই ডাক্তার হয়ে যাবে শেষে—

আরও নানা কথা হ'ল, তার পর ডাক্তার তার নোট-বইতে কথাটা লিখে রাখলেন, এসব ব্যাধি গ্রামে হয় কিনা। যদি না হয় তার কারণ কি? ছোটলোকের মাঝে হয় না কেন···ইত্যাদি।

ভালকুড়ির পাশে কালো অন্ধকার অরণ্যের মাঝে ঘোড়ামারা, ডাক্তার সেদিকে তাকালেন,—আলো নেই, মাদলের বাজনা নেই। রমলার দিকে তাকালেন, তার পর ক্যালেণ্ডারে তারিখ দেখলেন। রমলার জন্মে

একটা গ্লুকোজ আর কোরামিন আনা হয়নি—সময় হ'য়ে এসেছে রমলার অসুস্থতার।

*

সাবি গল্প করে গাঁয়ের সকলের কাছে। হাসপাতালের রকমারী ব্যাপার গাঁয়ের লোক অবাক হ'য়ে শোনে। সাবির মাও শোনে তার কথা।

সাবি বলে,—উঃ ডাক্তার মা ভাল বটি। চা-মুড়ি দিচ্ছে,—বলছে জিরিয়ে লে সাবি। ঘরকে যাবি কেনে, বস তুদের কথা বল কেনে!

—তুর সঙ্গে গল্প করছে—

—হুঁ, আমি কি বলবেক, উ কত লিখাপড়া জানছে। সকালে লাল জুতাটি পায়ে দিয়ে, চাদর গায়ে দিয়ে বেরুচ্ছে,—ছুধে-আলতাপাটি গায়ের রংটি। উনুনে চা করলে ত মুখটি জবাফুলের মত লাল হ'লেক—

—ডাক্তার কেমন বটে?

—উ ভাল,—উর সঙ্গে ত দেখা হচ্ছে না। চা খেলেক, হাসপাতালকে চলে গেলেক। কত রুগী আসছে আর উ দু'পহরে ঘরকে আসবে—তাই ডাক্তার-মা বলতে লাগছে—ঘরকে যাবি কেনে সাবি, গল্প কর। উরা কি জানছে,—গরু রইছে, মাঠকে কাজ রইছে—

—হাসপাতালকে কি হচ্ছে বটে—

সাবি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে,—উ, কে জানছে,—কোন রুগী চেল্লাতে লেগেছে, কোনটা বসে ঝিমুচ্ছে··· সাবি এসে গল্প করে সভ্যজগতের কথা, ওরা অবাক্ হয়ে শোনে। এই হাসপাতালের ইঁট থেকে শেষ পর্য্যন্ত এদের তৈরী, সেখানে নতুন লোক এসেছে তাই তাদের খবর তারা জানতে চায়।

ঘোড়ামারার জীবন চলে আগের মতই। সাবি কাঠ কুড়োতে যায় ভালকুড়ির বনে, সাধুও যায়—ওদের দেখা হয়—ওরা অতীতের কথা স্মরণ করে। নকুড় কাজ ক'রে মাতাল হ'য়ে ফিরে হৈ-হল্লা করে। নোটন কোমর দুলিয়ে রঙীন শাড়ী পরে ঘুরে বেড়ায়—মাঝে মাঝে কোথায় যেন যায়।

*

সাবি উঠানে কোমরে আঁচল গু'জে ঠাণ্ডা জলে বাসন মাজছিল।

ডাক্তার পূবের বারান্দায় শীতের প্রথম রোদে আলোয়ান জড়িয়ে বসে চা'র প্রত্যাশা করছিলেন। ডাক্তার-গিন্নি গায়ে স্কার্ফ জড়িয়ে উষ্ণ চা এনে দিলেন। সামনের মোড়ায় বসে দু'জনে চা পান ক'রছিলেন। রমলা বলল,—উ, কি

ঠাণ্ডা পড়েছে। সকালে কলের হাতলটা ধরেছি আর মনে হ'ল বরফ—হাত জমে গেল—

ডাক্তার বললেন,—ও ত ঠাণ্ডা জলে বেশ কাজ করছে! শীতও নেই—কাপড়ের আঁচলটা গায়ে দিয়ে ঘোড়ামারা থেকে সূর্যোদয়ের আগে এসেছে বেটি। শিশির-ভেজা পথে পা বাড়ালে কি করে! খালি পা—

—অভ্যেস—ছোটকাল থেকে অভ্যাস রয়েছে তাই পারে—

—একবার ভদ্রলোক হ'য়ে গেলে আর পারবে না—

একমণ চাল এনে ফেলল একটা লোক—একখানা চিঠি সঙ্গে। মণ্টুবাবু সরু ভাল চাল পাঠিয়েছেন এক মণ—দাম দিতে হবে। রমলা ঘর থেকে টাকা বের করে দিয়ে দিলেন। ডাক্তার হাতের ঘড়ি দেখে বললেন,—হাসপাতালের সময় হ'ল। দেখি মধু আর কম্পাউণ্ডারবাবুকে ডাকি, সকলে মিলে চালটাকে ঘরে নিয়ে ড্রামে ঢালতে হবে ত?

রমলা বললেন,—সাবি, চা খেয়ে নে, ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে—

সাবি হাত ধুয়ে এসে চাতালে মুড়ি-চা খেতে বসে গেল।

ডাক্তার বললেন,—দু'জনে পারবে না?

—ড্রামটা রয়েছে আবার বেঞ্চির উপর, নামানও চলবে না, তাহ'লে সব সরাতে হবে। তুমি ত আছ,—তিনজনে হ'য়ে যাবে।

চালটা বারান্দা থেকে ঘরে নিয়ে কি করে ড্রামে ঢালা যেতে পারে এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। সাবি বললে,—তুরা কি বলছিস্ মা?

—চালটা ঘরে নিতে হবে।

—এক মণ হবেক?

—হ্যাঁ—

—কোথাকে লিবি?

—ঘরে ড্রামে ঢালতে হবে—উঁচুতে—

সাবি উঠে এসে বললে,—কোথা বল কেনে?

রমলা দেখিয়ে দিলেন ড্রামটার অবস্থিতি। সাবি বললে,—ঘরকে যাবো?

—যা না কেন?

সাবি ঘরে যেয়ে ড্রামটা দেখে এল, তার পর প্রশ্ন করল,—চালটা উয়াতে রাখবেক ত? হ, উয়ার জন্যে জন-মনিষ ডাকতে হবেক? উ আমি লিয়ে যাবেক—

রমলা বললেন,—তুই একা পারবি কেন?

সাবি বললে,—হু, গ্যাখ কেনে—

সাবি চা খেয়ে পাত্রটা বাসনের ওখানে রেখে এল। ডাক্তার প্যাণ্ট পরে বাইরে এসে দেখছিলেন, হাসপাতালে যেতে একটু দেরী করছিলেন ইচ্ছা করেই। সাবি কি করে দেখবার কৌতূহল হ'য়েছিল তাঁর। ও মেয়েমানুষ একমণ চালের বস্তা কি করে ঘরে নিয়ে যায়—

সাবি দাওয়ায় উঠে দু'হাতে অনায়াসে বস্তাটা তুলে কোমরের উপর রেখে ঘরে নিয়ে গেল এবং সেখান থেকে বস্তার মুখের দড়ি খুলে দিয়ে মুখটা ড্রামের ভিতর পুরে দিয়ে বস্তাটা উল্টে দিল, তার পর বস্তা ঝেড়ে বাইরে এসে বলল,—বস্তা কোথা রাখবেক?

—রাখ্ ওখানে।— রমলা বললো।

—উঃ সরু চাল ভাল লয়, সকালকে খেলে এক পহরকে আবার ক্ষুদা লাগবেক বটে! উ চালই লয়—

ডাক্তার বিস্মিত হ'য়েছিলেন! সাবি স্বাস্থ্যবতী কিন্তু ক্ষীণাঙ্গী, একমণ বস্তাটা যেমন অনায়াসে সে কোমরে তুলে নিল ভরা কলসীর মত তাতে মনে হয় গায়ে তার প্রচুর শক্তি। মধু আর কম্পাউণ্ডারবাবু দু'জনে পারতেন কিনা সন্দেহ।

ডাক্তার হাতে ঘড়ি বাঁধতে বাঁধতে হাসপাতালের দিকে রওনা দিলেন। মনটা তাঁর ভেবে চলেছিল অনেক কথা, তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রটা ক্রমশঃই বিস্তৃত হচ্ছে। তাঁর চোখে চার্ব্বঙ্গী চপলাপাঙ্গী সাবি একটা পরম বিস্ময়

হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল,—ওর দেহটা ডিসেক্ট করে দেখতে পারলে, ওর রক্তটা পরীক্ষা করতে পারলে হয়ত রহস্যের সন্ধান পাওয়া যেত। শীত গ্রাহ্য করে না,—নিত্য ভোরে একমাইল খালি পায়ে, আঁচল গায়ে দিয়ে আসে এই শীতে—অথচ এতটুকু সর্দ্দি-কাশিও হয়নি ওর—শীত পড়ার পর থেকেই অর্চ্চনার সর্দ্দি-কাশি লেগে আছে। পেপস্-এর বড়ি মুখে না দিলে ঘুমুতেই পারে না। প্রশ্ন আসে মনে—কেন? ··

রমলা বললেন,—কয়লাটা আগে ভেঙে দে সাবি?

সাবি হাতের কাজ ছেড়ে হাতুড়ী দিয়ে কয়লা ভেঙে খানখান করতে লাগল! রমলা বারান্দায় স্কার্ফ গায়ে দিয়ে বসে কুটনো কুটতে আরম্ভ করলেন। অর্চ্চনা রোদে বসে হাতের লেখা লিখছে। মা তাকে পড়িয়ে দিচ্ছেন।

শনিবার দুপুরে বন্দুক নিয়ে মানুবাবু এসে হাজির হলেন। বললেন,—চলুন, ভালকুড়ির ওদিকে যাই, ঐ ঘোড়ামারার পিছনের জঙ্গলে আশুকলমা ধান কাটা হ'য়েছে, তিতির বেরুচ্ছে।

—এই খেয়ে উঠলাম। এখনই বেরুবো—

—বন্দুকে জং পড়ে গেল, একটু চালাতে হয়, নইলে হাত সই থাকবে কেন?

ডাক্তার ধীরে সুস্থে প্রস্তুত হ'য়ে নিলেন, জল খেয়ে দুটো পান তৃষ্ণা-নিবারণের জন্যে নিয়ে মানুবাবুর সঙ্গে সাইকেলে চললেন শিকার করতে।

সাইকেলে চলতে চলতে মানুবাবু বললেন,—আপনার সাবিদের গাঁ ওই ঘোড়ামারা,—দেখবেন, ওরা কেমন ভাবে থাকে। আপনার গবেষণার সুবিধা হবে। ওর পিছনে কাঁদোড়ের ধারে শালবনে তিতির যথেষ্ট। গত বছর এক গুলিতে তিনটে মেরেছিলাম—প্রায় দেড় সের মাংস—আর তিতিরের চেয়ে ভাল মাংস ত কিছু নেই—। আপনার ঐ সাবিরাও ফাঁদে তিতির ধরে ভোজন করে—

ডাক্তার বললেন,—তা যতই বলুন, খাচ্ছি ত আমরাও। বেটি একমণ চালের বস্তা তুলে নিয়ে অক্লেশে বুক সমান উঁচু ড্রামে ঢেলে দিলে। আমি ত তিনজন লোক খুঁজছিলাম—

—ওরা ত একমণ-দেড়মণ কাঠের বোঝা নিয়ে পাহাড় থেকে নামে-ওঠে। ওরা পারবে না কেন?

—পারে কেন সেইটেই ত কথা—

মানুবাবু বললেন,—হ্যাঁ, হরিয়ালও কিছু এধারে পাওয়া যায়—বটের ফল খেতে আসে—

সাইকেল চলছিল দুখানা পাশে পাশে। রাস্তাটা খারাপ হওয়ায় আগে পিছু করতে হ'ল—গল্পটাও বন্ধ হ'ল।

ডাক্তার দেখছিলেন, কাঁকর-পাথরের রাস্তা। বিশুষ্ক পাণ্ডুর মৃত্তিকা। পাশে ছোট ছোট কুলগাছে কত কুল হ'য়েছে, কিছু কিছু পেকেছেও, অথচ কেউ নিয়ে যায় না। তিনি বললেন,—এ কুল কেউ খায় না?

মানুবাবু বললেন,—বিশ্রী টক, না হয় তেতো—ও খায় কে?

ভালকুড়ি পাহাড়টা দূর থেকে ঢিবির মত দেখা যায়, তার পাদদেশ দিয়ে চলতে চলতে ডাক্তার তাকালেন,—বেশ উঁচু। যে গাছগুলিকে আশশেওড়া, ঘেঁটুগাছ বলে মনে হচ্ছিল তারা শাল-পলাশের গাছ। ডাক্তার বিনা ওজোরে মানুবাবুর পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন, একটা বটগাছের নীচে মানুবাবু নেবে

গাছটা পরীক্ষা করলেন, হরিয়াল আছে কিনা। ডাক্তারও নেবে পরীক্ষা করলেন। হঠাৎ মৃদু একটা কণ্ঠস্বর শুনলেন,—ডাক্তারবাবু!

ফিরে তাকিয়ে দেখেন সাবি একটা ছোট কুঁড়েঘরের উঠানে দাঁড়িয়ে আছে বিস্মিতদৃষ্টিতে। ডাক্তার বললেন,—এটা তোদের বাড়ী?

—হ বটি। কি দেখতে লাগছিস্—শিকার করবেক?

—হ্যাঁ,—হরিয়াল দেখছি—

সাবি হেসে বলল,—উরা ভোর রাতকে আসছে বটি। আর সেই সাঁজকে আসবে। শিকারকে কুথা যাবি?

ডাক্তার আর মানুবাবু সাইকেল ঠেলে নিয়ে উঠানে এসে দাঁড়ালেন। সাবি ঘর থেকে দুখানা ভাঙা মোড়া এনে উঠানে দিয়ে বললে,—বস কেনে, ডাক্তারবাবু—

—বসবো কিরে? তাহলে শিকার করবো কখন?

—এখুন ত তিতির বার হবেক নাই বাবু, বেলা পড়তে দে কেনে—

মানুবাবু প্রশ্ন করলেন,—তিতির কোনদিকে বেশী বেরোয়?

ডাক্তার তাকিয়ে দেখছিলেন। বারান্দায় ভাত বাড়া রয়েছে—কে খেয়ে গেছে, আর দুখানা এনামেলের কাঁসি থালায় ভাত রয়েছে। মাঝখানে একটু তরকারী—নানা তরকারীর মিশ্রণে একটা ঘ্যাট-জাতীয় পদার্থ—

নকুড় আর সাবির মা এসে প্রণাম করল। সাবির মা বললে,—হ, সাবি পুণ্যি করলেক বটে, তাই বাবু আর তু ডাক্তার হেথাকে এলি। মোরা গরীব বটি, তুদের বসতে দিতে লারবেক—

নকুড় কোন কথা বললে না—দূরে গিয়ে উঠানের কোণে রোদে বসল।

ডাক্তার বললেন,—ও কে?

—উ ত জামাই বটে—সাবির মনিষ—

ডাক্তার নকুড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন,—করুণা হ'ল মনে,এই সাবির স্বামী! ডাক্তার উঠে গিয়ে ওদের ঘরটা দেখলেন,—হাওয়া-বাতাসের কারবার নেই। পিছনে ও সামনে দুটি মাত্র জানালা একবর্গফুট পরিমাণ। দরজাও অত্যন্ত ক্ষুদ্র, চারফুটের বেশী উঁচু নয়। বাড়া ভাতের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলেন,—লাল-লাল ভাত, মাঝে ঐ একটু তরকারী, আর কিছু নেই।

ডাক্তার বললেন,—সাবি, তোরা খাস্‌নি—

সাবি বললে,—মা আর আমি খাবেক—

—ঐ তরকারী দিয়ে এতগুলি ভাত খাবি কি করে ?

জবাব দিলো সাবির মা, —হ, পাঁচটো তরকারী তুরা খাবি, একটা জুটছে নাই—তার পাঁচটো—

—কাল কি দিয়ে খেয়েছিলি ?

—কাঁদোড়কে পুঁটিমাছ ধরা করলেক, উর ঝাল-চচ্চড়ি করে খেলেক—

মানুবাবু বললেন,—কোথায় তিতির বেশী হ্যাঁরে সাবি ?

সাবি বললে,—উ কাঁদোড়-ধারে যা কেনে, ধানকাটা ভূঁইএর বগলে জঙ্গল, হোথা তিতির রইছে সব—

মানুবাবু বললেন,—চলুন চলুন, দেরী নয়,—তিতির বেরুবে এক্ষুনি। সাইকেল এখানে রেখে যাই।

—এই—এই, তোর নাম কি ?— নকুড়ের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন।

নকুড় বলল,—মোর নামটি নকুড় বটে—

—হ্যাঁ নকুড়, এখানে সাইকেল রেখে গেলুম। ফিরবার মুখে নিয়ে যাবো—

দুজনে বন্দুক নিয়ে শিকার করতে গেলেন—সাবি পথ দেখিয়ে হদিস দিয়ে দিল। পলাশবনে খুটখুট শব্দ হচ্ছিল। মানুবাবু যেতে যেতে বললেন,—ধানকাটা হ'লে সেই জমিতে ওরা চরতে আসে। জঙ্গলের ভিতর চুপ করে বসে থাকবেন, বেরুলে দু'চারটে বেরুবে, তার পর সুযোগ বুঝে গুলি করবেন। তিতির শিকারের টেক্‌নিক আলাদা—

নোটন রঙীন কাপড় পরে কাট ভাঙছিল। পলাশ, শাল প্রভৃতি গাছের কিছু কিছু ডাল এমনিই শুকিয়ে যায়। লগা দিয়ে সেগুলি ভেঙে এনে ওরা জ্বালানি করে। কয়লাও কিছু কিছু আনে কোলিয়ারী থেকে। ফাগুনের ঝরা পাতা দিয়ে ধান সিদ্ধ করে। মানুবাবু নোটনকে ইসারা করে ডাকলেন,—এদিকে শোন্—

নোটন বন্দুকধারী বাবুদের কাছে এগিয়ে এল। মানুবাবু বললেন,—তোর নাম কি ? তোরা কি ?

—নোটন মোর নামটি—মোরা ধাঙড় বটি।— নোটন ফিক্ করে হাসল।

—তিতির কোথা বল ত—

—নোটন একগাল হেসে বলল,—সবখানেই ত রইছেন, চল্ কেনে, দেখাবেক,—মোকে কি দিবি ?

মানুবাবু বললেন,—এ্যাঁ, কি দেবে ওকে ? চল্—দেখিয়ে দিবি।

মানুবাবুরা কিছুদূর এগিয়ে গেলেন, নোটনও সঙ্গে সঙ্গে গেল। মানুবাবু বললেন,—আপনি ঐদিকে যান, আমি এইদিকে যাই, কেমন ?

ডাক্তার রওনা দিলেন একটা দিক লক্ষ্য করে। মানুবাবু নোটনকে সঙ্গে নিয়ে অন্যদিকে গেলেন, শিকারের উদ্দেশ্যে। নোটন পথিমধ্যে বললে,—তুর সঙ্গে যাবেক কেনে, তু মনিষ মু কামিন বটি—সে ফিক্ করে হাসলে।

মানুবাবু বললেন,—চল্ চল্—কামিন—সীতে-সাবিত্রী সব—

*

ডাক্তার বসে ছিলেন,—তিতির দু'একটি বেরুল কিন্তু বন্দুক তুলতে-না-তুলতেই উড়ে গেল। বুঝলেন একটু শব্দ হয়েছে, বন্দুক তুলতে বা ঘোড়া তুলতে—আবার চুপ করে বসলেন। আবার তিতির বেরুল। হঠাৎ দুম করে শব্দ হ'ল—মানুবাবু ফায়ার করেছেন। তিতির উড়ে গেল—বুঝলেন আজ আর নয়। বেলাও পড়ন্ত—তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন,—মানুবাবু, মানুবাবু—

মানুবাবু এলেন ; বললেন—মিস্ করেছি। হাতটা যেন সই নেই ঠিক—এদিকে আজ আর তিতির বেরুবে না। চলুন অন্য দিক—

ডাক্তার বললেন,—বেলা পড়ন্ত, চলুন—আজ আর নয়।

ওরা দুজনে ফিরে এলেন সাবির উঠানে। সেখানে ইতিমধ্যে অনেক লোক সমবেত হয়েছে। গ্রামের যারা কাজে কর্ম্মে বাইরে ছিল তারা বাড়ী ফিরে বাবুদের আগমন সংবাদ শুনেছে তাই দেখতে এসেছে। একটি বৃদ্ধ ব্যক্তি ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। সাবির মা বললে,—মহিম মোড়ল, উ গাঁয়ের মোড়ল বটি।

মহিম মোড়া দুটি এনে বললে,—বসুন বাবু! এ গাঁকে এয়েছেন শিকারে—

ডাক্তার প্রশ্ন করলেন,—কত বয়স হ'ল মোড়ল ?

মহিম বললে,—কে জানছে,—তা চারকুড়ি ত হবেকই। হ, চারকুড়ি তিন-চার হবেক—

ডাক্তার বললেন,—বসো বসো,মোড়ল। মহিমের চুল সামান্য পেকেছে মাত্র।

মানুবাবু সিগারেট ধরালেন। ডাক্তারও একটা সিগারেট ধরিয়ে মহিমকে বললেন,—এধার থেকে ত কেউ যায় না ওষুধ আনতে, রুগীও যায় না—

—উঃ হাসপাতালকে যাবেক কেনে বাবু ? আর, রোগ কি রইছেন ?

—রুগী পাঠাবে, আমি ভাল করে দেখে ওষুধ দেব, কোন পয়সা দিতে

হয় না, শুধু শিশি নিয়ে যাবে। কামিনদের ছেলেপুলে হওয়ার আলাদা ঘর রয়েছে ; খাবার, ওষুধ সব দেওয়া হয় সরকার থেকে—কোন খরচ নেই—

—উ সব বাবুরা যাবেক, মোদের কামিন হোথা যাবেক কেনে ? উঃ জ্বর-জ্বালা হচ্ছে ত শিকড়-বাকড় খেয়ে লিচ্ছে,—উ বিলাতি ওষুধ মোরা খাচ্ছি বটে ! হ—

—খাবে না কেন ? পয়সা লাগবে না, খাবার লাগবে না—

—হ, বর্ষাকালকে যাবে দু'চারটো, মাথা ভেঙ্গে—উ শালারা জল লিয়ে মারামারি করছে। উ সব পিয়ারশোলের চাষা বড় খচ্চোর বটি—

ডাক্তার বললেন,—কঠিন রোগী হ'লে পাঠিয়ে দেবে, হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করে দেব, খাবার দেব—কোন খরচ নেই—এই ত হাসপাতাল।

—হ, উয়া আর জানছি না ? ঘোড়ামারার কুলি-কামিন হাসপাতালটো বানালেক বটে ! মোদের আর কোন্ রোগ রইছে ?

ডাক্তার প্রশ্ন করলেন,—এ গাঁয়ে মহিমের জানা যত লোক মরেছে তারা কি কি রোগে মরেছে ? মহিম হিসাব দিল—ডাক্তার খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য—কেউ ক্যানসার, ব্লাডপ্রেসার বা থ্রম্বসিস রোগে মরেছে কিনা ? কিন্তু মহিম যা বললে, তাতে জানা গেল বৃদ্ধবয়সে জ্বর, আমাশয় গ্রহণী প্রভৃতি রোগ ব্যতীত অন্য রোগে কেহ মারা যায়নি, দু'একজন সর্পাঘাতে, দু'একজন আকস্মিকভাবে গাছ থেকে পড়ে, পাথর চাপা পড়ে বা বিদেশে গিয়ে মারা গেছে। বেশী লোক একবার মরেছিল কলেরায়—

ডাক্তার পুনরায় খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলেন,—তারা কলাই ডাল ও এক তরকারী ছাড়া কিছু খায় না। দুধ আর ডিম যা হয় সব বিক্রি করে। মহিম শেষে বললে,—হ, এক তরকারী জুটছে কই, উ সব তুরা খাবি। মোরা ছোটলোক বটি,—অর্থাৎ তারা ছোটলোক, তাদের পাঁচ তরকারী খাওয়া নিষিদ্ধ। মহিম হাসলে,—সামনের সাদা দাঁতকটা চিকচিক করে উঠল।

সন্ধ্যা হ'য়ে আসছিল, ডাক্তার উঠলেন। মানুবাবু বললেন,—চলুন চলুন, রাত্রি হয়ে যাবে যেতে—

ওঁরা সাইকেলে উঠলেন। ঘোড়ামারা থেকে বেরিয়েই দেখেন, কে একটি লোক হাসপাতালের বটগাছের নীচু থেকে বেরিয়ে মাঠে নামল—হনহন করে আসছে—

মাঝপথে তার সঙ্গে ওদের দেখা—সাবি ডাক্তারের বাড়ী কাজ করে আসছে। সাবি হেসে প্রশ্ন করলে,—শিকার হ'ল নাই ?

ডাক্তার নামলেন। বললেন,—না, তিতির বড় বদমাইস পাখী—

—উরা ত পালাবেকই বাবু, উরা সাধ করে মরবেক তুদের সামনে এসে—

সাবির আঁচলে কি যেন বাঁধা। ডাক্তার বললেন,—তোর আঁচলে কি?

—উ; ডাক্তার-মা মুড়ি দিলেক,—আর তুদের তরকারীর চুকলা বটে—সাবি সঙ্গে সঙ্গে আঁচল খুলে দেখাল। সামান্য মুড়ি, কপির ফেলে দেওয়া পাতা, কুমড়োর চোকলা প্রভৃতি তরকারীর পারত্যক্ত অংশ।

—ও দিয়ে কি করবি?

—তরকারী করবেক। উ একবেলাকে হইয়ে যাবেক—

—মুড়ি খেলিনে যে! বাড়ী নিয়ে যাচ্ছিস্ কেন?

—মা খাবেক, উ ত ভাত খাচ্ছে নাই রাতকে। মুড়ি ক'টি খেয়ে লিয়ে শুয়ে পড়বেক—

সন্ধ্যা হয়-হয়—সাবি চলে গেল। ওঁরাও সাইকেলে উঠে ফিরে এলেন।

*

হাসপাতালে এসে রোগীদের সন্ধান নিতে নিতেই মণ্টুবাবু, হেডপণ্ডিত, হেডমাস্টার সব এসে পড়লেন। মানুবাবু পরিহাস করলেন,—মিথ্যে নয়, ডাক্তারবাবু সত্যিই গবেষণা শুরু করেছেন—

মানুবাবু সবিস্তারে এবং অতিশয়োক্তি সহকারে ডাক্তারবাবুর কার্য্যকলাপ বর্ণনা করলে, পণ্ডিতমশায় বললেন,—এইটেই বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থা। প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ না ক'রে ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়—তা গর্হিত।

হেডমাস্টার বললেন,—তা, কি ফলাফল? রাজসিক ব্যাধির সন্ধান কিছু পেলেন?

মণ্টুবাবু বললেন,—রাজসিক ব্যাধি ও শিকার দুটোই বোধ হয় আজ প্রবঞ্চনা করেছে—তবে মানু একটা কিছু শিকার করে আসেনি এটা বিশ্বাস হচ্ছে না যে?

মানুবাবু বললেন,—তার মানে? গুলি অবশ্য করেছিলাম, তবে মিস্ হয়ে গেল—

—একেবারেই? তোমার ত ভাল হাত, মানু—যাক্, ভালকুড়ি ছেড়ে ঘোড়ামারায় গেলে কেন?

মানুবাবু রাগান্বিত হয়ে বললেন,—তার মানে মানু মিত্তির যাই করুক তাই খারাপ—

পণ্ডিতমশায় বললেন,—গবেষণা থেকে বিচ্যুত হ'য়ে আমরা প্রসঙ্গান্তরে এসে পড়েছি, ডাক্তারবাবু—

ডাক্তার বললেন,—ওসব থাক্, তবে আমার কিন্তু মাঝে মাঝে সন্দেহ হ'চ্ছে। কেতাবে যা পড়েছি তা ত ঠিক মিলছে না। মানে, ভিটামিন-থিওরী ত পড়েছি,—কিন্তু ওই সাবি একমণ চালের বস্তাটা অক্লেশে তুলে নিয়ে চলে গেল,—অথচ খাদ্য দেখলুম এক-তরকারী ভাত। আজ ত তরকারীর চোকলা নিয়ে গেল, ঐ দিয়েই কাল চালিয়ে দেবে—তা হ'লে আমরা যে এত খাচ্ছি তা যাচ্ছে কোথায় ?

পণ্ডিতমশায় বললেন,—হ্যাঁ, খাচ্ছি ত বটে, কিন্তু তা হয়ত শরীরে গ্রহণ করছে না—

হেডমাস্টার বললেন,—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার একবার প্লুরিসি হয়েছিল, তখন ডাক্তারে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খেতে দেন। দু'চারদিন বাদে প্রস্রাব হতে লাগল ঘোলা-ঘোলা—ভয় পেয়ে গেলাম। ডাক্তার বললেন, ক্যালসিয়াম শরীরে নিতে পাচ্ছে না তাই ঐভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে। হয়ত তেমনি হ'তে পারে—মানে, খাদ্য খেলেই হয় না--দেহটা সেটা গ্রহণ না করতে পারলে ফল খারাপই হয়—

পণ্ডিত বললেন,—দেখুন, একটা ঘটনা বলি। আমার মা অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী ছিলেন,—ব্রাহ্মণের বিধবা একাদশীতে একটু ডাবের জলও তাঁকে বৈশাখ মাসে খাওয়াতে পারিনি। মাসে মাসে ত উপবাস অন্ততঃ দিন সাতেক,—একবার বাসায় সব চিকেন-পক্স হ'ল। মা কিন্তু সেই ছোটকালে বাংলা টিকে নিয়েছিলেন, তারপর আর নেননি। ভগবানের উপরই নির্ভর করে ছিলেন। তিনি আমাদের সেবা করেছেন, পথ্য দিয়েছেন সব করেছেন—কোলে করেও বিছানা থেকে উঠিয়েছেন। সবসুদ্ধ রোগে পড়ল, কিন্তু মা'র কিন্তু কিচ্ছু হ'ল না। এই রোগ-প্রতিষেধক শক্তিটা এল কি উপবাস করে ?

মানুবাবু বললেন,—ওসব গালগল্প,—না হয় নেহাৎ অ্যাক্সিডেন্ট—চিকেন-বাবা কাউকে মানে না—

মণ্টুবাবু বললেন,—পণ্ডিতমশায়, আপনার প্রশ্নটাই প্রশ্ন,—এখন ডাক্তার কি বলেন ?

ডাক্তার বললেন,—ডাক্তারই ত ঐ প্রশ্ন করেছে, তার আবার ডাক্তার কি বলবে ?

মানুবাবু বললেন,—প্রশ্নটা কি ?

হেডমাস্টার বললেন,—ক্লাসের ছেলে হ'লে বেঞ্চিতে দাঁড় করিয়ে দিতুম। প্রশ্নটাই মনে নেই,—প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে—যা কিছু ভাল খাদ্য খাচ্ছি আমরা অথচ স্বাস্থ্যটা ওদের, লেখাপড়া করছি আমরা আর সৎ এবং চরিত্রবান হচ্ছে ওরা! কেন?

—ওরা চরিত্রবান— মানুবাবু হো-হো করে হাসলেন।

মণ্টুবাবু বললেন,—কথাটা ঠিকই। আমি কণ্ট্রাক্টরী করি, কুলি-কামিন নিয়ে আমার কারবার, ওরা খারাপ নয়, লোভ দেখিয়ে আমরা খারাপ করি। তবে সব সময়ই হয় না,—ওই জয়দেব ইঁটকাটার সময় কি করেছিল যেন, একটা মেয়ে ওকে ঠ্যাং ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। মাথা ফেটে মরে আর কি! তোমার তো সেটা জানা আছে, মানু—

সকলে হো-হো করে হাসলেন। পণ্ডিত তাড়াতাড়ি বললেন,—ডাক্তার নীরব কেন?

ডাক্তার বললেন,—নীরব হইনি,—করেছে। যদি আপনাদের কথা স্বীকার করতে হয়, তা হ'লে পয়সা খরচ করে যা শিখেছি তা ভুল বলতে হবে। আর যদি সেটাকে ঠিক বলি, তবে প্রত্যক্ষ ঘটনাকে অস্বীকার করতে হয়—তাই নীরব। তবে বিজ্ঞানের অনুসন্ধান থেমে যায়নি,—যতই সমস্যা আসবে ততই বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা বেড়ে যাবে—এর উত্তর একদিন মিলবে—

পণ্ডিত বললেন,—প্রকৃতিম্ আদ্যম্,—প্রকৃতির থেকে যতই দূরে যাবে ততই বিপদ, প্রকৃতিই বিশ্বের বীজস্বরূপ,—ওরা প্রকৃতির সন্তান বলেই হয়ত মহামায়ার আশীর্ব্বাদ পেয়েছে। জলবায়ু আকাশ মৃত্তিকা নিয়েই ওদের জীবন—

মানুবাবু ঠাট্টা করলেন,—বেদ-উপনিষদের শ্লোক বলছেন—কিন্তু পণ্ডিত-মশায়, ওগুলো তিন-চারহাজার বছরের পুরোনো। তার পরে পৃথিবী অনেক এগিয়ে অ্যাটম যুগে এসে গেছে—

হেডমাস্টার বললেন,—এগিয়ে না ব'লে, বলুন—গতি লাভ করে অনেক ছুটেছে।

মানুবাবু বললেন,—যাই বলুন—

মণ্টুবাবু হেসে উঠে বললেন,—মানু, এটা বুঝলে না? গতি মানে এগোনোও হয় আর পিছনোও হয়—মাস্টার বলছেন, পেছিয়েছে—

—পেছিয়েছে? পাগলও বলবে না—তাই মানে করলেন মাস্টারমশায়—

হেডমাস্টার বললেন,—কথাটা হ'চ্ছে রিলেটিভ, মানে যেমন—যখন

হাসপাতাল আসছি তখন এদিকে এগুচ্ছি, আর গাঁ থেকে পেছুচ্ছি—স্থানটা কোনদিকে সেইটে নির্ণয় না হ'লে ওটা বোঝানো যাবে না। যদি বলেন,—অ্যাটমবোমা, গাড়ী-ইঞ্জিনই গন্তব্যস্থল—তবে এগিয়েছে, আর যদি বলেন, হৃদয়বৃত্তির প্রসারতাই—তথা চরিত্র, সততা, পরের জন্যে অনুভূতি-ই গন্তব্য স্থল—তবে পেছিয়েছে।

মানুবাবু বললেন,—তার মানে অসভ্য যুগে হৃদয়বৃত্তির প্রসারতা ছিল? তখন ত মানুষ হিংস্র ছিল—

মণ্টুবাবু বললেন,—এখনও হিংস্র। তোমার বাবা তোমার কাকার গুষ্টিসুদ্ধ সারাজীবন টেনেছেন—কাকা উপার্জ্জনক্ষম নয় বলে,—আর তুমি সম্পত্তিটা গ্রাস করে ভাইটিকে পৃথক করে দিলে—হিংস্রতাটা কমেছে কিসে?

ডাক্তার বললেন,—ব্যক্তিগত সমালোচনা নিষেধ—

*

পরদিন সাবি কাজ করতে এসেছে ভোরে—উঠানে দাঁড়িয়ে সে বললে, —মা, বাসন বের করবেক নাই?

ঘর থেকে কাতরস্বরে ডাক্তার-গিন্নি বললেন,—ঘর থেকে বের করে নে।

—উ রান্না ঘরকে যাবেক?

—হ্যাঁ—যা।

সাবি রান্নাঘর থেকে এঁটো বাসন-কোসন বের করে মেজে ফেলেছিল। জল এনে বাথরুমের টব ও রান্নাঘরের জলের পাত্র পূর্ণ করলো। ডাক্তার স্টোভ জ্বালিয়ে চা করে নিজে খেয়ে নিয়ে সাবিকে চা দিয়ে বললেন,—খেয়ে নে সাবি, মুড়ি কোথায় ত জানি না।

—তু চা করলি বাবু, মোকে দিতে হবেক নাই।

সাবি একবার ভাবলো প্রশ্ন করবে মা'র কি হ'য়েছে, কিন্তু সংকোচে থেমে গেল। ডাক্তার একটা সিরিঞ্জে ওষুধ ভরে বারান্দার আলোয় পরীক্ষা করে ঘরে ঢুকলেন। সাবি ভীত শঙ্কিত ভাবে দরজায় এসে দাঁড়ালো। ডাক্তার ইন্‌জেকশন করলেন,—একটা ঔষধ খাইয়ে দিলেন।

সাবি ম্লানমুখে দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল,—একটা কঠিন ব্যাধি হ'য়েছে মনে করে সে হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিল। ডাক্তার উঠে আসতে সে প্রশ্ন করল, —মা'র কি হলেক বাবু?

ডাক্তার সাবির বিষণ্ণ ভীত মুখের দিকে চেয়ে বললেন,—এমন কিছু না, ও মাসে-মাসেই হয়—

—কি হইছে বল কেনে? মা'টি উঠতে লারলে সকালে।

—ওই মাসে মাসে স্রাব হয় খুব বেশী, বুকে বেদনা হয়, দু'তিনদিন উঠতে পারে না—

সাবি বললে,—কামিনদের উ ত হইছেই বটে, ওয়াতে কি হবেক? বুকে বেদনা হবেক কেনে?

ডাক্তার বললেন,—হয়—ফি-মাসেই হয়, তুই বুঝবি না—

সাবি বললে,—হ, বুঝতে লারছি বটে,—ওয়া ত শুনি নাই, মোদের গাঁকে ত এমনটি শুনি লাই—

ডাক্তার হঠাৎ ফিরে একখানা টুল টেনে বসে বললেন,—সাবি, তুই বোস্। শোন্—

সাবি দাওয়ায় বসে বললে,—কি বলছিস্ বাবু? কে রাঁধবে তুদের আজ, অর্চনা কি খাবেক?

—সে হ'য়ে যাবে। ওই হাসপাতালের রাঁধুনীকে ধরবো, না হয় নিজেই রাঁধবো—তোদের মাঝে এমন কারো হয় না—

সাবি মাথা নীচু করে বললে,—ওয়া শুনি লাই।

—খুব বেশী রক্ত ভেঙে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে, বুক ধড়ফড় ক'রে ব্যথা করে, মাথা ঘোরে না?

—হ, ওয়া হবেক কেনে,—কামিন ত—কাজ করছে, ধান পুঁতছে, কাট ভাঙছে, হাটে যাচ্ছে—ধান ভানছে—ওয়া শুনি লাই ত—অমনটি ত হচ্ছে লাই, এতে কামিন রইছে গাঁকে।

ডাক্তার একটু ভেবে নিয়ে বললেন,—কখনও শুনিস্‌নি?—পেটে খুব ব্যথা হয়, দু'তিনদিন পড়ে থাকে।

—ব্যথা বিষ হবেক কেনে?

ডাক্তার আর একটু চিন্তা ক'রে বললেন,—চল্ একদিন হাসপাতালে, তোকে পরীক্ষা করবো।

সাবি হেসে বলল,—মোর কি রোগ হইছে বটি? মোর কি দেখবি?

—যন্ত্র দিয়ে দেখবো,—তোর রক্ত,বুকের ধড়ফড়ানি—তোর নাড়ী দেখবো—

—না বাবু, উ ডর লাগছে মোর। স্যুচ দিয়ে দিবি—

—না না, স্যুচ দেব না। এমনি দেখবো—

—সাবি উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—উ লারবেক, ডর লাগছে, তু কাটছিস্ ছিঁড়ছিস্—

ডাক্তার হেসে উঠে ঘরে গিয়ে কোট-প্যান্টালুন পরে হাসপাতালে রওনা দিলেন। তিনি বিস্মিত হ'য়েছিলেন,—এদের রোগ-ব্যাধি কি নেই? এটা সম্ভব কথা নয়,—ওরা রোগ হ'লে মরে—চিকিৎসা করায় না,—পয়সাও নেই, ব্যাধির আধিক্যও বোঝে না। নইলে দেহীর দেহে রোগ নাই এ সম্ভব নয়।

সাবি দরজার পাশে গিয়ে বসে দেখল, রমলা চোখ বুঁজে শুয়ে আছেন এবং মাঝে মাঝে বেদনায় কাতরোক্তি করছেন। সাবি বললো,—মা রে, তুর কি হ'ল বটে? উঠতে লারলি?

রমলা বলল,—বুকে বড্ড ব্যথা হ'য়েছে, উঠতে পারছি না। তোর কাজ হ'য়েছে?

—হ, কাজ ত হ'ল, তুকে এমনি রেখে যাবেক কোথা?

রমলা বললেন,—তুই যা, এই ওষুধ দিয়েছে, কিছুক্ষণ বাদেই উঠতে পারবো। উনুনটা সাজিয়ে দিয়ে যা—

—আঁচ দেবেক—

—না।

—অর্‌চনা কিছু খেলেক নাই। কে রাঁধবেক?

—সে হবে'খন। তুই আর বসে থেকে কি করবি?

ইন্‌জেকশন ও ওষুধের ক্রিয়া হ'তে আধঘণ্টা গেল। রমলা ধীরে ধীরে উঠে এসে বারান্দায় বসলেন—দেখেন, সাবি বারান্দার প্রান্তে বসে আছে। তিনি বললেন,—তুই যাস্‌নি?

—তুকে অমনি ফেলে কেমনে যাবেক বল কেনে?

তুই আঁচটা দিয়ে দে। আর কিছু হবে না। এখন আমি পারবো!

—বুকে ব্যথা লেই—

—আছে, তবে এখন পারবো—তুই যা—

সাবি একটু ইতস্তত: করে উনুনে আঁচ দিয়ে অবশেষে বাড়ীর দিকে রওনা দিল।

*

দুপুরে খেয়ে উঠে ডাক্তার সেন বারান্দায় বসে মেডিকেল পত্রিকা পড়ছিলেন, রমলা শুয়ে ছিল ঘরে। রান্না হতে আজ বেলা হ'য়েছে—খেতেও বেলা গেছে। ডাক্তার তাই আর আজ শয্যাগ্রহণ করেননি। পত্রিকায় টি-বি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে, প্রবন্ধকার এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তিনি বলছেন,—যথেষ্ট রোদ-হাওয়া যারা পায় এবং মাঠে-ঘাটে যারা দৈহিক

কাজ করে তাদের মাঝে টি-বি কম। সূর্য্যতাপ বা সূর্য্যালোকের প্রভাবে তাদের মাঝে টি-বি বীজাণু বর্দ্ধিত হতে পারে না।

সাবি খুব সকাল-সকাল এসেছে আজ। ডাক্তার বললেন,—সাবি এত সকাল-সকাল এলি যে!

—হ, মা কেমন রইছে? মনটা উতলা হ'ল বটি—

—ভালই। ওটা ভয়ের কিছু নয়, সাবি—কিছুদিন থাক্ তখন দেখবি ওটা মাসে-মাসেই হয়।

সাবি বললে,—হ, তু কি ডাক্তারী করছিস্—মা'টিকে সারাতে লারলি?

সেন পরিহাস করলেন,—তোর মা'র ডাক্তার ত নয়, আমি তোদের ডাক্তার —ওর কাছে হার মেনেছি—

সাবি বাসন-কোসন মেজে কাজ শেষ করবার আগেই রমলা উঠে এলেন। রমলা ইংরিজী করে জানালেন,—সাবি ওবেলা তাকে ফেলে রেখে যায়নি।

ডাক্তার বললেন,—এবেলাও তোমার কুশল নিতে সকাল-সকাল এসেছে।

দু'জনেই একমত, এমন আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা আজকাল দেখা যায় না। ওদের মাঝেই হয়ত দু'চারটে মাত্র এখনও আছে, যারা বর্তমানে সভ্য-জগতের হাওয়া পায়নি।

সাবি মাজা বাসন সিঁড়ির উপর রেখে প্রশ্ন করলো,—এ বেলা কেমন রইছিস্ মা?

—অনেক ভাল।

—তুরা কি বলছিস্, বুঝতে লারছি—

সেন বললেন,—ইংরিজিতে বল্‌ছি তুই বুঝবি কেমন করে?

—হ, ইংরিজি কে জানচে? তা ওয়া বল্‌লি কেনে?

—ওরকম আমরা বলি, যদি ভুলে যাই—ভাষাটা তাই।— রমলা আর ডাক্তার দু'জন হাসলেন।

সাবি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ডাক্তার বললেন,—তোদের ওখানে তিতির বেশী কোথায়?

—উ ভালকুড়ির বগলে জঙ্গলকে বিস্তর তিতির বটি, হোথা বসে থার্কবি,—

—তুই জায়গা দেখিয়ে দিতে পারিস্—

—হ,—হোথা ত রোজ কাঠ ভাঙ্গতে, পাতা ভাঙ্গতে যাচ্ছি।

রমলা বললেন,—তোর কাজ সব হয়ে গেছে?

—হ, মা, কাজ ত সব হইছে—

—তবে যা, কাল একটু দেরী করে আসবি,অত ভোরে উঠতে পারবো না।

—হ, তুর দেহটা ত ভাল লাই, ঘুমা কেনে—

সাবি চলে এল। বাড়ীতে এসে মায়ের নিকট গল্প করলো রমলার অসুখ, সুচ দেওয়ার কথা। তার পরে হেসে বললে,—উরা দু'টি, ফ্যাট্‌ফুট ইংরাজি বলছে মা। কিছু বুঝতে লারছি।

—বৌটি ইংরাজি বললেক ?

—হ,—খুব লিখা পড়া জান্‌ছে। উ কি রোগ বটি বল কেনে মা। তু জানছিস—

—না, ওয়া ত শুনছি না,—ও কোন্ রোগ আছ বটে, হেথা মোরা দেখি লাই। বুকে ব্যথা করবেক কেনে ?

—হ, ওই রোগ হইছে বটে। একদিনের রোগটিতে আধখানা হলেক —মোমের মত শাদাটি হলেক বটে। হাটতে লারছে—

—উ ত জানছি না। ওয়া ত পেটের রোগ বটি—বুকব্যথা হবেক কেনে ?

মা ও মেয়ে উভয়েই অনেক চিন্তা করে এটা কি বিস্ময়কর রোগ তা বুঝতে পারলে না। সাবি অবশেষে বললে,—কি ডাক্তার বটে ! কামিনের রোগ সামলাতে লারছে, উ সারাবে রোগ হাসপাতালকে !

—ওয়া বলিস্ না, সাবি। বড় ডাক্তার বটি, সব লোকে বলতে লেগেছে, উ ভাল বটি।

সাবি জবাব দিলে না—কিন্তু নিজের স্ত্রীকে যে আরোগ্য করতে পারেনি সে কিরকম ডাক্তার তা সাবি ভেবে পায় না। ডাক্তারের উপর শ্রদ্ধা তার একটু হ্রাস পেয়ে যায়।

*

বৈকালে কাঁকুড়গাছির দল যখন এলেন তখন ডাক্তার রমলাকে গৃহকর্ম্মে সাহায্য করছিলেন। ওয়ার্ড-সারভেণ্ট মধু এসে খবর দিল ওঁরা এসেছেন। রমলা বললো,—ওঁদের একদিনও কামাই নেই ? কাজকর্ম্মও নেই ?

ডাক্তার বললেন,—কাজকর্ম্ম সেরেই ত আসেন এখানে। ওঁরা জানবে কি করে যে তোমার অসুখ—

ডাক্তার উঠে একটা চাদর নিয়ে আড্ডায় যোগদান করতে যাবেন, তাই বললেন,—তুমি ত চা করতে পারবে না, মধু করে নিয়ে যাবে। তাই এককাপ অর্চ্চনাকে দিয়ে পাঠিয়ে পণ্ডিতের জাত মেরে দিও—

ডাক্তার এসে আড্ডায় যোগ দিতে হেডমাস্টার বললেন,—আজ সভায় প্রথম প্রস্তাব এই যে, আমরা কেউ আজ চা খাবো না।

আসন পরিগ্রহ করে ডাক্তার বললেন,—হেতু?

—শ্রীমান মধু মারফত আপনার বাসায় পীড়ার কথা শুনেছি, তা সত্ত্বেও যদি চা'র ব্যবস্থা হয় তবে আমরা এখানে আসা ছেড়ে দিতে বাধ্য হব।

পণ্ডিতমশায় বললেন,—রোজই চা দিতে হবে এমন কোন প্রয়োজন নেই।

মানুবাবু বললেন,—এর কোন মানে হয়? রোজই চা—

মণ্টুবাবু বললেন,—মানে আছে, মানু। চা না দিলে হয়ত ধীরে ধীরে খসে পড়বে, অথবা অনাকাঙ্ক্ষিত মনে করবে তোমরা। সেই ভয়ে ডাক্তার চা না দিয়ে পারেন না। তার এ কু-অভ্যাসটা ডাক্তারই করেছেন।

ডাক্তার বললেন,—অতএব দিয়ে খাইয়ে আমি অপরাধী।

হেডমাস্টার বললেন,—হ্যাঁ, বিড়ি খাওয়া যে বন্ধুতে শেখায় সে অপরাধী। এমন অভ্যাস হ'য়েছে—এই সময় চা না খেলে বাড়ীতে হাই ওঠে,—

মণ্টুবাবু বললেন,—আজ তাহ'লে চা-সম্বন্ধে গবেষণা হোক। মানুর কি মত?

মানুবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন, মধু ও অর্চ্চনা চা নিয়ে এল। সকলে তারস্বরে বললেন,—এসব কি ডাক্তারবাবু? বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে—ভদ্রমহিলাকে এমনি নির্য্যাতন ঘোর অন্যায়।

ডাক্তার চা'র কাপ তুলে নিয়ে বললেন,—বেশ, প্রথমতঃ আপনারা যে পীড়ার সংবাদ পেয়েছেন তা রয়টারের সংবাদের মত ভুল হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যদি আমার অন্ন বন্ধ না হ'য়ে থাকে তবে চা-ও বন্ধ হবে কেন? তৃতীয়তঃ, আপনাদের জানা উচিত কুড়িজন রোগীর নানাবিধ পথ্য তৈরীর ব্যবস্থা হাসপাতালে আছে। চতুর্থতঃ, মানুবাবুর চা-সম্বন্ধে মতটা কি?

সকলে হেসে উঠলেন। মানুবাবু বললেন,—যুক্তি প্রখর। আমার মত, যে লোক চা খায় না, সূর্যোদয়ের পূর্ব্বে ঘুম থেকে ওঠে, এবং রাত বারটার আগে শোয়, এবং বিকেলে বেড়াতে বেরোয় না—সে ভদ্রলোকই নয়।

মণ্টুবাবু টিকা করলেন,—পঞ্চম সর্ত হচ্ছে, যে কারণবারি পান করে না, ষষ্ঠ হচ্ছে—

ডাক্তার বাধা দিয়ে বললেন,—থাক্ থাক্,—আর নয়। পণ্ডিতমশায়ের মত—

পণ্ডিত বললেন,—সত্যি বলব? চা-পানের প্রথম কুফল অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ—এত অজীর্ণ রোগী পূর্ব্বে ছিল না। হয়ত হাইড্রোজেনেটেড অয়েলও হতে পারে তার কারণ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ব্যাপক চা-ব্যবহারের পূর্ব্বে এত চুলপাকা ছিল না। বাইশ চব্বিশ-বছরে চুল পাকছে আজকাল, আর দেখুন ষাট বছরে চুল পাকেনি আগের লোকের, দাঁত পড়েনি—

মাসুবাবু বললেন,—অর্থাৎ পূর্ব্বে যা ছিল সবই ভাল, এখন যা হয়েছে সবই খারাপ—

হেডমাস্টার বললেন,—কথাটা তা নয়, আগে যা হ'ত না, তা আজকাল হচ্ছে। কেন হচ্ছে, সেইটেই প্রশ্ন—চা, বা ওই তুলোবীজের ঘি হয়ত একটা কারণ হতে পারে সেইটে হচ্ছে কথা—তা ছাড়াও আজকাল শহর-বাজারে স্ত্রীব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়েছে খুব বেশী তারই বা হেতু কি? সন্তান-প্রসবের জন্য এত হাসপাতালও দরকার হয়নি তখন—

মাসুবাবু বললেন,—এসব রোগ বেড়েছে কে বললে? আগে চিকিৎসা হ'ত না, ডাক্তারবদ্যি ছিল না,—কে দেখতো খতিয়ে। কাজেই—মনে হয় ছিল না—কিন্তু ছিল ঠিকই তারা বিনা চিকিৎসায় মরতো,—কেন মরতো তা লোকে জানতো না—

মণ্টুবাবু বললেন,—কিন্তু একটা কথা, আগের লোক বেশীদিন বাঁচত, না, এখন লোক বেশীদিন বাঁচে? আগের লোকের গায়ে শক্তি বেশী ছিল না এখন বেশী শক্তি আছে—

—খেতে পায় না তারা—বাঁচবে কেন? শরীরে শক্তি হবে কোথা থেকে?

—খেতে পায় না কথাটা ভুল। তখন এক-তরকারী ভাত খেত, এখন পাঁচটা না হ'লে খায় না। কত রকমের নতুন খাদ্য এসেছে—চপ্-কাট্‌লেট, ডেভিল, ফ্রাই—মেঠাই—কিন্তু শক্তি কই?

ডাক্তার উস্কে দিলেন,—পণ্ডিতমশায় বলুন,—কেন এমন হ'ল?

পণ্ডিত বললেন,—আগে মেয়েরা ধান ভান্‌তো, চিঁড়ে কুটতো, জল আনতো কাজ করতো তাই—স্ত্রীব্যাধি ধার ঘেঁসতো না। পুরুষেও পরিশ্রম করত—অজীর্ণতা তাই ছিল না। আমরা বাবু হয়েছি মানে অলস হয়েছি, তাই ব্যাধি এসেছে—চা প্রভৃতি পানে হয়ত আলস্য বাড়িয়ে—

ডাক্তার বললেন,—দেখুন, আজকার একটা ঘটনা—সাবি বেটি যখন শুনলে আমার স্ত্রীর রোগ-বিবরণ—তখন সে যেন গাছ থেকে পড়ল। এমন রোগের কথা নাকি সে পূর্ব্বে শোনেনি—তাদের গাঁয়ে এমনটা দেখেনি কখনও—

পণ্ডিত বললেন,—ওরা যে পরিশ্রমী। নভেল প'ড়ে, উল বুনে দিন কাটায় না যে। সেটাকে পরমার্থও মনে করে না।

মণ্টুবাবু বললেন,—এ সম্বন্ধে আপনাদের মত অগ্রাহ্য, মানুর মতই গ্রহণীয়—

মানুবাবুর প্রতি মণ্টুবাবুর এই বার-বার কটাক্ষে মানুবাবু রুষ্টভাবে বললেন,—তার মানে ?

—শোনো মানেটা ধৈর্য্য ধরে। তুমি জমিদার—কিষাণ মাইন্দার কামিন তোমার বাড়ীতে অনেক লোক খেটে খায়, ওপাড়াটাই তোমার প্রজা ও কিষাণ। তুমিই ঠিক বলতে পারবে, কেননা অসুখ-বিসুখে তোমাকেই টাকা চড়া সুদে ধার দিয়ে উপকার করতে হয়।

মানুবাবু নির্ব্বাক হলেন কিন্তু শান্ত হলেন না। পণ্ডিত বললেন,—শারীরিক পরিশ্রমের অভাবেই—এমনটা হয়েছে।

—শিশুমৃত্যুর হার পূর্ব্বে বেশী ছিল না এখন বেশী !

মানুবাবু বললেন,—বলুন, সেটাও পূর্ব্বে ছিল। বাঁকারীর চাঁচি দিয়ে যখন নাড়ি কেটে ধনুষ্টঙ্কার হ'ত—

হেডমাস্টার বললেন,—সেটা এখনও হয়। তবে এর হার কিরূপ তা ডাক্তার বলবেন। এটুকু সত্যি, প্রসবকালে এত অনাসৃষ্টি দেখা যেত না।

ডাক্তার বললেন,—অর্থাৎ বিশ্বশু বীজম্ সেই প্রকৃতির থেকে দূরে গিয়েই যত বিঘ্ন জীবনে ?

সকলে হেসে উঠলেন। পণ্ডিত অসহায়ভাবে হেডমাস্টারের মুখের দিকে একবার তাকালেন। মানুবাবু বললেন,—হ্যাঁ এর কোন মানে হয় !

মণ্টুবাবু বললেন,—মানে হয় বৈকি। ছাগল, ভেড়া, গরুর জন্যে মাতৃ-সদন ত খোলা হয়নি এখনও, কদাচিৎ হয়ত একটু গোলমাল হয়, সে হাজার-দশহাজারে একটা—

ডাক্তার বললেন,—যাহোক্ এ সম্বন্ধে গবেষণা করার দরকার। বর্ত্তমানে মানুবাবুর মতটা চাপা পড়ে গেল। অর্থাৎ স্ত্রীব্যাধি ছোটলোকদের ভিতর কি রকম ?

মানুবাবু বললেন,—কে খোঁজ রাখছে ! রোগ হলেই কি ওরা জানায় বা চিকিৎসা করে ?

একখানা গরুর গাড়ী রাস্তা থেকে মোড় ঘুরে হাসপাতালে ঢুকলো। মানুবাবু বললেন,—এই হ'ল ! আচ্ছা এখানেই শেষ—

—না না, বসুন। আসছি।

ডাক্তার উঠে গিয়ে রোগীর সঙ্গের লোকটির সঙ্গে কথা ব'লে, রোগী হাসপাতালে ভর্ত্তি ক'রে বললেন,—বাসন্তীদেবী, আপনি আর টি. ডি. পরীক্ষা করে দেখুন কি ব্যাপার ?

ডাক্তার পুনরায় এসে বসলেন। —ওই লেবার কেস্—অবস্থা ভাল বলে মনে হচ্ছে না, রাত জাগাবে—

মণ্টুবাবু টিপ্পনী করলেন,—মাস্টারমশায়, দেখুন পাল্‌সেটিলা দিলে হয় না—

হেডমাস্টার বললেন,—পূর্ব্বে দিলে হাসপাতালে আসতে হ'ত না। হোমিওপ্যাথি হ'ল প্রকৃতির ওষুধ, মানে বিশ্বস্থ বীজম্-এর অংশ, তাই অ্যাটমের মত শক্তিশালী। অ্যাটমযুগে আর হোমিওপ্যাথিকে অস্বীকার করবার উপায় নেই—

মানুবাবু বললেন,—তা রমলাদেবীর ব্যাধিটা একবার চিকিচ্ছে করলে হয় না—

—ডাক্তারবাবু অনুমতি করলেই পারি। তবে ঠকাবার উপায় নেই। এক জ্যোতিষীর কাছে দিন দেখিয়ে শুভদিনে একজন কলকাতা এল চাকুরীর সন্ধানে। আর একজন জ্যোতিষ মানত না, সে অদিনে এল বাড়ী থেকে। যে লোক অদিনে এল, সে দুশো টাকা মাইনের চাকরী পেল, আর শুভদিনে যে বেরিয়েছিল তার ট্রামে ঠ্যাং কাটা গেল। জ্যোতিষকে যখন এ-কথা জিজ্ঞাসা করা হ'ল তখন তিনি বললেন—'দেখ বাবা, তোমরা ভুল করো না,—ও যদি দিন দেখে যেত তবে পাঁচশো টাকার চাকুরী হ'ত, আর তুমি যদি দিন না দেখে যেতে তবে তোমার গলাটাই কাটা যেত।' সেটা ত জানো না—হোমিওপ্যাথিতে যদি ভাল না হয়, তবে বুঝতে হবে ওটা আরও খারাপ হ'য়ে যেত—

সকলে হো-হো করে হেসে উঠলেন। বাসন্তীদেবী, এসে বললেন,—আপনি আসুন, ভাল নয় কেস্—

হেডমাস্টার উঠলেন। মানুবাবু বললেন,—বাসন্তীদেবী খুব খারাপ পজিশন নাকি ?

বাসন্তীদেবী বললেন,—বুঝছি না।

ডাক্তার উঠলেন। মণ্টুবাবু বললেন,—ওসব ব্যাপারে যেওনা মানু, ভাল নয়—

চলতে চলতে মণ্টুবাবু বললেন,—মানু, ওসব দিকে যেও না, ডাক্তার লোকটা বড় কড়া, হাসপাতাল স্টাফ ওর ভয়ে কাঁপে, শেষে তোমার কপালেও কম্পন হবে—

মানুবাবু বললেন,—ওই ত তোমার দোষ, আমি কি সবই খারাপ করি? সব কথা কাজই খারাপ—

—তা নয়, তবে স্বভাব ত সহসা মোড় ফেরে না—

মানুবাবু চটে গিয়ে বললেন,—না, আমি আর আসবো না তোমাদের সঙ্গে। নিজের ইজ্জত থাকে না।

—যদি আসতে হয়—মাস্টারমশায়দের সঙ্গেই এসো, একা এসো না—তা না হলেই বেইজ্জত হবে।

পণ্ডিতমশায় বললেন,—থাক্ থাক্, ও সব থাক্। কথা মাজলে মোটা হয়, দড়ি মাজলে সরু হয়—

হেডমাস্টার বললেন,—আচ্ছা, আমি বেলেডোনা দিয়ে দেব একদাগ,—সব সেরে যাবে।

ওঁরা হাসতে হাসতে কাঁকুড়গাছির দিকে রওনা দিলেন। কাঁকুড়গাছি কোলিয়ারীর ইঞ্জিন ধ্বস ধ্বস শব্দ করছে কেবল। ডুলি-ওঠা-নামার ঘন্টি শোনা যাচ্ছে—নীরব মাঠের উপর দিয়ে চলতে চলতে শব্দটা যেন বড় হয়ে কানে বাজছে। ভালকুড়ির পাদদেশে খ্যাঁকশেয়াল অদ্ভুত শব্দ করছে 'ফেউ ফেউ'—হয়ত বা কোন হিংস্র পশুর আগমন হয়েছে পাহাড়ে।

সভ্যজগৎ আর আদিম ঘোড়ামারার মাঝে এই হাসপাতাল।

*

রমলা ভাল হয়ে গেলেন তিন দিনেই—

হাসপাতালে দু'তিনটি রোগিণী নিয়ে ডাক্তারকে বড়ই ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল,—তার মধ্যে একটি মরে গিয়ে নিষ্কৃতি দিয়েছেন, আর দুটি বেঁচে উঠে ডাক্তারের কাজের লাঘব করেছেন। আজ দু'দিন কাঁকুড়গাছির দল আসেননি, ডাক্তারও খবর পাননি কিছু। ডাক্তার বিকালে কাঁকুড়গাছির রাস্তা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন এবং মনে মনে ভাবছিলেন অনেক কথা। তাঁর ব্যক্তিগত একটা ভাল মাইক্রোস্কোপ ছিল। গবেষণা করবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা হয়নি। ডাইরীতে লেখা প্রশ্ন নিয়েই তিনি ভাবতে ভাবতে কাঁকুড়গাছির দিকে যাচ্ছিলেন। তুলনা করে যেন মনে হয় নগরেই রোগ বেশী, গ্রামে রোগ কম, এই প্রায় এক বছর হতে চললো ওই সাবিদের কেউ হাসপাতালে আসেনি,—

কেবল বর্ষায় জল নিয়ে মারামারি করে মাথা ফাটিয়ে এসেছিল দু'চারজন। কেন? এরা নোংরা ঘরে থাকে, পুকুরের জলও খায়, খাবারও পেট ভরে পায় না। এ ত চাক্ষুষ সত্য,—শহরে সমস্ত সুবিধা রয়েছে,তথাপি রোগ বাসা বেঁধেছে সেখানে। এদের রোগই হয় না, না রোগের চিকিৎসা করে না? সাবির দেহের ওই লাবণ্য ও শক্তির পিছনে কি আছে,—ওর দেহটাকে পরীক্ষা করে দেখলে বোঝা যায় হয়ত।

ডাক্তার সামনের দিকে চেয়ে দেখেন কে যেন আসছেন এদিকে। আরও এগিয়ে গিয়ে চিনলেন—পণ্ডিতমশায়। ডাক্তার প্রশ্ন করলেন,—এই যে পণ্ডিতমশায়? হঠাৎ সব ডুব দিলেন, ব্যাপার কি? আর সব কোথায়?

পণ্ডিতমশায় বললেন,—মাস্টারমশায় জুরীতে গেছেন, মানুবাবু তাঁর শিবপুর কাছারীতে গেছেন ধান আদায় করতে। সেখানে ধান কাটার সময় হল। আর মণ্টুবাবু তাঁর কণ্ট্রাক্টরীর ব্যাপারে কোথায় যেন গেছেন। আর আমি একা তাই যাইনি—

—ও, একা ভয় করছে বুঝি—

—না,—ঠিক···

—বুঝেছি, রাত্রে একা ফিরতে ভয় হয়—

—ভয় কি, জ্যোছনা রাত্রি, ভয়ের কিছু নেই। তবে একা ত আর আড্ডা হয় না? হাসপাতালেও সব জরুরী রোগী। আপনি ব্যস্ত আছেন—

—বেশ, তবে চলুন—এখন ব্যস্ত নেই—

পণ্ডিতমশায় একটু ইতস্ততঃ করে বললেন,—চলুন।

দু'জনে ফিরে এলেন, কথা বলতে বলতে। পণ্ডিতমশায় এখানকার প্রাচীন লোক। ডাক্তার তাঁর কাছে এদেশের সম্বন্ধে খোঁজ নিতে নিতে হাসপাতালে এসে পৌঁছে গেলেন। ডাক্তার বললেন,—একটু শীত পড়েছে, চলুন অফিস-রুমেই বসি—

অফিস-রুমে ওঁরা বসলেন, চাও এল। ডাক্তার প্রশ্ন করলেন,—আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, বর্তমান যে সভ্যতা সেটা সত্যিই ক্ষতিকর হয়েছে—এত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, এত সুখ-সুবিধে।

পণ্ডিত বললেন,—দেখুন ডাক্তারবাবু, আমার বিদ্যেবুদ্ধি কম, সংস্কৃত কিছু পড়েছিলাম—বর্তমান যুগ, বিজ্ঞান বা পাশ্চাত্ত্য দর্শন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞানই নেই। তবে আড্ডায় পড়ে দু'চারটে কথা বলি, বিশেষতঃ প্রগতিবাদী মানুবাবুকে একটু চটাতে—আমার মতের মূল্য কি?

ডাক্তার বললেন,—আমার মতেরই বা মূল্য কি? দু'খানা ডাক্তারী বই পড়েই কি আমি সব জানি? তবুও আপনার কি মনে হয়—

পণ্ডিতমশায় বললেন,—এ আলোচনা অন্ধের হস্তিদর্শনের মত হবে। কয়েকজন অন্ধ হস্তী দেখতে গিয়েছিল। একজন শুঁড়ে হাত দিল, একজন কানে, একজন গায়ে, একজন পায়ে—তার পরে তাদের তর্ক। একজন বললে হাতী সাপের মত, আর একজন বললে কুলোর মত, আর একজন বললে দালানের থামের মত। মহা গোল বেধে গেল। অথচ সকলের কথাই আংশিক সত্য, কিন্তু মোটের উপর ভুল।

—কিছুটা সত্যই হোক না—ভগবান ছাড়া সত্যকে কে জানতে পারে?

পণ্ডিতমশায় বললেন,—এই বৈজ্ঞানিক যুগের আগে, মানে, নাগরিক সভ্যতার পূর্ব্বে মানুষের আয়ু ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, শক্তি ছিল, বর্ত্তমানে তা নেই। তাদের চরিত্র ছিল, সততা ছিল, মনের উদারতা ছিল,—কর্ত্তব্যজ্ঞান দায়িত্বজ্ঞান বিশ্বস্ততা ছিল—এখন নেই। যদি এটা ভালই হয়, তবে এসব ত আরও উন্নত হওযা উচিত। তা হয় না দেখেই সন্দেহ হয়—তবে আমরা সেকেলে প্রাচীন-পন্থী, আমাদের দৃষ্টিটা হয়ত কামলা-রোগীর মত হলদে।

—হোক্ ভুল, তবুও এর কারণ কি মনে হয়?

—মনে একটা হয় বৈকি। ধর্ম্মকে আমরা ত্যাগ করেছি,—লৌকিক ধর্ম্মাচার সমাজ রক্ষার জন্যে; আত্মিক উন্নতির জন্য নয়। বর্ত্তমান শিক্ষায় আমরা ধর্ম্মকে ভুলেছি, লৌকিক সংস্কার যা সমাজের মেরুদণ্ড, তাকে তুচ্ছ করেছি, তার ফলেই অর্থকে পরমার্থ মনে করে মনুষত্ব বিসর্জ্জন দিয়েছি। তার ফল এই—আদ্যাপ্রকৃতি মহামায়াকে ত্যাগ করেছি বলেই প্রকৃতির নিয়মে আমাদের নিধন হচ্ছে।

—কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সমাজ সম্বন্ধে যা শুনি তাতে তাদের স্বাস্থ্যও আছে, আয়ুও আছে, সততা কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রভৃতিও আছে।

—হ্যাঁ, শুনেছি আছে। থাকা সম্ভবও। কারণ তাদের সমাজ তাদের প্রকৃতি নিয়ে গড়ে উঠেছে, তারা ভ্রষ্ট হয়নি, কিন্তু আমরা ভ্রষ্ট হয়েছি প্রকৃতি থেকে—কাজেই পাতিত্য দোষে আমাদের এই শাস্তি।

ডাক্তার সিগারেট ধরালেন, তারপর চিন্তা করে বললেন,—তার মানে আপনি বলতে চান, কমলালেবুর চারা এনে যদি নিম্নবঙ্গে লাগানো যায় তা যেমন বিশ্রী টক হয়, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাও তেমনি টক কমলালেবু হয়েছে আমাদের দেশে—

—হ্যাঁ, ওই ত ব্রাত্যদোষ, প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত হলেই তা ভীষণাকার হয়—যেমন মহিষাসুর, রক্তবীজ হয়েছিল এবং মহামায়ার প্রভাবেই হত হয়েছিল। অর্থাৎ প্রকৃতির বলেই তার নিধন হবে। আসুরিক শক্তি নিয়ে স্বর্গ জয় করা যায় বটে, কিন্তু স্বর্গ প্রতিষ্ঠা করা যায় না, তা ভোগও করা যায় না—প্রকৃতির নিয়মে ধ্বংস হতে হয়।

ডাক্তার কিছুক্ষণ ভেবে বললেন,—কি পরিহাস! আজ ভারতবর্ষে একটু খাঁটি দুধ কি ঘি মেলে না। খাঁটি ওষুধ, খাঁটি তেল জোটেনা। অথচ এই সেদিন ঘি-দুধ মিলত কত! গরুই বা গেল কোথায়? দুধই বা গেল কোথায়? ও দেশে ত পাওয়া যায়। খাঁটি ঘি করতে গেলে অস্ট্রেলিয়ান মাখন জ্বাল দিয়ে তবে পাওয়া যায়।

পণ্ডিত বললেন,—আমাদের দেশে একদিন পাওয়া যেত সত্যি, সেদিন লোকের ধর্ম্মভয় ছিল—পাপ হয় বলে লোকে ভেজাল দিত না,কারণ আমাদের সমাজ ধর্ম্মাশ্রিত। ওদের দেশে পাওয়া যায় হয়ত তার কারণ এই যে, ওদের সমাজ বোধশক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি-আশ্রিত। অর্থাৎ ভেজাল দিলে দেশের লোকের ক্ষতি হবে এই বিবেচনা থেকেই হয়ত ওরা ভেজাল দেয় না। এখানে প্রকৃতির পার্থক্য রয়েছে—প্রকৃতি-বিচ্যুত হলেই আসুরিক শক্তির প্রাদুর্ভাব হবে। আমরা ধর্ম্মাচারকে ত্যাগ করেছি, বিবেচনা অর্জ্জন করিনি—অর্থাৎ জীবন অপ্রাকৃতিক হ'য়ে গেছে।

—সাবিদের মধ্যে সততা, মমতা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি কি করে থাকলো—

—ওরা ত প্রকৃতির জাব। ওদের সমাজ ধর্ম্মাশ্রিত, ওরা সভ্য হয়নি তাই। ওদের মধ্যে যারা কোলিয়ারী বা কলে কাজ করে তাদের মত পাজি আর অসৎ কেউ নেই। শুধু তাই নয়, তাদের রোগের অন্ত নেই, স্বাস্থ্য নেই—পঞ্চাশ বছরের বুড়ো কেউ নেই। গ্রামে ওদের মোড়লের কথা অকাট্য, কেউ তা অমান্য করে না—তা ভুলই হোক আর নির্ভুলই হোক। আর এই স্কুলেই দেখুন—ছাত্র, শিক্ষক, কমিটি-মেম্বর সকলেই মোড়ল, অর্থাৎ সকলেই পতিত।

ডাক্তার কিছুক্ষণ ভেবে প্রশ্ন করলেন,—আচ্ছা, শ্রীশ্রীচণ্ডীর সার মর্ম্ম কি? আমি ত চণ্ডী পড়িনি কখনও—

—সার মর্ম্ম অর্থাৎ গল্পাংশ এই যে, আদ্যাপ্রকৃতি মহামায়া দেবগণকে রক্ষার্থে যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'য়ে অসুর বিনাশ করেছেন—এর বেশী কিছু নেই। কিন্তু আমি যা বুঝি সেটা হচ্ছে এই যে—মহামায়াই বিশ্ব-প্রকৃতি-সৃষ্ট জগতে

পরিব্যাপ্ত। প্রবল আসুরিক শক্তি মানুষের মধ্যে যুগে যুগে প্রাদুর্ভূত হয়েছে, তারা দেবগণ অর্থাৎ সত্যাশ্রয়ী, প্রকৃতির পূজারীকে জয় করেছে—সংক্ষেপে প্রকৃতিকে জয় করে শক্তিশালী এবং সুখী হতে চেয়েছে, কিন্তু প্রকৃতির বিধানেই তারা পরাভূত হ'য়ে বিলীন হ'য়ে গেছে—যেমন মাস্টারমশায় বলেন, আসুরিক শক্তি নিয়ে আজ যারা হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করেছে তারা একদিন বিষাক্ত প্রকৃতির কাছেই পরাভূত হ'য়ে নিধানপ্রাপ্ত হবে—শুম্ভ-নিশুম্ভের মত। যা কল্যাণকর নয় তাইত আসুরিক।

—তার মানে, প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত হ'য়ে নগর গড়ে উঠেছে বলেই তাতে ব্যাধি ও অসততা বেশি?

—হবে। আমি মাঝে মাঝে ভাইএর বাসায় শহরে যাই, কিন্তু প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। মাঠ নেই, মাটিতে পা দিতে পারি না,—সব পাথর-ইঁট, শিশির লাগে না পায়ে, রোদ লাগে না গায়ে। শরীর খারাপ হয়ে ওঠে—

আপনার দেহে রোগব্যাধি কি হয়েছে এর আগে—

—জ্ঞানে যতদূর জানি, জরজারি আমাশা ছাড়া বড় ব্যাধি কিছু হয়নি। রোদে বৃষ্টিতে মাঠে ঘাটে বেড়াতে হয়, কারণ চাষও আছে নিজের, যজনযাজনও আছে—সেইজন্যেই বোধ হয় রোগব্যাধি বিশেষ নেই। বসে থাকবার সময়ই নেই। বাড়ীতেও মেয়েদের ধানভানা, জল-আনা সবই করতে হয়—রোগব্যাধি হলে চিকিৎসা করবার পয়সা নেই বলেই বোধ হয় মহামায়া রোগ দেন না—

ডাক্তার সন্দেহের সঙ্গে বললেন,—গ্রামে কি রোগ নেই?

—আছে বৈকি। গ্রাম ত নগরের প্রভাবমুক্ত নয়। শহর থেকে রোগ নিয়ে লোক গ্রামে আসছে। শহরে টাইফয়েড বসন্ত, টি-বি হ'ল, পালিয়ে এল গ্রামে। গ্রামে ও রোগটা ছড়াল। কাজেই প্রভাবমুক্ত কোন গ্রামই নেই। ওই ঘোড়ামারার মত দু'চারটা গ্রাম ছাড়া। আপনার হাসপাতালের রোগীদের একটা হিসাব রাখলেই দেখবেন—আধুনিক রোগ সব শহর থেকে আমদানী হ'য়েছে—স্নো-পাউডার রেডিও-সিনেমার মত—

ডাক্তার ভাবলেন কিছুক্ষণ, তার পর বললেন,—মানুষের কথা ছেড়ে দিন। গরু ত আছে—সেই গরু ত প্রকৃতির জীব-ই বটে। শুনি গরুর দুধ একসেরের বেশী হয় না। কিন্তু আগে হত কি করে? সে দুধে মাখনও থাকতো—

পণ্ডিতমশায় বললেন,—কারণ বিনা কার্য্য হয় না। আছে বৈকি কারণ। আমরা দেখেছি পূর্ব্বে মাঠে ভাগাড় বা হালট ছিল—বিশ-বাইশ হাত চওড়া,

তাতে গরু চরত, ঘাস খেত। দু'পাশের জমি যাদের তারা ধীরে ধীরে সেটাকে গ্রাস করে এখন আধহাত করেছে। তা ছাড়া আ'লগুলো দু'এক হাত চওড়া থাকতো, সে ঘাসও কেটে গরুকে খাওয়ানো হত। সে আ'ল আজ দু'ইঞ্চিতে এসেছে। এখন ত ঘাস-কাটা উঠে গেছে, শুকনো খড় ছাড়া কিছু নেই। পূর্ব্বে ঘাস-কাটা একটা প্রধান কাজ ছিল গৃহস্থের—

—গ্রামের স্বাস্থ্য খারাপ হ'য়ে গেল কেন?

—হবে না কেন? গ্রামের দুধটুকু ছানা হ'য়ে শহরে চলে যাচ্ছে মিঠাই হতে। গ্রামে দু'সের দুধ জোগাড় করতে কালঘাম ছুটে যাবে। আগে ছোলা, আখের গুড় খেয়ে লোকে মাঠে বেরুত; এখন দুধ-বিক্রির পয়সায় চা-মুড়ি তেলেভাজা খায়—

ডাক্তার চুপ করে সিগারেটে টান দিলেন। পণ্ডিতমশায় বললেল,—রাত হ'ল, উঠি। এ সব আলোচনায় লাভ নেই, যুগের গতি কে রোধ করবে?

ডাক্তার বললেন,—দাঁড়ান, পণ্ডিতমশায়। একটু ব্রহ্মরক্ত নেব আজ!

ডাক্তার একখানা স্লাইড বের করে এনে পণ্ডিতমশায়ের আঙুলে একটা নীড্‌লের খোঁচা দিয়ে একফোঁটা রক্ত নিলেন স্লাইডে।

পণ্ডিতমশায় বললেন,—রক্তের পরীক্ষায় কি পাবেন? বিজ্ঞানে কি প্রকৃতির রহস্য ধরা পড়ে?

—তথাপি। আর একদিন একটু রক্ত বেশী পরিমাণ নেব।

পণ্ডিতমশায় চলে এলেন। ডাক্তার মাইক্রোস্কোপের নীচে স্লাইডখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, রেখে দিলেন—দিনে না হলে সুবিধে হবে না। সেদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসে বসে ডাক্তার অনেক কিছু নোট করলেন। রমলা বললেন,—কি এত লিখছ আজ?

—ও, তুমি জেগে আছ? দাঁড়াও—একটা স্লাইডে একটু রক্ত নেব।

ডাক্তার রমলার আঙুল থেকে একটু রক্ত নিয়ে স্লাইডে রেখে দিলেন স্টেন করে।

ডাক্তারের মনে একটা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল অত্যন্ত উদগ্রভাবে দেখা দিয়েছিল। তিনি রক্তপরীক্ষা শুরু করলেন—

*

বেশ শীত পড়েছে। পশ্চিম-উত্তরের ভালকুড়ি পাহাড় থেকে যখন হাওয়া ছাড়ে তখন হাড়ে কাঁপুনি লাগে। জগৎপুরের এই ডাঙাটার উত্তর-পশ্চিমে কোন গাছপালা বা বাধা নেই। কাজেই শীতটা যেন খুবই বেশী মনে হয়—

অগ্রহায়ণের শেষ হ'য়ে এসেছে। সকাল-সন্ধ্যায় সমস্ত শীতবস্ত্র পরেও শীত মানায় না। মাঝে মাঝে আগুন না পোহালে চলে না। ভালকুড়ির উপরে সবুজ গাছগুলোর পাতা ঝরতে শুরু করেছে, তার ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় পাথরে সকালের রোদ ঝিকমিক করে। কোথায়ও পাথরের মাঝে অভ্র আছে, সেখানটাও ঝিকমিক করে। কিন্তু ওদিকের দরজা-জানালা খুলে সেইটার দিকে চাইবার উপায় নেই, হাওয়ায় কাঁপাতে থাকে।

সকালে উঠতে ইচ্ছে করে না, লেপ ছেড়ে উঠতে হ'লে কষ্ট হয়। ডাক্তার, রমলা, অর্চ্চনা তাই ভোরে জাগলেও উঠতে চান না। শুয়ে শুয়ে পাখীর ডাক শোনেন, ভালকুড়িতে তিতির ডাকে। বটগাছটায় বসে কাক ডাকে, বাঁধের উপরে বক ডাকে। পূবের দিকটার ছিদ্রপথে যখন রোদ এসে ঘরে পড়ে তখন তাঁরা ওঠেন, তার পর জল গরম হলে হাতমুখ ধুয়ে রোদে বসে চা খান। শীতকালে রোগ ও রোগী কম—ডাক্তার একটু বেলাতেই হাসপাতালে যান—একটু জ্বর-কাশি, কদাচিৎ এক-আধটা নিউমোনিয়া-রোগী মাত্র। হাস-পাতালের বিছানাও প্রায় খালি—কেবল মাতৃসদনে দু'একটি প্রসূতি আছেন—

সেদিন ডাক্তার জেগে শুয়েছিলেন লেপ আশ্রয় ক'রে, রমলাও শুয়ে শুয়ে গল্প করছিলেন।

সূর্য্যোদয় হয়-হয় সাবি এসে ডাকলো,—মা, উঠ্‌না কেনে, বেলা হইছে বটে—

রমলা উঠে, আলোয়ান জড়িয়ে জুতো পায়ে দিয়ে বাইরে এসে দেখেন, সবে সূর্য্য উঠছে। একটু বিরক্ত হ'য়ে বললেন,—যত শীত পড়ছে, তুইও ততই সকালে আসছিস্, এত সকালে ওঠা যায়—

ডাক্তারও উঠে এলেন। সাবি এসেছে, খালি পা, শিশিরে পা ভিজে এক পর্দা কাদা জমেছে তার উপর। আঁচলটা গায়ে দিয়েছে মাত্র।

সাবি বললে—হ, বাসন বের কর কেনে? তাড়াতাড়ি যাবেক। আজকাল ত সকালকেই আসবেক বটে—ধান কাটা লেগেছে বটি—

ডাক্তার বললেন,—এমনি সময়েই আসবি রোজ—বলিস্ কি?

—হ্যাঁ বটি, ধান কাটবেক—

—কখন কাটবি?

—তুর কাজ করবেক,—হোথা মাঠে যাবেক, দু'পণ ধান কাটবেক ত ঘরকে যাবেক—হোথা রোজ পাবেক, ধান পাবেক। বছরটি রইছে—ধান ঘরকে লিবেক নাই—

রমলা বললেন,—অর্থাৎ শীত থাকতে ও-বেটি এইরকম ভোরে এসে জ্বালাবে—আজ থেকে রান্নাঘরের চাবি বাইরে ওকে দেখিয়ে রেখে দেব, ও এসে ঘর খুলে কাজ আরম্ভ করবে—

সাবি উনুনে আঁচ দিয়ে কাজ সুরু করে দিয়েছে। জল গরম হলে ডাক্তার মুখ ধুয়ে এসে চা নিয়ে বারান্দার রোদে চা খেতে বসলেন। সাবি যেখানটায় বসে বাসন মাজছে সেখানে দেয়ালের ছায়া পড়েছে—সাবি তাড়াতাড়ি বাসন মাজছে—

চা দিয়ে রমলা বললেন,—সাবি, চা খেয়ে নে—

সাবি এসে উঠোনে চা খেতে বসল। ডাক্তার বললেন,—সাবি, তোর একটু রক্ত নেব—

—কেনে লিবি বল কেনে—হ, ডর লাগছে বটি—

—সে নেব'খন।

ডাক্তার উঠে এলেন একটা নীড্‌ল্‌, অ্যালকোহল ও স্লাইড নিয়ে। সাবির আঙুল থেকে একটু রক্ত নিয়ে রাখলেন স্লাইডে। তার পর বললেন,—বস্‌, আর একটু কাজ আছে—

ডাক্তার স্টেথিস্কোপ নিয়ে সাবির বুক ও হৃৎযন্ত্র পরীক্ষা করলেন, নাড়িটাও অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন।

সাবি বললে,—মোর কি রোগ হইছে বটি? মোকে কি দেখবি?

—দেখব অনেক কিছু—তুই বুঝবি না।

—হ, ওয়াতে কি দেখবি? তাড়া রইছে, ধান কাটবেক—বসবেক লাই—সাবি হেসে বললে,—হ, মোর রোগ রইছে—ওয়াতে কি দেখবি?

সাবির কাছে এগুলো ডাক্তারের নেহাত একটা পাগলামি-ই। রোগ নাই অথচ ডাক্তার খামকা তার পরীক্ষা করে কেন?

ডাক্তার বললেন,—এত ভোরে আসিস, তোর শীত করে না?

—শীত ত রইছে, লাগবেক ত বটেই। সকলে উঠ্‌, তাড়াতাড়ি হাঁট কেনে, শীত কোথা পালাবেক। শীতকে কাজ কর, শীত তুকে ধরতে লারবে—বসবি ত শীত তুকে ধরবেক। ঐ নকুড় রইছে না—আগুন লিয়ে বসে রইছে, নড়বেক নাই—শীত উয়ারে ধরেছে বটে—

ডাক্তার অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে সাবিকে দেখলেন। সাবি দু'ঘণ্টার কাজ একঘণ্টায় সেরে দিয়ে চলে গেল, তাড়াতাড়ি মাঠে যেতে হবে ধান কাটতে।

ডাক্তার হাসপাতালে যাবেন,—রমলা বলল, সাবিকে কি দেখ বল ত রোজ ? ওকে এতক্ষণ ধরে কি পরীক্ষা করলে ?

ডাক্তার হেসে বললেন,—সন্দেহ হচ্ছে নাকি ? জান ত, একটা রিসার্চ করছি—ও বেটির শীত নেই রোগ নেই কেন ?

—কথা জিজ্ঞাসা করলেই সন্দেহ করা হল ?

—ভাবটা যেন তেমনই মনে হল—যাক্। ওদের জীবনযাত্রা যতই দেখছি ততই যেন একটা রহস্য ঘনীভূত হ'য়ে আসছে। বর্ত্তমান সব মেডিকেল থিওরী যেন গরমিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে—

—এইখানে করবে তুমি রিসার্চ ? এই হাসপাতালে ?

—কলকাতায়—রিসার্চ হচ্ছে রোগের, আমি এখানে রিসার্চ করবো সুস্থতার। যারা সুস্থ-সবল তাদের মাঝে কি বিশেষত্ব আছে। একটা কিছু আছেই. নইলে এমন হয় কেন ? পণ্ডিতমশায় বলেন, গত কুড়ি-বাইশ বছরে তাঁর কোন রোগ নেই। লোকটা দু'বেলা দুটি ভাত খান আর পুজো-আর্চা, একাদশী-পূর্ণিমায় মাসে আট-দশদিন উপবাস। মাংস ডিম খান না। প্রাথমিক পরীক্ষার পর কিছু কিছু রোগ-বীজাণু ইন্‌জেকশন করে দেখতে হবে।

—সেকি ! শেষে মরে যাবেন—ওসব কাজ করো না। রিসার্চ করবার লোকের অভাব নেই—

—না, এমন রোগের বীজাণু দেব, যার ধ্রুব ওষুধ আছে।

রমলা বললেন,—তোমার ত আচ্ছা বাতিকে ধরেছে, শেষে মানুষ খুন করতে সুরু করবে—

—সকলেই করে। যারা মাথায় বাড়ি দিয়ে মারে তাদের বিচার হয়, অন্য উপায়ে মারলে বিচার হয় না। ব্রহ্মচারী যখন কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কার করলেন তখন লোকে বলত তিনি হাজার লোক মেরে ফেলেছেন—তার উত্তরে তিনি বলতেন,—যদি হাজার মেরে থাকি তবে লাখো-লাখো বাঁচিয়েছি এ-কথাও সত্য।

—তুমি তাই করবে নাকি ?

—অতবড় স্পর্দ্ধা নেই, তবে ক্ষতি না করে যতদূর হয়—

*

ডাক্তার সেন কয়েকদিন ধরে নিজের, রমলার, সাবি ও পণ্ডিতমশায়ের রক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। অনেক নোট্ও করলেন এই নিয়ে। পণ্ডিতমশায়

একদিন এসেছিলেন, তাঁকে নিয়েও অনেক পরীক্ষা করলেন। নাড়ী দেখলেন, বুক-হৃৎপিণ্ড সব দেখলেন। হার্টের রোগী কয়েকটা তিনি পূর্ব্বে দেখেছেন, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন,—প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি দেখলেন; অনেক প্রশ্নও করলেন।

কয়েকদিন বৈকালিক আড্ডা বন্ধ আছে. কেউই আসেননি। অনেকেই বাড়ীতে নেই—তাই পণ্ডিতমশায় আসেন না। শীতও পড়েছে। ডাক্তারের গবেষণা চলছে দ্রুত—

সেদিন আবার সদলে সকলে এসে হাজির হ'লেন। মানুবাবু ওভারকোট চড়িয়েছেন, মণ্টুবাবু শীতের জামার সঙ্গে মাথায় কম্ফোর্টার বেঁধেছেন, মোটা চাদর জড়িয়েছেন। হেডমাস্টার কম্ফোর্টার দিয়ে মাথা গলা জড়িয়ে বেঁধেছেন, পণ্ডিতমশায় কেবল চাদরটা মাথায় তুলে দিয়ে গায়ে জড়িয়েছেন।

ডাক্তার তাঁদের অভ্যর্থনা করে বললেন,—আসুন আসুন! এতদিন আপনাদের বিহনে ডাঙা কেঁদেছে।

মানুবাবু বললেন,—বেশ শীত পড়েছে—

সকলেই একবাক্যে সে-কথা স্বীকার করলেন। ডাক্তার ব্যঙ্গ করলেন,— পণ্ডিতমশায় সর্ব্বাপেক্ষা শীর্ণকায় অথচ ওঁরই কেবল শীত নেই দেখছি—

পণ্ডিতমশায় বললেন,—কম্ফোর্টার থাকলে জড়াতাম, নেই বলেই জড়াইনি।

—অফিস-ঘরে বসে আড্ডা হবে চলুন, আজ আর বাইরে বসা চলবে না।

পণ্ডিতমশায় বললেন,—আবার ব্রহ্মরক্ত পান করতে চাইবেন ত!

মানুবাবু বললেন,—সে কি?

ডাক্তার বললেন,—সত্যি পান অবশ্য করিনি, তবে একফোঁটা রক্ত নিয়েছি সত্য—

মানুবাবু বললেন,—আমি হলে পান করতুম, এই ব্রাহ্মণ জাতি এতদিন সমাজের বুকে বসে সকলের রক্ত পান করেছে, আজ আমরা দু'এক ফোঁটা চেটে দেখলে তাতে আর ক্ষতি কি?

হেডমাস্টার বললেন,—ছি ছি, চাটবেন কেন? চাটাচাটিটা অন্য ইতর প্রাণীর ব্যাপার—

আড্ডা বসল। মধু চা নিয়ে এল। অর্চ্চনা পণ্ডিতমশায়ের চা আনলো। পণ্ডিত বললেন,—এই শীতে এই মেয়েটাকে আমার জন্য কেন কষ্ট দেন,— যার প্রয়োজন নেই।

মণ্টুবাবু বললেন,—ক্ষতি কি, আমাদের ত দেব-দ্বিজে ভক্তি নেই, যদি ওদের একটু হয় ভবিষ্যতে। হোক না—

মানুবাবু বললেন,—ঐ কুশিক্ষাটি না দেওয়াই ভাল—ওরা যেন মানুষকে শ্রদ্ধা করে, ব্রাহ্মণকে যেন না করে—

পণ্ডিত শ্লেষ করলেন,—মানুষকে শ্রদ্ধা করুক, ব্রাহ্মণকে না করলে দুঃখ নেই—কিন্তু স্বর্ণকে যেন দেবতা না ভাবে—এবং স্বার্থকে যেন সার না করে—

হেডমাস্টার বললেন,—তা ডাক্তার সেন, হঠাৎ আমাদের অনুপস্থিতিতে ব্রহ্মরক্ত পান করলেন কেন ?

ডাক্তার তাঁর গবেষণার কিছু কিছু জানালেন। বললেন,—চারটা রক্ত পরীক্ষা করলাম—দেখি কি তফাৎ—

—কি তফাৎ দেখলেন—

—তফাৎ ত কিছু দেখলাম না। কোন তফাৎই এখনো পর্য্যন্ত ধরা পড়েনি—

মানুবাবু বললেন,—ব্রহ্মরক্তে একটু দেবতার ব্যাসিলাই দেখলেন না ?

পণ্ডিত বললেন,—সে কি আর মাইক্রোস্কোপে দেখা যায়—অত্যন্ত সূক্ষ্ম সেটা, স্থূল মাইক্রোস্কোপে ধরা যাবে কেন ?

মণ্টুবাবু বললেন,—সেটা নিরাকার ব্রহ্ম,—ওর সাকার রূপ হয় না।

হেডমাস্টার বললেন,—যেমন ভগবান প্রত্যক্ষ নয়- সৃষ্টিটা প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ বিজলি-বাতিটাকে আমরা দেখতে পাই কিন্তু বিদ্যুৎটাকে দেখতে পাই না, অথচ বাতিটা বিদ্যুতের প্রকাশ। সৃষ্টিটা তেমনি ভগবানের প্রকাশ। বিদ্যুৎ নিরাকার, বাতিটা সাকার। ব্রাহ্মণত্বটা নিরাকার কিন্তু ব্রাহ্মণ সাকার—

পণ্ডিত বললেন,—ততোধিক সাকার হচ্ছে পূজার দক্ষিণা—সেটা নিরাকার নয়।

সকলেই হেসে উঠলেন। দরজাটা খোলা ছিল—দেখা গেল বাসন্তীদেবী যেন হঠাৎ দরজার পাশ থেকে সরে গেলেন। ডাক্তার ডাকলেন,—বাসন্তীদেবী !

বাসন্তীদেবী একটু হাসতে হাসতে ঘরে এলে ডাক্তার গম্ভীরভাবে বললেন, —আপনার কিছু কথা আছে ? রোগীদের সম্বন্ধে—

—না—

—আচ্ছা। তবে যান।

বাসন্তীদেবী দরজার নিকটবর্ত্তী হলে ডাক্তার বললেন,—দরজাটা চেপে দিয়ে যান দয়া করে, ঠাণ্ডা আসছে—

অর্থটা পরিষ্কার—বাসন্তীদেবীরা কেউ এঁদের আড্ডার কথা শোনেন, এই আড্ডার রস গ্রহণ করেন এটা ডাক্তার পছন্দ করেন না।

হেডমাস্টার বললেন,—রক্তপরীক্ষায় কিছুই পেলেন না—

ডাক্তার বললেন,—পরীক্ষা শেষ হয়নি। এখন কেমিক্যাল পরীক্ষা করতে হবে,—তাতে আবার একটু বেশী রক্ত লাগবে—ব্রহ্মরক্ত এখন অতখানি নেব।

পণ্ডিতমশায় বললেন,—দধীচির জাত, ওতে কিছু মনে করবো না। তবে তার আগে একদিন দধি-দুগ্ধ প্রভৃতি খাওয়ানোর দরকার। বিপ্রগণের এইটেই—

মণ্টুবাবু বললেন,—সাবধান মানু, তুমি রক্তটক্ত দিও না—

—কেন, গবেষণার জন্যে দুই-এক আউন্স রক্ত দিতে পারবো না?

—পারবে বইকি। কিন্তু শেষে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবে—তাই-ত কথা!

মানুবাবু বললেন,—তার মানে? রোগ-ব্যাধি থাকতেই পারে লোকের, তাতে লজ্জার কি আছে? তোমার রক্তটা ত একেবারেই পরিষ্কার—

হেডমাস্টার বললেন,—হ্যাঁ, কাকেই ভাল দেখছ? আমিও ত ডুবছি আর উঠছি—

ডাক্তার বললেন,—অর্থাৎ!

হেডমাস্টার চুট্‌কি গল্প ফাঁদলেন। এক ক'বরেজের এক চেলা ছিল। কিছুদিন শেকড়-বাকড় চূর্ণ করে পাঁচন জ্বালিয়ে সে ভাবলে সবই ত শেখা হয়ে গেছে, এখন যাওয়া যাক। সে ক'বরেজের কিছু বড়ি-বড়া চুরি করে পালিয়ে গিয়ে ক'বরেজ হয়ে বসল। এক রোগী আসলে সে গোটাকয়েক বড়ি দিয়ে দিলে। চেলা ভাবলে—তাই ত, কিসের বড়ি, নিজেও দুটো খেয়ে রাখি। ভাগ্যচক্রে সেটা পাগল হওয়ার বড়ি। চেলার মাথা গরম হয়ে উঠল—তিনি ত জলে পড়ে ডুবছেন আর উঠছেন। এমনি সময়ে রোগীর বাড়ীর লোক এসে বলল,—ক'বরেজ কি বড়ি দিয়েছ, রোগীর যে মাথা গরম হয়ে গেল। চেলা তখন বললেন,—কাকেই ভাল দেখছ, আমিও ত ডুবছি আর উঠছি—

সকলেই হেসে উঠলেন। ডাক্তার বললেন,—আমিও ডুবছি আর উঠছি। মাথাগরম হল কিনা কে জানে! সাবি-বেটি সূর্য্যোদয়ের আগে এসে ডেকে তোলে,—আঁচল গায়ে খালি পায়ে শিশির মাড়িয়ে আসে। গরম জল না হলে মুখ ধুতে পারিনে, দাঁত কনকন করে, হাত অবশ হ'য়ে যায়। ও বেটি ঠাণ্ডা জলে বাসন মাজে। কেন?—তাইত ডুবছি আর উঠছি—

মান্নবাবু বললেন,—ছোটলোক, ওদের অভ্যেস—করলেই হয়—

পণ্ডিতমশায় বললেন,—অভ্যেস করলে যেটা হয় সেটাই নিরাকার বস্তু—ঐ রকম অভ্যেস করলেই ব্রাহ্মণ হয়।

হেডমাস্টার বললেন,—অভ্যেস করলেই দেব-দ্বিজে ভক্তি আসে—

আড্ডা চলল। রাত্রি সাতটায় ওঁরা আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে ঢেকে কাঁকুড়-গাছির দিকে রওনা দিলেন—ঘন ঘন টর্চ ফেলতে ফেলতে—

কতকগুলো গরুর গাড়ী চলেছে অন্ধকারে। দশ-বারোখানা। গাড়োয়ান-গুলো গায়ে চাদর জড়িয়ে ঝিমুচ্ছে।

মণ্টুবাবু প্রশ্ন করলেন,—গাড়ীতে কি মাল?

—ধান—বাবু—

—কোথায় যাবি?

—রাণীগঞ্জে—

—মাল তোদের—

—আজ্ঞে না, মহাজনের মাল।

—কখন রাণীগঞ্জ পৌঁছাবি।

—আজ্ঞে, ভোর নাগাদ যাবো—আবার মহাজনের মাল নিয়ে ফিরবো। ওই অজয় পেরিয়ে আমরা খাওয়া-দাওয়া করবো রাত্রে।

মান্নবাবু বললেন,—ধান কি দর যাচ্ছে?

—আজ্ঞে, এগারো-বারো—

ওঁরা চলে গেলেন। হেডমাস্টার বললেন,—ওদেরও শীত নেই—চাদর গায়ে দিয়েই রাত যাবে।

মান্নবাবু বললেন,—ওদের ত ওই অভ্যেস, অবাক হবার কি আছে?

*

ডাক্তারের গবেষণার কাজ খানিকটা এগিয়ে এসেছে—অর্থাৎ কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন কিন্তু স্টেথিস্কোপ-মাইক্রোস্কোপে কিছু ধরা পড়েনি। রক্ত-পরীক্ষাটা বিভিন্ন ভাবেই করেছেন, কিন্তু কিছু হয়নি—কোন তফাৎই নেই। হেডমাস্টার বলেছিলেন,—স্নায়ু পেশী প্রভৃতি কত কি আছে, তা ত আর আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, কাজেই এটা কি করে পাবেন? কথাটার মধ্যে সত্য আছে, রোগের বীজাণু হয়ত রক্তে পাওয়া যায়, কিন্তু সুস্থতার রহস্য হয়ত অন্যত্র রয়েছে, সেটা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

ডাক্তার মাঝে মাঝে ভাবেন, মেডিকেল বই পড়েন। রমলা বিরক্ত হয়;

বলে,—কি করছো দিনরাত্রি ? হাসপাতাল আর তোমার রিসার্চ,—তা হলে ঘর-সংসার করে কি হবে !

ডাক্তার সেন হেসে বলেন,—সংসার আছে বলেই দুটো হচ্ছে, নইলে কোনটাই চলত না।

তারপর গল্প আরম্ভ হয়—আড্ডার কথা, রিসার্চের কথা। ডাক্তার হঠাৎ বলেন,—টাইফয়েড একটা রোগী হাসপাতালে এলে তার খানিকটা রক্ত সাবিকে ইন্‌জেকশন করবো, দেখি তাতেও ও কাবু হয় কিনা ?

—শেষে মরে যাবে।

—মরবে কেন ? টাইফয়েডের ত স্পেসিফিক্ ওষুধ রয়েছে—হাসপাতাল থেকে দিয়ে ভাল করবো—

রমলা বললেন,—এসব দুর্ম্মতি ঘাড়ে চাপছে কেন ? সে-ক'দিন বুঝি আমি বাসন মাজবো ?

—হ্যাঁ, এইটা একটা সমস্যা যা বলেছ।

—ওসব কেন ? এই গাঁয়ে বসে কি গবেষণা হয় ? যন্ত্র নেই ওষুধ নেই, ল্যাবোরেটারী চাই ত ?

ডাক্তার রমলার মুখের দিকে চেয়ে দেখেন,—চমৎকার গৌরবর্ণ, শুভ্র সুঠাম দেহ, প্রশান্ত চোখ, কিন্তু যেন দেহে লাবণ্য নেই—রক্তহীন পাংশু মাংসের একটা ঢাকনা। উদ্দামতা উচ্ছলতা নেই, যেন নিজের ভারেই নেতিয়ে রয়েছে। সাবির দেহে যেমন একটা সহজ স্বচ্ছন্দ লাবণ্য আছে, একটা তীব্রতা তীক্ষ্ণতা ও সজীবতা আছে—তেমনটি নেই। ডাক্তারের দুঃখ হয়, যদি অমনি স্বাস্থ্য থাকতো তবে রমলা হ'ত সত্যই সুন্দরী।

ডাক্তার হঠাৎ বললেন,—রমলা, তোমায় যে ওষুধ আমি দিই সেটা ঠিক চিকিৎসা নয়, সেটা তখনকার মত তালি দেওয়া। হেডমাস্টারের হোমিও-প্যাথিতে নাম আছে, একবার খেয়ে দেখবে তাঁর ওষুধ—

—হাসপাতালের ডাক্তারের বৌ হ'য়ে যদি হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাই হেডমাস্টারের, তাতে লোকে কি বলবে ?

—কি বলবে ? কি আছে দেখিনা—একবার পরীক্ষা করলে কেমন হয় ?

—সে তোমার ইচ্ছে,—

—হ্যাঁ, সত্য কোথায় তাই ত জানতে হবে—একটা অহঙ্কার নিয়ে বসে থাকলে হবে কেন ?

*

সেদিন সান্ধ্য-বৈঠক বসল অফিস-ঘরেই। আজ সকলেই আছেন,—যথারীতি শীতের বিরুদ্ধে সকলেই সশস্ত্র। কম্ফোর্টার, চাদর, সোয়েটার সব নিয়ে এসেছেন ওঁরা।

ডাক্তার প্রথমেই কথাটা উত্থাপন করলেন,—পণ্ডিতমশায় সেদিন বলেছেন, আমরা সব পতিত—অর্থাৎ ব্রাত্য দোষে দুষ্ট।

মান্থ মিত্তির বললেন,—হেতু ? পণ্ডিতমশায়কে সিধে পাঠাইনে বলে ?

পণ্ডিতমশায় বললেন,—হ্যাঁ, যেটা করণীয় করেন না, এই দোষে পতিত। অর্থাৎ প্রকৃতির বিরুদ্ধে যিনি যাবেন তিনিই পতিত।

ডাক্তার বললেন,—যেমন ধরুন, নগর সৃষ্টি হয়েছে—কৃত্রিমতার চরমে পৌঁছেছে তাই নগরে ব্যাধি অনেক—তারা নাগরিক ব্যাধি বলে গণ্য হয়েছে। যেমন ধরুন, আপনি কায়স্থ—ব্রাহ্মণকে ভক্তি করাই কাজ—আপনি করেন না। অতএব আপনাকে ব্যাধিতে ধরেছে—

—ব্রাহ্মণটা কে ?

পণ্ডিতমশায় বললেন,—সে আপনার বিচার্য্য নয়, ভক্তি করে সমাজে চলাটাই আপনার ধর্ম্ম, এবং তদ্দ্বারাই আপনার ধর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হবে—নইলে কুকর্ম্ম করবেন।

মান্থবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন,—অর্থাৎ আপনার বাড়ী সিধে দিলে আমি আর কুকর্ম্ম করতাম না—

মণ্টুবাবু বললেন,—তাও করতে বই কি। কারণ পণ্ডিতমশায়ের কথাই ধর—স্বধর্ম্ম ত্যাগ করলেই সে কুকর্ম্ম করবে, এই ত কথা। তোমার স্বধর্ম্মটাই যদি কুকর্ম্ম হয় তবে ফলটা ভাল হতে পারে—

মান্থবাবু বললেন,—অর্থাৎ কুকর্ম্মই আমার ধর্ম্ম ?

—না হে, তা বলিনি,—যার পক্ষে এটা সত্য তার কথাই বলেছি—

একটু উত্তেজনা দেখা দিল। মণ্টুবাবুর এই নিয়মিত আক্রমণে মান্থবাবু রুষ্ট হয়েছিলেন। হেডমাস্টার বললেন,—কথাটা তা নয়, ব্যাপারটা ভেস্তে গেল। ধরুন, যেমন অ্যালোপ্যাথি আর হোমিওপ্যাথি। থিওরী কি ? যেমন ধরুন কোষ্ঠবদ্ধতা, অ্যালোপ্যাথ তখন বিরেচক ওষুধ দেবেন,—সেটা তখনকার মত কাজ করলেও কোষ্ঠবদ্ধতা দোষটার চিকিৎসা নয়, হোমিওপ্যাথি প্রাকৃত বস্তু অর্থাৎ দেহে যে জিনিষের অভাব বা শক্তিহীনতা বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা হয়েছে সেই অভাবটা মোচন করে তাকে পুষ্ট করলে, তার পরে তার ক্রিয়ায় বিরেচন কার্য্য হল। এটা চিকিৎসা—

মান্তু মিত্তির হেসে বললেন,—হ্যাঁ, হরিদ্বারে এককোঁটা দিয়ে কলকাতায় এক গণ্ডুষ খেলেই হয়—

হেডমাস্টার বললেন,—ঐ ত দোষ, মিত্তিরমশায়—এইটাই ব্রাত্যদোষ। অ্যাটমের ঠ্যালাটা দেখছেন আজকাল—অ্যাটমিক চিকিৎসাকে হোমিওপ্যাথি বলে—

ডাক্তার বললেন,—যাক্, অর্চ্চনার মাকে চিকিৎসা তাহলে আপনিই করুন—দেখা যাক্, প্রাকৃত ওষুধে কি হয়—

মান্তুবাবু বললেন,—যদি ভাল করতে পারেন তবে একটা পিক্‌নিক হবে, তার সব ব্যয় আমার—

পণ্ডিতমশাই বললেন,—যদি ভাল না হয় তবে সব ব্যয় ডাক্তারবাবুর—

সকলে হাসলেন। হেডমাস্টার বললেন, বিয়ে ত করা যায়, কিন্তু অধিবাস-ই যে সামলানো দায়!

গল্পের আঁচ পেয়ে ডাক্তার বললেন,—অর্থাৎ—

হেডমাস্টার গল্প সুরু করলেন,—এক বিপত্নীক বাঘ এক ঘটক ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বললে, আমার একটা বিয়ে দিয়ে দাও নইলে তোমাকে খাবো। ঘটক বললেন,—বেশ ক'নে দেখার সময় দেবে ত? সাতদিন পরে এসো। বাঘ কিছুদিন পরে এলে ঘটক বললেন,—সব ঠিক, কিন্তু বিয়ের আগে অধিবাস করতে হবে। বাঘ বললে,—অধিবাস করবো। ঘটক তাকে একটা বস্তায় ভরে মুখ বাঁধলেন। বাঘ বলে,—এটা কি!—এই ত অধিবাস। তার পর বাবলার মুগুর দিয়ে আচ্ছা করে পিটে নদীর জলে তাকে ফেলে দিলে। বাঘ ভাসতে ভাসতে চলেছে, এক বিধবা ব্যাঘ্রী সেটা টেনে ডাঙায় তুলে বস্তা ছিঁড়ে বাঘকে বের করলো। বাঘ বুঝলো এই তার ক'নে। মিলন হ'ল। কিছুদিন বাদে এক বিপত্নীক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে বন্ধু বললে,—তুমি কেমন করে পরিবার সংগ্রহ করলে হে! বাঘ সমস্ত ঘটনা বলে শেষে বললে,—ভাই, বিয়ে ত করেছি, কিন্তু অধিবাস সামলানো যে দায়! হোমিওপ্যাথি ত করবেন, কিন্তু অধিবাস সামলাতে পারবেন?

ডাক্তার বলেলেন,—খুব সাংঘাতিক অধিবাস না হ'লে সামলানো যায়—

—বেশী কিছু নয়—ধৈর্য ধরতে হবে। অন্ততঃ তিন মাস—অ্যালোপ্যাথি দিতে পারবেন না।

মণ্টুবাবু বললেন—যদি অধিবাস চরমে উঠে যায়—

হেডমাস্টার বললেন,—তখন ত ডাক্তার আছেনই। গ্লুকোজ কোরামিন আছে—

ডাক্তার বললেন,—আচ্ছা, অপ্রাকৃত ছেড়ে প্রাকৃত চিকিৎসাই হোক,—এটা চট্ করে মরে যাবার রোগী ত নয়—

মানুবাবু বললেন,—পরাজয়, পরাজয়! ডাক্তারবাবুর পরাজয়। হাসপাতালের ডাক্তার হ'য়ে শেষে গৃহে হোমিওপ্যাথি?

মণ্টুবাবু বললেন,—হাসপাতালে ত নয়, ঘরটা প্রাইভেট স্থান, সেখানে ডাক্তার স্বাধীন—

হেডমাস্টার বললেন,—এইটা আপত্তিকর, পুরুষ মানুষ ঘরে স্বাধীন—এটা অসম্ভব—অ্যাবসার্ড—সেখানে একেবারেই পরাধীন।

মণ্টুবাবু বললেন,—মানু কথাটার মানে বুঝছ?

—ওসব ভয় আমার নেই। আমি ওসব থোড়াই কেয়ার করি—

পণ্ডিতমশায় বললেন,—অধিবাস হয়নি বুঝি—

মণ্টুবাবু বললেন,—এত বেশী হয়েছে, এবং হয় যে, ওর আর অধিবাস করে ভয় নেই।

হেডমাস্টার কম্ফোর্টার মাথায় জড়ালেন,—সভাভঙ্গ হল।

*

রমলা হেডমাস্টারের হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেয়েছেন। ডাক্তার ঠাট্টা করেছেন,—অ্যাটমিক চিকিৎসা, বুঝলে? তবে অধিবাস সামলানো দায়!

রমলা হেসে বললেন,—খেতে কিন্তু ভাল—পরিমাণে অন্ততঃ তোলা দুই হ'লে স্বাদ পাওয়া যায়।

ডাক্তার একটু গম্ভীরভাবে বললেন,—এও একটা পরীক্ষা—মন্দ কি, দেখাই যাক্ না—

রবিবারে দুপুরে করবার কিছু ছিল না। ডাক্তার হাফ্‌প্যাণ্ট প'রে বন্দুকটা নিয়ে সাইকেল বের করে বললেন,—রমলা, একটু ঘুরে আসি। একা একা ভাল লাগে না, বড়ই একঘেয়ে হ'য়েছে জীবনটা। দেখি তিতির পাই কিনা? স্টেথস্কোপটা দাও ত—সঙ্গে থাক্—যদি লাগে—

ডাক্তার কি ভাবলেন বলা যায় না—ভালকুড়ির জঙ্গলে না গিয়ে সোজা ঘোড়ামারায় উপস্থিত হলেন। বড় বটগাছের কাছে গিয়ে নামলেন—সাবিদের বাড়ীর সামনে। নকুড় খেয়ে উঠে রোদ পোহাচ্ছে, সাবির মা দা দিয়ে কাঠ কাটছে—সাবি ভাত নিয়ে বসেছে। নকুড় প্রণাম করলো,

সাবির মা গড় করলো। সাবি খেতে খেতে উঠে এসে বললে,—তু শিকার করতে এসেছিস্ বটে— ?

—হঁ্যা। কোন্‌দিকে যাওয়া যায় বল ত—তিতির মারতেই হবে।

ডাক্তার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, সাবির ভাতের উপর ছোট কঁ্যাকড়া ও চুনোমাছের একটু রক্তবর্ণ ঝোল রয়েছে, তাই একমাত্র ব্যঞ্জন। ডাক্তার বললেন,— ও মাছ পেলি কোথা ?

সাবি বলল,—উঃ ধরলেক উই কাঁদোড়কে আর উধার বাঁধকে—

ডাক্তার বললেন,—ভালকুড়ির জঙ্গলে খুব তিতির ডাকছে, তিতির কোথা কোথা বেরোয় জানিস্ ?

—চল্ কেনে, মু দেখাবেক। উধার কাট ভাঙতে যাবেক ত—

ডাক্তার বন্দুক হাতে করে বটগাছটা প্রদক্ষিণ করলেন।

—হরিয়াল বা বড় ঘুঘু আছে নাকি ?

নকুড় বললে,—উ সব পাখী ভোর রাতকে ফল খেতে আসা করছেন, বাবু—

ডাক্তার আর একটু ঘুরে এলেন এদিক ওদিক। ততক্ষণে সাবির খাওয়া হ'য়ে গেছে, সে একটা ছোট কাটারী ও লগা নিয়ে বললে,—চল্ কেনে ডাক্তার, তুকে দেখাবেক, তু শিকার করবি, মু কাট ভাঙবেক।

ডাক্তার সাইকেল নিয়ে সাবির সঙ্গে ভালকুড়ির জঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

নির্জ্জন শীতের দ্বিপ্রহর। কোথাও জনপ্রাণী নেই, পাখীর কবোষ্ণ স্বর্ণ-পালকের মত রোদ পৃথিবীকে উষ্ণ করে রেখেছে। মাঝে মাঝে বন, মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা। শাল-পিয়াল, মহুয়া-পলাশের ছোট-বড় গাছ,—শেয়াকুলের ঝোপ, কোন্ গাছের ঝাড়—সাবি আগে আগে চলেছে—সাইকেল ঠেলে ডাক্তার পিছন পিছন চলেছেন।

ঝোপের মাঝে খয়েরী রঙের ফেঁচো পাখীর ঝাঁক মাঝে মাঝে কিচ্‌মিচ্ করছে—শালিকগুলো পায়ের শব্দে ঝট্‌পট্ করে উড়ে যাচ্ছে। বৃক্ষচ্ছায়া ক্ষুদ্র হ'য়ে গাছের পাদদেশ একটু আঁধার করে রেখেছে। সাবি চলছে—

ডাক্তার দেখলেন—দ্রুত তার পদক্ষেপ, দেহটা আন্দোলিত হচ্ছে চলবার ছন্দে। বিপুল নিতম্ব স্পন্দিত হচ্ছে তালে তালে। পরিমিত বস্ত্র সমস্ত দেহকে আবৃত করতে পারেনি। বুকের কিয়দংশ অনাবৃত—মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল। ডাক্তারের বেশ লাগছিল মনে মনে—নির্জ্জন মধ্যাহ্ন, চারিপাশে

গভীর বনশ্রেণী, সামনে ভালকুড়ি পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে জঙ্গল উঠে গেছে। দুই-একটা বন্যজন্তু এদিক ওদিক ছুটে পালাচ্ছে—একটা খ্যাঁকশেয়াল —একটা বেঁজি—

বাঁয়ের রাস্তা গেছে জগৎপুরের ডাঙায়, ডাইনের রাস্তা গিয়েছে ভালকুড়ি ঘুরে গ্রামান্তরে। সাবি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে,—সাইকেলটো হোথা উঃ জঙ্গলকে রাখ কেনে—ই ত হাসপাতাল ডাঙ্গার রাস্তা বটি। যাবার বেলা লিয়ে যাবি—

ডাক্তার বললেন,—যদি কেউ নিয়ে যায়—

—হ, লিবেক! হেথা কোন্ মনিষ রইছে—

ডাক্তার সাইকেলটা একটা পলাশগাছের সঙ্গে চেন দিয়ে বেঁধে রেখে সাবির সঙ্গে গভীর জঙ্গলের দিকে চললেন। মধ্যাহ্নের রৌদ্র ধীরে ধীরে ক্ষীণ হ'য়ে আসছে, গাছগুলির ছায়া ক্রমশঃ বড় হ'য়ে উঠছে,—জঙ্গল নিবিড়তর হচ্ছে। এই নিবিড় বনে স্থানে স্থানে মাত্র মধ্যাহ্ন-রৌদ্র পড়েছে—বাকী সব ছায়াশীতল আর্দ্র। সাবি একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সরু পায়ে-চলা পথ দিয়ে এগিয়ে এসে একটা খোলা জায়গায় দাঁড়ালো ; বললে,—ডাক্তার, হেথা বস্ কেনে। হোথা উ ধানজমি চাষ করলেক, হোথা তিতির নামবেক বটে। হেথা জঙ্গল্‌কে বস্ ঠাণ্ডা হ'য়ে—বড় বড় তিতির হোথা নামবে—মারবি—

ডাক্তার ব্যাপারটা বুঝলেন—জঙ্গলে চুপ করে বসে থাকতে হবে, সামনের জমিতে ঝরা ধান খেতে তিতির আসবে নিশ্চয়,—জঙ্গল থেকে বেরুবার সময়ও হ'য়েছে। জঙ্গলে তিতির দেখা বড়ই কঠিন। ডাক্তার বন্দুকে টোটা ভরে একটা জঙ্গলের আড়ালে বসলেন। সাবি বলল,— মু উধারকে কাঠ ভাঙ্গবেক—ভালকুড়ির বগলে। বন্দুক ফুটা কেনে তু, মু দৌড় করবেক—হেথা আসবেক--

সাবি লগা আর কাটারী নিয়ে চলে গেল—

ডাক্তার বসলেন ধানক্ষেতে দৃষ্টি রেখে। মনটা তার ভেবে চললো—

নির্জ্জন অরণ্য। সাবি যুবতী,—পূর্ণ-যুবতী, স্বাস্থ্যে সমুজ্জ্বল। দেহটা লোভনীয়—ডাক্তারের মনটা রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো। সাবি নিঃসন্দেহে নিঃসংশয়ে একাকী এসেছে তার সঙ্গে এই নিবিড় নির্জ্জন অরণ্যে,—কোন সংকোচ নেই—আশ্চর্য্য! কেন?...

রমলা কি এমনি নির্জ্জন বনে একাকী একজন পুরুষের সঙ্গে আসতে পারতো? সে শিক্ষিতা, স্বাধীনভাবেই চলাফেরা করে, করতো—প্রয়োজনে

চাকরীও করতো হয়ত, কিন্তু এই সাহস কি হত? না—কখনই না,—সে সংকোচে, সন্দেহে নিশ্চয়ই আসতো না,—হয়ত আসতো—যদি—

ডাক্তার ভেবে চললেন—এই নির্জ্জনে সাবি তার সঙ্গে এসেছে কি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে? কোন আশা নিয়ে? তারা কি নিজের দৈহিক পবিত্রতা সম্বন্ধে সচেতন নয়? কিন্তু দেহ তার সত্যই লোভনীয়, সে নিকষ কালো, রমলা ফর্সা। এ অশিক্ষিতা, রমলা রুচিসম্পন্না আধুনিক শিক্ষিতা—তবুও যেন ডাক্তারের কেমন একটা মোহ হয় সাবির দেহটাকে দেখলে—মনে হয় ওকে দেখেন, ভোগ করেন—ছুরি দিয়ে কেটে কেটে দেখেন ভিতরটা—রক্ত মাংস অস্থি। ওর ওই স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের মূল কোথায়?

সময় চলে যায় ভাবতে ভাবতে,—হঠাৎ একটু কেমন শব্দ হয়, জামার খস্‌খস্ শব্দ; ফট্‌ফট্ করে উড়ে গেল দুটো তিতির ধানক্ষেত থেকে। ডাক্তার আবার চুপ করে বসে ভাবতে লাগলেন—সাবির দেহ আর রমলার দেহকে যাচাই করছেন মনে মনে দু'হাতে ধরে, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা লোভনীয়?

কাঁধের উপর মৃদু একটা স্পর্শ পেয়ে দেখেন, সাবি তার কাছে এসে বসেছে এবং আঙুল দিয়ে অদূরে একটা কি দেখাচ্ছে—একটু দূরে গোটা চারেক বড় বড় তিতির খেয়ে বেড়াচ্ছে—

ডাক্তার বন্দুক তুললেন,—তিনটা তিতির প্রায় এক লাইনে এলে ঘোড়াটা টেনে দিলেন। নির্জ্জন অরণ্য কাঁপিয়ে শব্দ হ'ল—দুম্—

একটা বড় ঢিল ভেঙে ছিটকে পড়ল,—দুটো তিতির উড়ে গেল। একটা যেন আহত হ'য়ে ঝট্‌পট্ করছে—সাবি ছুটলো পাখী ধরতে, কিন্তু দু'চার পা এগুতেই তিতিরটা ঝট্‌পট্ করে বনে ঢুকে গেল। সাবি ফিরে এসে বলল,—উ আর ধরতে লারবেক,—উ বনকে ঢুকলে আর পাবেক নাই—হ—

ডাক্তার বললেন,—ওটা মরবে—

—হ, উ জান কঠিন বট, বাবু,—উ মরবেক লাই—

ডাক্তার সাবির মুখের দিকে চাইলেন। সে হাসছে,—কালো মুখের মাঝে শুভ্র দাঁত ক'টা চিকচিক করছে আরণ্য সবুজের পটভূমিকায়। ডাক্তারের রক্ত সহসা উষ্ণ হ'য়ে উঠল, তিনি বললেন,—তুই কি করলি?

—এক বোঝা কাট কাটলেক,—উ দ্যাখ কেনে—

হ্যাঁ, এক বোঝা কাঠ কখন সে অতি নিঃশব্দে পিছনে এনে রেখেছে—বনের লতা দিয়ে বাঁধা, তার মাঝে তার কাটারী গোঁজা রয়েছে। লগাটা পাশেই প'ড়ে—

ডাক্তার বললেন,—তুই বস্ এখানে— তিনি তার হাত ধরে টেনে পাশে বসালেন।

সাবি মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে বসল। বললে,—কি বলছিস্ বল কেনে, বাবু—

—তুই যে আমার সঙ্গে একা এই বনে এলি, তোর ভয় করলো না—

—ভয় করবেক কেনে ?

—আমি পুরুষ, তুই মেয়েছেলে,—এখানে বনে কে আছে! ধর, আমি যদি···

সাবি হি-হি করে হেসে বললে,—তু ডাক্তার একলাটি কি করবি? হ, পালিয়ে যাবেক। একমণ চাল ঘরকে লিতে লারিস্, তু মোর কি করবি ?

—আমার করে তোর কোন ভয় নেই—

—ভয় করবেক কেনে,—তু মনিব বটি, তুর সঙ্গে হেথা আসবেক, ভয় কি ? মুনিবের সঙ্গে আসবেক লাই ?

ডাক্তার একটু ভেবে বললেন,—আমি যা বলব তা শুনবি ?

—কেনে শুনবেক নাই ?

—যা বলবো, সব শুনবি ত— ডাক্তার সাবির হাতটা ধরলেন।

সাবি অবাক হ'য়ে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল,—তার যেন এই অবস্থাটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি।

ডাক্তার হাতটা ধরে আকর্ষণ করলেন। ডাক্তার বললেন,—আমার সব কথা শুনবি ত ?

সাবি আবার ক্ষণিক অবাক হ'য়ে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইল। বললে,—তু মনিব বটি, তুর কথা শুনবেক ত বটি,—লা বলবেক লাই। তু ত লিখা পড়া জানছিস্। তুর জগধাত্তির পিতিমা বৌটা ঘরকে রইছে,—

মু ত ছোটলোক বটি, তুর বাড়ী কামিন খাটছি বটি। তুর বদনাম হবেক, তুকে লোকে লিন্দা করবেক—তু মোকে লিবি কেনে ?

ডাক্তার বললেন,—তোকে নিন্দা করবে না ?

—মোরা ত ছোটলোক বটি, মোদের লিন্দাটা কি ? তু বড় ডাক্তার বটি, এতে লিখা পড়া জানছিস্—উ সব তু ভাবিস্ না—বৌটা ঘরকে রইছে, কাঁদবেক বটে— বলতে বলতে সাবির চোখে অশ্রু ছলছল হ'য়ে উঠল, তার পরে কম্পিতকণ্ঠে বললে,—তুর পায়ে পড়ি ডাক্তার,—তু—কি বলছিস্—

ডাক্তার থেমে গেলেন—সাবির আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা আছে সে আগেই বলেছে, কিন্তু এখন সে অশ্রুসজল চোখে মিনতি করে কেন? মনিবের কথার অমান্য করতে পারেনা বলে? ডাক্তারের মনটা হঠাৎ যেন একটা পাথরে আঘাত খেয়ে ফিরে এলো। তিনি হেসে বললেন,—সাবি শোন, আমি তোর দেহটা একটু পরীক্ষা করে দেখতে চাই—

সাবি বললে,—তা ত্থাখ কেনে—হেথা ত্থাখ, হাসপাতালকে ত্থাখ—

ডাক্তার সাবির হাতের পেশী, নাড়ী, বুক পরীক্ষা করলেন—এই পরীক্ষার মাঝেই যেন একটা অপূর্ব্ব আনন্দ পেলেন তিনি—বার বার দেখলেন।

সাবি হঠাৎ খিলখিল করে হেসে বললে,—কেতে দেখবি, ডাক্তার—তুদের হোথা কাজ করতে যাবেক লাই?

ডাক্তারের স্বপ্ন ভেঙে গেল যেন হঠাৎ, তিনি চমকে উঠলেন। বেলা অপরাহ্ণ—গাছের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে খোলা জায়গাটায় রোদ ঢেকে দিয়েছে। তিনি বললেন,—কাঠ কি করবি?

—হোথা রাখবেক, পথের বগলে, ফিরবার পথে লিয়ে যাবেক—

—আর একজন যদি নিয়ে যায়—

—হ, কাট লিয়ে যাবেক? মু ত ভাঙছি,—উরা লেবেক কেনে, উদের ত লয়—

সাবি ছাড়া পেয়ে কাঠের বোঝা মাথায় করে হনহন করে রওনা দিল—সে যাবে জগৎপুরের ডাঙায়, ডাক্তারের বাড়ীর কাজ সেরে সন্ধ্যায় কাঠ নিয়ে ফিরবে।

ডাক্তার আর একটা টোটা বন্দুকে ভ'রে, বন্দুকটা কোলের উপর রেখে বসলেন। মনে মনে নির্জ্জন অরণ্যের এই আলোছায়ার মাঝে সাবির প্রসঙ্গটা তিনি রোমন্থন করছিলেন। সাবির কথায় তাঁর মনটা যেন হঠাৎ হোঁচোট খেয়েছে। তাঁরই জন্যে, তাঁরই সম্মানার্থে এবং ঘরের জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মত স্ত্রীটির মুখ চেয়ে সে মিনতি করেছে—মনিবের কথা অমান্য সে করেনি—

তিনি ভাবছিলেন···

নির্জ্জন নীরব অরণ্যটা যেন ফাঁকা হ'য়ে গেছে, ভাল লাগেনা একাকী। ডাক্তার চেয়ে দেখলেন, চারিপাশে ভালকুড়ির মাথায় রোদ চিক্‌চিক্ করছে—একঝলক রোদ এসে পড়েছে একটা কাটা শালগাছের গোড়ায় ঝোপের উপর। দুটো তিতির বুক পেতে দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে—তিনি বন্দুক তুললেন—ওরা নড়ল না, ঘোড়া টিপলেন—ভালকুড়ির গায়ে শব্দটা

প্রতিহত হ'য়ে গুম্ গুম্ করে উঠল। একটি তিতির পড়েছে—ডাক্তার উঠে গিয়ে তাকে ধরলেন—একেবারে হত। আর একটা হয়ত আহত হ'য়ে পালিয়েছে—কিন্তু তিতির একবার পালালে আর পাওয়া যায় না। অতএব আর চেষ্টা করলেন না তিনি।

ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকেই রওনা দিলেন। পথে সাইকেলটা নিতে হবে—একটু অন্ধকার হ'লে রাস্তা ভুল হতে পারে। তিনি এসে সাইকেলটার কাছে দাঁড়ালেন—কারা যেন জঙ্গলটার ওধারে ঝগড়া করছে। সাবির গলা তিনি বুঝলেন—

একটু এগিয়ে দেখেন, নকুড় আর সাবিতে বচসা হচ্ছে। নকুড় সাবির কাছে একটা টাকা চাচ্ছে মদ খাওয়ার জন্যে। সাবি বলছে—সে কি বনে টাকা নিয়ে এসেছে?

নকুড় বললে,—হ, ডাক্তার তুকে বনকে আনলেক, টাকা দেবেক নাই—

—হ, ডাক্তার তুর কোলিয়ারীর বাবু বটি? সাবি তুর কোলিয়ারীর কামিন বটি?

—হ, দে কেনে—

—উঃ ডাক্তার তুর কামিনকে ছুঁবেক লাই,—উ এতে লিখা পড়া জানছে, বড় ডাক্তার বটি, সাবিকে লিবেক কেনে?

বচসা চলল। নকুড় সাবির সমস্ত দেহ ভাল করে পরীক্ষা করে হতাশ হয়ে বললে,—হ, ডাক্তার তুর সঙ্গে খাম্‌কা এলেক বটি?

সাবি বললে,—গ্যাখ্ কেনে, আর-বার্‌টি গ্যাখ্—ডাক্তার টাকা দিচ্ছে তুর কামিনকে—

নকুড় বললে,—তু এলি কেনে বল—

সাবি হঠাৎ রেগে উঠে বললে,—লে, তুকে পোড়াবার কাট কাটলেক দেখছিস্ না?

সাবি কাঠের বোঝাটা ঝুপ করে নকুড়ের মাথায় ফেলে দিল। নকুড় আর্ত্তনাদ করে বসে পড়তেই সাবি বললে,—কাট লিয়ে ঘরকে যা,—ডাঙ্গাকে কাজ করে ফিরবেক—তুকে লিয়ে যাবেক মহিম খুড়োর কাছকে,—ছাড় করবেক—

সাবি হনহন করে চলল হাসপাতালের দিকে। নকুড় কাঠের বোঝা, কাটারী, লগা নিয়ে ফিরে গেল ঘোড়ামারায়। ডাক্তার ফিরে এসে সাইকেলটা নিয়ে ঠেলে ঠেলে রাস্তায় এসে উঠে পড়লেন। পথের মাঝামাঝি সাবির

সঙ্গে দেখা। সাবি বললে,—হ, তিতির হলেক একটো বটে—বা—বড় বটি—

ডাক্তার বললেন,—হ্যাঁ, একটা হ'য়ে গেল। তুই তৈরী করতে পারবি ত?

—হ, উ জানছি না? খুব জানছি—

ডাক্তার সাঁ-সাঁ করে সাইকেল চালিয়ে এলেন, মনে মনে ধন্যবাদ দিলেন সাবিকে। তার মিনতির হাত এড়িয়ে প্রলোভন যে তাকে জয় করতে পারেনি, এ পরম সৌভাগ্য। তা হ'লে ওই ছোটলোক নকুড়ের কাছে তার কোন জবাব থাকতো না। ডাক্তার সাইকেল চালাতে চালাতে পুনরায় রোমন্থন করলেন ঘটনাটা—সাবির হাতের তালু দুটো কড়া, কিন্তু পেশীগুলি রমলার চেয়েও নরম, দেহ যেন তার থেকেও নমনীয়।···

বাড়ী এসে ডাক্তার সগর্ব্বে অর্চ্চনাকে ও রমলাকে শিকারের কাহিনী বললেন। রমলা চা এনে দিলেন; চা খেতে খেতে সাবি এল।

ডাক্তার বললেন,—সাবি, এটা আগে তৈরী করে দিতে পারবি?

—হ, একটো কাটারী দে কেনে—

সাবি তিতির তৈরী করতে গেল। ডাক্তার বললেন,—ওর জন্যে একটু ঝোল রেখো—নিজে হাতে তৈরী করছে—

রমলা বললেন,—তোমার এত দরদ কেন? সে আক্কেল কাণ্ডজ্ঞান কি আমার নেই—

ডাক্তার অপরাধীর মত চুপ করে গেলেন।

*

সন্ধ্যার পরে কাঁকুড়গাছির দল এলেন। বেশ শীত পড়েছে—সমস্ত গ্রাম, দূরের প্রান্তর—সন্ধ্যার কিছু পরেই নিঝুম হ'য়ে যায়,—ভালকুড়ি থেকে একটা শুষ্ক শীতল বাতাস বইতে থাকে, রাত্রের সঙ্গে সঙ্গে তার বেগ বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে শীতও পড়ে সাংঘাতিক। মাঝে মাঝে বটগাছের নীচে দূরগামী গাড়ীর গাড়োয়ানরা আগুন জ্বেলে শরীর গরম করে। দূরের জঙ্গলে শেয়াল বা বন্য জানোয়ারের ডাক শোনা যায়। ঘোড়ামারা থেকে কদাচিৎ মাদলের বাজনা ভেসে আসে পশ্চিমা হাওয়ায়—আগুন জ্বলে সন্ধ্যার পরে।

ডাক্তার এলেন,—আফিস-ঘরেই আজকাল দরজা-জানালা দিয়ে আড্ডা চলে। হাসপাতালে রোগী নেই একরকম। শীতকালে রোগী এদেশে প্রায়ই থাকে না।

ডাক্তার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন,—স্ত্রী-স্বাধীনতাটা ভাল কি মন্দ।

হেডমাস্টার প্রথমেই প্রতিবাদ করলেন,—কথাটাই ভুল, এ আলোচনার অযোগ্য—

মানুবাবু বললেন,—কথাটাই ভুল? বলেন কি? স্ত্রী-স্বাধীনতা নিয়ে এত আলোচনা চলছে—

—হ্যাঁ—খবরের কাগজ, মাসিক পত্রিকায় বহু বেরুচ্ছে—কিন্তু মাথা নেই তার মাথাব্যথা। বরং পুরুষ-স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলোচনা চলতে পারে।

মানুবাবু বললেন,—আমরা ত চিরদিন স্বাধীন,—ছিলাম, থাকবো—সে আবার একটা বিষয় নাকি!

মণ্টুবাবু বললেন,—মানু কথাটা শোন,—মাস্টারমশায় বলছেন, তুমি যদি পুরুষ হও তবে স্বাধীন কিছুতেই নও।

ডাক্তার আলোচনাটা উস্কে দেওয়ার জন্যে বললেন,—মাস্টারমশায়ের কথাটা শেষ করতে দিন। উনি স্বাধীনতা মানে কি বুঝেছেন, কি বলতে চান—

—হ্যাঁ, কথাটা আগে প্রণিধান করুন। আমি পুরুষ মানুষ এবং আমার স্ত্রী যদি স্ত্রীলোক হন—মানুবাবু কথাটা শুনবেন কান দিয়ে—তবে বলবো তিনি স্বাধীন আমি সর্বতোভাবে পরাধীন। দেখুন প্রথমতঃ বোর্ড, তার পরে ডি-পি-আই, ডি-আই, ম্যানেজিং কমিটি সবের পরাধীন—তার পর ছাত্র, গ্রামবাসী, শিক্ষকগণের পরাধীন, তাঁদের হুকুম মানতে হয়। এই দাসবৃত্তির দ্বারা উপার্জ্জিত যা কিছু গৃহে সমর্পণ করছি,—সেখানেও বিড়ির পয়সা চেয়ে নিতে হয় এবং হুকুম করলেই তেল-চিনির জন্য দোকানে ছুটতে হয়—তিনি গৃহে স্বাধীন, আমি ঘরে-বাইরে পরাধীন। শুধু তাই নয়—যেদিন বলবেন, মানুবাবুর বাড়ী বেড়াতে যাবো, সেদিন আবার লণ্ঠন ধরে সঙ্গে যেতে হবে ভৃত্যের মত—স্বাধীন কে? তাঁরা অবশ্য ঘুরে ফিরে আমাদের মত একাকী বেড়াতে পারেন না, কিন্তু যেদিন পারবেন সেইদিনই স্বাধীনতা চলে যাবে—

মানুবাবু বললেন,—এটা ঠাট্টা। তবে সকলেই ত আপনার মত সব সমর্পণ করে না।

মণ্টুবাবু বললেন,—করতেই হবে,—আদ্যাশক্তি—ওখানে মাথা মুড়তেই হবে—

ডাক্তার বললেন,—হেঁয়ালী নয়,—সত্যি ধরুন—পাশ্চাত্য দেশের মত স্বাধীনতটা আমাদের দেশে ঠিক হবে কিনা?

মানুবাবু টিটকিরি দিয়ে বললেন,—পণ্ডিতমশায় বলুন, শাস্ত্রে কি বলে ?

পণ্ডিত বললেন,—ঐ পাতিত্য-দোষ হবে।

—পুরুষ মানুষ ঘুরে বেড়ালে দোষ নেই, স্ত্রীলোক স্বাধীন হলেই দোষ। পুরুষমানুষ বদমাইস হলে দোষ নেই—স্ত্রীলোক বের হলেই সতীত্ব গেল—চমৎকার শাস্ত্র !

—চমৎকারই। তার হেতু এই যে, পুরুষ ভ্রষ্ট হলেও তার বংশপরম্পরা নষ্ট হয় না, কিন্তু স্ত্রী ভ্রষ্টা হলে বংশধারা বিনষ্ট হয়। সোজা হেতু এই যে স্ত্রী সন্তান ধারণ করেন বলেই তার স্বাধীনতা দূষণীয়। পুরুষের সন্তানধারণ ক্ষমতা নেই বলেই তা সামাজিকভাবে বিনষ্টের কারণ নয়। সেইজন্যেই শাস্ত্রকাররা স্ত্রীর সতীত্বের উপর জোর দিয়েছেন বেশী—

ডাক্তার বললেন,—তা হ'লে ভারত ছাড়া সব দেশের মেয়েরাই পতিত ?

পণ্ডিতমশায় বললেন,—জানি না, অত জ্ঞান নেই—তবে সে দেশের সমাজ ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ যদি তা না হয় তবে তারা পতিত নয়—যেমন আমাদের দেশের বাউরী-ধাঙড় প্রভৃতির মেয়েরা স্বাধীন, তারা পতিত নয়—কারণ তাদের সমাজ-পরিস্থিতিতে তারা স্বাধীন—

মানুবাবু পণ্ডিতমশায়ের প্রতি একটু কটাক্ষ করলেন,—অর্থাৎ এও হয় অও হয়,—সুবিধে মত—

মণ্টুবাবু মানুবাবুকে খোঁচা দিলেন,—ওরা স্বাধীন না হ'লে তোমার উপায় কি হত—

মানুবাবু উত্তেজিত হতেই মণ্টুবাবু বললেন,—তোমার অত ধান, অত খড় এসব কারা ব্যবস্থা করত ?

হেডমাস্টার বললেন,—পণ্ডিতমশায়ের কথাটার একটা ব্যাখ্যা আমি দিতে চাই। পাশ্চাত্য দেশের স্বাধীনতা আমাদের দেশে এলে পাতিত্য-দোষই হয়। যেখানে কুমারীরা ঘুরে বেড়ায় পুরুষ-বন্ধু নিয়ে, চাকুরী করে, মেলামেশার নেশায় যৌবন কাটে—তাতে দোষও নেই, বিবাহের বাধা হয় না তাতে। কুমারী-ব্যভিচার সার্ব্বজনীন, এ কথা শ' এবং রাসেল্ স্বীকার করে গেছেন। ছেলেরাও সব জানে—তারা সেটা মেনে নিয়ে বিয়ে করে, ক্ষোভ করে না। গৃহের পবিত্রতার জন্যে খুঁতখুতি নেই মনে। কিন্তু এদেশে আঁচল ধরলে সতীত্ব যায়,—কলঙ্ক হয়, ছেলেরা ভেগে যায় বিয়ের নামে। অর্থাৎ আমরা স্বাধীনতা পছন্দ করি অন্যের স্ত্রী বা বোনের বেলায়, কিন্তু নিজের

বেলায় নয়। পুরুষের মন তৈরী হয়নি স্বাধীনতাকে গ্রহণ করবার, কাজেই পাতিত্য-দোষ আসে—

ডাক্তার মনে মনে ভাবছিলেন সাবির কথা, সে ত স্বাধীন—সত্যিকার স্বাধীন। ভালকুড়ির পাদদেশে তন্দ্রাচ্ছন্ন নির্জ্জন বনের আলোছায়ায় তিনি সাবিকে দেখেছেন আজ। সে প্রথম হেসেছিল, তার পর মনিবের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে মিনতি করেছিল।

ডাক্তার ছবিটাকে দেখতে দেখতে নড়েচড়ে বসলেন। মানুবাবু বললেন,—বাউরী-ধাঙড় ওদের স্বাধীনতাটা পাতিত্য-দোষ-মুক্ত কেন?

হেডমাস্টার বললেন,—যেহেতু তাদের পুরুষের মন সংস্কারমুক্ত। তাদের স্বাধীনতা তারা মনেপ্রাণে দিয়েছে। দরকার হ'লে তারা ছাড় ক'রে সাঙা করে—রোদন করে না। 'প্রজেনি' নিয়ে অত মাথাব্যথা নেই তাদের। দুটো ছেলে সুদ্ধ সাঙা তারা করে,—কাজের তাগিদে, কাজেই পাতিত্য নেই সেথায়--

ডাক্তার বললেন,—ওরা স্বাধীন সত্যিকার। আজ শিকার করেছি একটা তিতির—সাবি বনের মাঝে আমাকে নিয়ে গেল একা—সংকোচ নেই, ভয়ও নেই। আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম—তোর ভয় করে না একলা এমনি আসতে? সে কি বললে জানেন?—চালের বস্তাটা ঘরে লিতে লারলি,—তু কি করবি বটে! সে জানে, স্বাধীনতা রক্ষা করার ক্ষমতা তার আছে।

সকলে হঠাৎ চুপ করে গেলেন। কি যেন সকলে ভাবছিলেন। হঠাৎ মণ্টুবাবু বললেন,—ডাক্তারবাবু, গল্পটা মানুর সামনে করে ভাল করেননি।

মানুবাবু বললেন,—তার মানে? 'আমি' কি? বলতে হবে—এমনি খুঁচিয়ে ঘা করে দিলে দেখছি—

—চটো কেন, মানু,—তুমি গল্পটা ত ওখানে শেষ করোনি, আরও খানিক ভেবে নিয়েছ—তাই বললুম ডাক্তারের কাজটা ভাল হয়নি। তবে, সাবি একলা একমণ বোঝা নিয়ে হাটে যায় এটা খেয়াল রেখো—

মানুবাবু র‍্যাপার জড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ডাক্তার বললেন,—কি হ'ল?

—না, আমি যাই। একি কথা! রোজ রোজ কেবল এমন আক্রমণ—আমিই টার্‌গেট—

ডাক্তার বললেন,—ক্ষ্যাপা শেয়াল বেরিয়েছে শুনলাম একটা—যাবেন না।

সকলে হো-হো হেসে উঠলে ডাক্তারবাবু বললেন,—কিন্তু মানুবাবু, আজ এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে—যখন ফ্যাক্টরী-আফিসে স্ত্রী-পুরুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে

কাজ করছে, যুদ্ধ করছে রণাঙ্গনে—তখন এই বিংশ-শতাব্দীতে এটা কি একটা অত্যন্ত হাস্যকর কথা নয়? স্ত্রী-পুরুষে তফাৎ কোথা? সব সমান—

হেডমাস্টার বললেন,—তফাৎ আছে বৈকি। যেমন ধরুন, স্ত্রীলোকের দাড়ি-গোঁফ গজায় না। ওরা সন্তানধারণ করতে পারে, আমরা পারি না। তবে সাধারণ কাজে হয়ত সমান বা শ্রেষ্ঠ, এ কথা স্বীকার করতেও বাধা নেই।

মানুবাবু বললেন,—সব দেশে আজ মেয়েরা লেগে গেছে কাজে—পুরুষের সঙ্গে। আজ কলকারখানার যুগ—

মণ্টুবাবু বললেন,—কলকারখানায় কি আমাদের সুখ বাড়িয়েছে?

—নিশ্চয়ই। একজোড়া কাপড় বুনতে একটা লোক চব্বিশ ঘণ্টা হয়রান হত, এখন মিনিটে একখানা হচ্ছে—

পণ্ডিত বললেন,—তা হচ্ছে। যেমন মানুবাবুর কলে ঘণ্টায় তিন মণ চাল ভানা হচ্ছে। কাজ খুব এগুচ্ছে, কিন্তু অন্ততঃ কুড়িটা বিধবা যারা ধান ভেনে খেতো তারা মরেছে,—জীবিকা গেছে, এখন ভিক্ষা—বেকার-সমস্যা—

ডাক্তার বললেন,—সেই সঙ্গে 'ভিটামিন বি' ও বেরিয়ে যাচ্ছে চালের উপর থেকে—

—অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে যতই দূরে যাচ্ছে মানুষ ততই বিভ্রাট হচ্ছে বুঝলেন, মানুবাবু? —পণ্ডিত হাসলেন।

মানুবাবু বললেন,—আজ মেশিনের যুগ, মেশিন দিয়ে মানুষ সুখী হয়েছে—গায়ে খাটতে হচ্ছে না—আরাম এসেছে, সুযোগ-সুবিধে এসেছে।

মণ্টুবাবু বললেন,—সেই আরামের জন্যেই ব্লাডপেসার থ্রম্বসিস্ ক্যান্সার হচ্ছে। একটু খাটুনি না হ'লে গতর থাকবে কেন? খাটতে হবে রোদে বাতাসে, নইলে গতর থাকবে কেন? স্থাখো ত—দেহ, লোহার শরীর—আমি কাজ করি— মণ্টুবাবু তাঁর হাতের পেশীটা ফুলিয়ে দেখালেন।

পণ্ডিতমশায় বললেন,—একেবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা সমাপরা। অর্থাৎ তিনি—অর্থাৎ প্রকৃতি ছাড়া কিছুই নেই। মেশিনটা হচ্ছে শুম্ভ-নিশুম্ভ মাত্র,—যাক্ সে কথা, কিন্তু এই বিধবা ভারানীগুলোর কি হবে?

ডাক্তার বললেন,—অর্থাৎ বেকার-সমস্যা দূর হবে কি করে?

—আরও শিল্প গড়ে উঠবে—নূতন নূতন শিল্পে লোক নিযুক্ত হবে—

হেডমাস্টার বললেন,—তার পর?

—আরও হবে—যতক্ষণ না সব দেশবাসী নিযুক্ত হয়।

—কিন্তু মেশিনে যদি এত মাল তৈরী হয়—কিনবে কে? সব দেশেই ত

শিল্প গড়ে উঠছে—কে কিনবে? তারপর ক্রমশঃ মেশিনের উন্নতির ফলে এমন দিন আসবে যখন একটা লোকেই হয়ত একটা গোটা জুট-মিল চালাবে তখন মানুবাবু কি হবে?

মণ্টুবাবু বললেন,—সে ভাবনার দরকার হবে না, ততদিন মানু থাকলেও আমরা থাকবো না।

ডাক্তার বললেন,—মানুবাবু হয়ত থাকবেন, আর ভাবছি সাবির কথা—সে-বেটীও থাকবে, কি বলেন?

পণ্ডিত বললেন,—যতদিন ওরা ঘোড়ামারা না ছাড়ে, বা সভ্যতা যতদিন ঘোড়ামারায় না ঢোকে ততদিন ওরা ঠিকই থাকবে,—অনন্ত-যৌবনা উর্ব্বশীর মত—শুম্ভ-নিশুম্ভ যদি তাদের স্বর্গে বাঁশগাড়ি না করে।

মানুবাবু বললেন,—ওরা সভ্য হলে যে সর্ব্বনাশ, একেই জমি চাষ করার লোক মেলে না, তার পর ওরা যদি সভ্য হ'য়ে ওঠে তবে সব মাঠ পতিত—

—তা হ'লে সভ্যতাটা—মেশিনটা আপনাদের জন্যে?— হেডমাস্টার বললেন।

—সারভাইভ্যাল অফ দি ফিটেস্ট—যার শক্তি আছে সে বেঁচে থাকবে, সে সুখী হবে। এইত জগত, এইত নিয়ম চিরকালের।

পণ্ডিতমশায় বললেন,—তা নয়, ভারতীয় ঐতিহ্য তা নয়। শক্তি অর্জ্জন করতে হবে কল্যাণের জন্য, শোষণের জন্য নয়,—যে শক্তি শোষণের জন্যে নিয়োজিত হবে, সেটা বর্ব্বর শক্তি, আসুরিক শক্তি—তাকেই শাস্ত্রকার অসুর বলেছেন। লোভাৎ ভবতি সম্মোহ······বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি—এই বুদ্ধিনাশের ফলেই অসুর ধ্বংস হ'ল। অর্থাৎ যে কলকারখানা লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে সৃষ্ট হয়েছে তার ধ্বংস অনিবার্য্য—আত্মঘাতী হয়ে মরবেই।

মণ্টুবাবু বললেন,—তার মানে মানুর এত সাধের চালকলটা ভেঙে যাবে? এমন অভিশাপ দেবেন না, পণ্ডিতমশায়,—যদিও ঐ বেকার ভারানীগুলিকে দিয়ে মানু কিছু কাজ পাচ্ছিল—

মানুবাবু হেসে বললেন,—অন্যকে দু'পয়সা লাভ করতে দেখলে একটু গা জ্বালা করেই লোকের—মেশিন চলবেই—মেশিনের যুগে মেশিন চালাতেই হবে,—ভেজালের যুগে ভেজাল না চালালে ব্যবসা কি টিকতে পারে?

হেডমাস্টার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—বুঝলাম, আপনিও সুতোটা দেখেছেন!

ডাক্তার বললেন,—সুতো দেখেছেন মানে ?— একটা চুটকি গল্পের আঁচ পেয়ে ডাক্তার উঠে বসলেন।

মণ্টুবাবু বললেন,—অ্যালিউসনটা বলুন—

হেডমাস্টার গল্প ফাঁদলেন— দুই গুলিখোরের গুলি ফুরিয়ে গেল—কিন্তু বড্ড নেশায় ধরেছে। তারা কলকাতার এক ফুটপাথের আড়াআড়ি দু'ধারে বসে সুতো-পাকানোর ভঙ্গি করতে লাগলো। কত লোক চলে গেল—সে অদৃশ্য সুতো কেউ দেখলে না। কেউ ভাবলে পাগল,—কেউ দেখলেই না। হঠাৎ একটি লোক এসে থেমে গেল; বললে,—রাস্তায় আড়াআড়ি এরকম সুতো পাকালে লোক যাবে কি করে? দুজনে এসে তাকে ধরে বললে,—ভাই, দুটো গুলি দাও, পেট ফুলে উঠেছে। সে বললে,—তার মানে আমি গুলি খাই? আমার সঙ্গে গুলি আছে? ওরা বললে,—ভাই, এত লোক চলে গেল, এ সুতো কেউ দেখতে পায়নি, তুমি যখন দেখেছ তখন নিশ্চয়ই মাল তোমার আছে। তাই বলছি, মানুবাবু সুতোটা দেখেছেন—পণ্ডিতমশায় দেখতে পাননি এখনও।

মণ্টুবাবু বললেন,—লাভের সুতোটা যত অদৃশ্যই হোক্, মানুর চোখ এড়ায় না।

—তোমারই এড়ায় বুঝি। তাহলে কণ্ট্রাক্টরী করতে যেতে না—

ডাক্তার বললেন,—তার মানে ঐ সাবিরা এখনও সুতোটা দেখতে পায়নি?

হেডমাস্টার কম্ফোর্টার মাথায় জড়িয়ে বললেন,—ওরা দেখতে পায়নি এখনও। তা হ'লে কি আর বাড়ী বয়ে আমড়া দিয়ে যায়? যেদিন দেখবে সুতোটা—সেদিন মানুবাবুর মেশিনও চলবে না, জমিও আবাদ হবে না।

পণ্ডিত বললেন,—নিজের লাভটাই বড় কথা নয়,—সমাজের সকলের লাভ না হ'লে নিজের লাভ টেঁকেনা—আমাদের সুখটা পারস্পরিক—ব্যক্তিগত নয়। তা হ'লে কাঁকুড়গাছি থেকে শীতের রাত্রে হাসপাতালে সকলে আসি কেন?

*

ডাক্তার একটু বেলা করেই হাসপাতালে যান—বারান্দায় রোদে বসে চা খেতে খেতে সাবির বাসন-মাজা দেখেন, সে এই শীতে গায়ে আঁচল জড়িয়ে ঠাণ্ডা জলে বাসন মাজে। তিনি গরম জলে মুখ ধুয়ে গরম চা খেতে খেতে দেখেন। রমলা বসে গল্প করেন এবং চা খান—ডাক্তার সাবির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেন। রমলা ফ্লানেলের ব্লাউজের উপর স্কার্ফ গায়ে দিয়ে

রোদে বসে রয়েছেন জড়োসড়ো হয়ে। বললেন,—বড্ড শীত পড়েছে—হাত জমে যাচ্ছে—

ডাক্তার একদৃষ্টিতে সাবিকে দেখছিলেন,—সাবিকে দেখতে তাঁর খুব ভালো লাগে। চোখ দিয়ে তিনি যেন সাবিকে পান করতে চান। ডাক্তার ভেবে দেখেছেন মনে-মনে, এমন একটা মোহ তাঁর হঠাৎ হ'ল কেন? ভেবেছেন, এটা তাঁর অনুসন্ধিৎসা—গবেষণার আকাঙ্ক্ষা মাত্র। সাবিকে তাঁর ভাল লাগে—তার দেহ, স্বাস্থ্য, স্বচ্ছন্দ গমনাগমন সত্যিই সুন্দর।

রমলা বললেন,—সাবি—চা খেয়ে নে, ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

—হ, লিবেক বটে— সাবি হাঁটুর সঙ্গে মাথাটা দিয়ে চুপ করে বসে আছে—উঠছে না। রমলা বললেন,—তোর কি হ'ল? শরীর খারাপ?

সাবি কথা না বলে উঠে এল। তার পর রোদে বসে চা ও মুড়ি খেতে লাগল। ডাক্তার দেখলেন, সে যে সুতির চাদর গায়ে দিয়ে এসেছিল, সেটা দেয়ালের উপর রেখে বাসন মাজছিল। ডাক্তার বললেন,—খুব শীত পড়ছে, তোর শীত লাগে না?

—হ, জাড় ত হইছে বাবু, জাড় লাগবেক নাই?

—গায়ে কিছু দিস্‌নি কেন? চাদরটা গায়ে দিয়ে বাসন মাজতে পারতিস্—

—উঃ চাদর লিয়ে কাজ করবেক কেমনে? হ, জাড় ত লেই, রোদ উঠেছে বটে—

সাবি ঠির ঠির করে কাঁপছে না,—শীতে জড়োসড়োও হয়নি। রমলা রোদে ব'সে জামা-স্কার্ফ গায়ে দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসেও কাঁপছেন।

ডাক্তার বললেন,—শীত তোর লাগছে না?

—কাজ কর কেনে, শীত কোথা পালাবেক। যেতে বসবি, তেতে শীত তুকে ধরবেক—

রমলা হঠাৎ বললেন,—হ্যাঁরে সাবি, তোর ছেলেপুলে হবে নাকি?

সাবি মাথা নীচু করে হাসলে। রমলা আবার বললেন,—বল্ না, তোর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে—

সাবি লজ্জিত ও আনত মুখে বললে,—হ, শুনছি—

—তুই জানিস্ না?

—হ, জানছি ত বটে।

ডাক্তার বললেন,—তা ভালই ত। তোর কোন ভাবনা নেই, হাসপাতালে

আসবি। এখানে প্রসবের সময় ওষুধপত্র, খাওয়া সব পাবি। কোন খরচ নেই—কোন ভয় নেই।—আমি থাকবো, দিদিমণিরা সব থাকবে—

সাবি একটু কঠিন কণ্ঠে বললে,—হ, হাসপাতালকে আসবেক কেনে? মোর রোগ হইছে বটি?

—তবু যদি বিপদ হয়। কত কি হতে পারে তখন—খরচ নেই, সরকারী পয়সায় খাবি, তা আসবি না কেন?

—হ, কি হইছে? গাঁকে এত ছাওয়াল হলেক, কোন্‌টি হাসপাতালকে আইছে? উ মোরা আসবেক নাই। উ সব ভদ্দর নোকের বৌরা আসবেক, উদের কেতে সব হতে লাগছে—

—তোরা হাসপাতাল তৈরি করলি ইট কেটে, তোরা আসবিনে?

—মোদের লেগে করি নাই বাবু, তুদের লেগে করলেক—ওয়া মোদের লাগবেক নাই।

— ঐ জন্যেই ত তোদের গায়ে সব ছেলেপুলে হ'য়েই মরে যায়, নষ্ট হয়ে যায়—

সাবি রুষ্টকণ্ঠে বললে,—মরতে লেগেছে—হ—কোথাকে শুনছিস্? গাঁকে চার-পাঁচবছর বাদ্‌কে ছাওয়াল হচ্ছে,—ভদ্দর নোকের ত বছর-বছর হচ্ছে, উ বাঁচবেক কেনে?

ডাক্তার শুনলেন,—চেয়ে চেয়ে দেখলেন—সাবি মুড়ির সঙ্গে চা খাচ্ছে। উঠোনের বাঁধানো জায়গায় সে বসেছে। রমলা বললেন,—হাসপাতালে যাবে না?

—যাবো। বড্ড শীত, রোদ ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। তিনি ঘরে উঠে গিয়ে কোট-প্যান্ট পরে হাসপাতালে রওনা দেওয়ার আগে প্রশ্ন করলেন,—কেমন আছ?

—অনেকটা ভালই ত মনে হচ্ছে।

—সে কি গো, শেষে হেডমাস্টারেরই জয়-জয়কার হ'ল। লোকে বলবে কি?— ডাক্তার স্টেথস্কোপ প্যান্টের পকেটে গুঁজে হাসপাতালে গেলেন।

হাসপাতালে রোগী নেই—তিন-চারজন পুরানো হেঁপো-ফোলা রোগী মাত্র। তাদের ওষুধ দিয়ে বসে ছিলেন। বাসন্তীদেবী দু'বার এসে প্রশ্ন করে গেলেন রোগিণী সম্বন্ধে। হাসপাতালে দুটি মাত্র প্রসূতি ছিল। তাদেরও ছেড়ে দেওয়ার সময় হয়েছে—

ডাক্তার ভাবছিলেন রমলার অসুখটা এ-মাসে আর বেশী হয়নি, অথচ তিনি এতদিন বৃথা চেষ্টা করেছেন—তিনি পরিহাস করেছিলেন হেডমাস্টারকে, কিন্তু এমনভাবে পরাজয়টা আসবে ভাবেননি। হঠাৎ সাবির কথা তাঁর মনে হ'ল,—একটা রুদ্ধকণ্ঠ দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা যেন ঝড়ের মত মনে ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছে। রুগ্ন রমলার পাশে সাবিকে দেখে দেখে তাঁর মন বিদ্রোহ করে। সাবি তাঁর পায়ে ধরেছিল,—আত্মসম্মানের প্রশ্ন রয়েছে…

ডাক্তার বললেন,—মধু, সাবিকে ডেকে নিয়ে আয় ত—

মধু সাবিকে ডেকে নিয়ে এল, ডাক্তার হাসপাতালের টেবিলে তাকে শুইয়ে তার পরীক্ষা করলেন। রক্তের চাপ দেখলেন,—রক্ত নিলেন। এবং পরিশেষে কি যেন একটা ইন্‌জেকশন করে দিয়ে বললেন,—যা।

সাবি উঠে বসে হেসে বললে,—উ, স্থচ দিলি কেনে,—ব্যথা হবেক নাই ?

ডাক্তার সংক্ষেপে বললেন,—ও কিছু না।

সাবি চলে গেল।

রমলা তাকে প্রশ্ন করলে—সাবি হাতের ইন্‌জেক শনের জায়গা দেখিয়ে বললে,—বাবু স্থচ দিলে কেনে বল ত! মোর ত রোগ নাই,—কেনে দিলে বল না—

রমলা বিরক্ত হ'য়ে বললেন,—আমি জানবো কি করে? ডাক্তারের মাথা খারাপ হ'য়েছে—

সাবি হি-হি করে হেসে বললে,—হ, মাথা খারাপ বটে,—কত লিখাপড়া জানছে!

সাবি কাজ সেরে চলে গেল। সাবির সঙ্গে এই নৈকট্য ও অনাবশ্যক ঘনিষ্ঠতা রমলার মনকে উত্তেজিত করে তুলেছিল। হাসপাতাল থেকে ফিরতেই ডাক্তারকে বললেন,—সাবিকে ইন্‌জেকশন করলে কেন, শুধু শুধু—ওকে অমন করে দেখ কেন ?

ডাক্তার বললেন,—এ কথা অন্ততঃ গ্রাজুয়েট একজন মহিলার বলা শোভা পায় না। বললুম ত রিসার্চ করছি—কোন জিনিষ দেখবো। সাধারণ মেয়ের মত তুমি সন্দেহ করছো নাকি!

রমলার শিক্ষাভিমান আহত হয়েছিল,—না, সে যতই হোক মেয়েমানুষ, আর তোমার চারিপাশে যারা সবই গ্রাজুয়েট নয়।

—ওদের কথায় কি আসে যায়?

—না যাক্, একটা জীবন নিয়ে খেলা করা কি ঠিক হচ্ছে?

বাদানুবাদটা ক্রমশঃ একটু উচ্চ পর্দায় যেতে আরম্ভ করল। রমলা বললেন,—কি ইন্‌জেকশন করলে, কেনই বা করলে? এখন দু'দিন পড়ে থাকলে কে বাসন মাজবে?

—মধুর বৌ করে দিবে বলেছে। দু'একদিন ওর কামাই হবে মনে হয়—ডাক্তার আর কোন কথা বললেন না।

দুপুরে খাওয়ার পর ডাক্তার বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ভালকুড়ির জঙ্গলে। একটা বড় পলাশগাছের সঙ্গে সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রেখে ডাক্তার বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কেন? কি উদ্দেশ্য ঠিক জানেন না,—তবে এই জঙ্গলটা মাঝে মাঝে তাকে দুর্নিবার আকর্ষণে টানে।

শীতের রৌদ্র স্তিমিত হয়ে এসেছে জঙ্গলের মাঝে। আলোছায়ায় উচ্চাবচ বনভূমি বিস্তীর্ণ বাঘছালের মত পড়ে রয়েছে, একটা অসীম স্তব্ধতা স্বর্ণশ্যাম ডানা মেলে ভালকুড়িকে ঢেকে রেখেছে, মাঝে মাঝে পশ্চিমা হাওয়ায় বনভূমি কেঁপে উঠছে,—সামান্য পাতার শব্দ বিরাট হ'য়ে উঠে চম্‌কে দেয় পথচারীকে, জুতার নীচের শুকনো পাতায় শব্দ ডাল-ভাঙার শব্দের মত মড়মড় করে ওঠে—ডাক্তার একটা গাছের ছায়ায় ব'সে বন্দুকটায় টোটা ভরলেন—বন্দুকটা গাছের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রেখে সিগারেট ধরালেন।

নিবিড় বনের মাঝে ছোট্ট সবুজ পাখী দু'একটি টিকৃটিক্ করছে। একটা কেমন পচা গন্ধ ভেসে আসলো কোথা থেকে—একটু ভয় হ'ল তাঁর মনে। শুনেছেন বাঘের গায়ে পচা গন্ধ থাকে—তবে এ জঙ্গলে বাঘ ত আসে না।

একটা শেয়াল দৌড়ে গেল। পিছনে মট্‌মট্ শব্দ হ'ল কয়েকবার—জঙ্গলটা নড়ছে। তিনি বন্দুকটা হাতে করলেন। তাকিয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ, তার পর শুনলেন মনুষ্যকণ্ঠ।

ওরা বেরিয়ে এল। ডাক্তার ডাকলেন,—এাদকে আয়—

একটি যুবক ও একটি যুবতী বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে দু'বোঝা কাঠ মাথায় করে। ডাক্তার প্রশ্ন করলেন,—তোদের নাম কি?

—মোর নাম সাধু বাউরী,—উ মোর বৌ—তরী।

ডাক্তার বললেন,—বস্ তোরা।

সাধু ভয়ে ভয়ে বলল,—মোরা গাঁকে যাবেক নাই ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার বুঝলেন ওরা তাকে চেনে। বললেন,—তোদের বাড়ী কোথা?

—উই ঘোড়ামারা—মোদের সাবি তুর হোথা কামিন বটে।

ডাক্তার দেখলেন তরীকে চেয়ে চেয়ে, সাবির মতই স্বাস্থ্য। তরী পূর্ণ-গর্ভবতী বলে মনে হয়। ডাক্তার বললেন,—ওর ত ছেলেপুলে হবে, ওকে দিয়ে কাঠ বওয়াচ্ছিস্ কেন?

তরী বললে,—উতে কি হবেক? মোরা ত কাট কাটছি বটে।

সাধু বললে,—ঐ মানিকের বৌটা ত বনকেই ছেলে হওয়ালেক,—ছাওয়াল আর কাট লিয়ে ঘরকে গেলেক—

ডাক্তার চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ। তার পরে বললেন,—তরী, দেখি তোকে—

ডাক্তার নাড়ী দেখলেন,—স্টেথিস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করলেন। মনটা ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠলো তাঁর। ডাক্তার কাঠের বোঝাটা তুলে দেখলেন,—এক মণ হবেই।

সাধু ভয়ে ভয়ে বলল,—বাবু, মোরা গাঁয়ে যাবেক—

ডাক্তার বললেন,—যা,—প্রসবের সময় হাসপাতালে যাবি—কোন খরচ নেই—

তরী হেসে বললে,—মোর কি রোগ হইছে বটে, হাসপাতালকে যাবেক কেনে?

—পচা গন্ধ কিসের মাঝে মাঝে পাচ্ছি—

সাধু বললে,—ময়াল সাপ হাই তুলতে লাগছে, তাই পচা গন্ধ। উ বনকে রইছে না—

তরী আর সাধু বোঝা দু'টো তুলে নিয়ে ত্বরিৎপদে চলে গেল।

ডাক্তার তেমনিই বসে রইলেন—নানা ভাবনা জড়ো হ'য়েছে মনে। পণ্ডিতের কথাই কি সত্যি? প্রকৃতির থেকে নির্ব্বাসিত হয়েই কি মানুষ রোগ-ব্যাধি অর্জ্জন করেছে? এত জ্ঞান-বিজ্ঞান একি ব্যর্থ? মানুষ আজ মহাশূন্য জয় করতে চলেছে—এ সবই কি ব্যর্থ!

সূর্য্য অস্তমিত হয়ে আসে,—গাছের ছায়াগুলি দীর্ঘতর হ'য়ে পড়েছে সামনের খোলা জায়গায়। ছায়ায় বসে থাকতে শীত-শীত করছে। অন্ধকার নেমে আসছে ধীরে ধীরে,—তিতিরের কলরব থেমে গেছে। ডাক্তার বসেই ছিলেন, টোটা-ভরা বন্দুকটা কোলের উপর রয়েছে। হঠাৎ দেখলেন দুটো সাদা শশক আর তাদের দুটো ছানা বনের প্রান্তে খেলা করছে। এমন শিকার হঠাৎ মেলে না, তিনি বন্দুক তুলে ধরলেন।

হঠাৎ মনে হ'ল প্রকৃতির রাজ্যে এই অনাচার করে লাভ কি? ভীরু

সাবিকে সেদিন তিনি ত্যাগ করে গেছেন আত্মসম্মানের জন্যে ;—ওরা মূক, কথা বলতে পারলে না। তিনি বন্দুক নামিয়ে টোটা খুলে ফেললেন।

উঠে পড়ে বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে সাইকেলের নিকটবর্ত্তী হ'য়ে দেখেন সাইকেলটা নেই। কি হ'ল! এই জঙ্গলে কে সাইকেল নিলে? তিনি গাছটাকে দেখলেন—আশেপাশে দেখলেন—

বনের মাঝে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। শেষে বন থেকে বেরুনোই কষ্ট হবে—তিনি দিক ঠিক করে হাঁটতে লাগলেন।

কিছুদূর এগিয়ে দেখেন বনের প্রান্তে অস্তমিত সূর্য্যে কি যেন চিক্‌চিক্‌ করছে—হ্যাঁ, তারই সাইকেল। ঠিকই সেই পলাশ গাছে ঠেস দেওয়া রয়েছে—তাঁর গাছ ও স্থান ভুল হয়েছিল।

ডাক্তার হাসলেন মনে মনে, এমন ভুল হয় কেন? নিজেই সমাধান করলেন—গাছ অনেকই একরকম, বনের চেহারাও অনেক স্থানেই একরকম। হেসে মনে মনে বললেন,—প্রকৃতির রাজ্য তাঁদের জন্যে নয়—এখানে আসলে পথ ভুল হবে।

সাইকেল চেপে চললেন জগৎপুরের ডাঙার দিকে। অন্ধকার হবে বলে দ্রুত সাইকেল চালাচ্ছেন। পথে সাবির সঙ্গে দেখা, সে কাজ করে ফিরছে।

ডাক্তার অবাক হলেন ; সাইকেল থেকে নেমে বললেন,—কোথা গিয়েছিলি সাবি?

—তুর হোথা কাম করলেক,—ঘরকে যাই—

ডাক্তার অবাক হলেন আরও। সাবি হি-হি করে হেসে বললে,—কি সুচ দিলি তু, মাথাটো ঘুরতে লেগেছে কেনে?

—শুধু মাথাই ঘুরছে? আর কিছু হয়নি সাবি?

—না, মাথাটো ঘুরছে বটে,—নেশা করলেক মনকে নিচ্ছে।

সাবি হনহন করে চললো, ঘোড়ামারার দিকে। ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাইকেলে উঠলেন। তাঁর আন্দাজ মত সাবির এতক্ষণ শয্যাগ্রহণ করা উচিত, কিন্তু সে দু'মাইল এসে নিত্যকর্ম্ম করে ফিরছে! ডাক্তার ভাবলেন,—এই প্রতিরোধ-শক্তি ওরা পেলে কোথায়? আকাশ বাতাস রৌদ্র আর মৃত্তিকার থেকে? এই প্রশ্নই তাঁর মনে জাগে বার বার।

*

সেদিনকার সান্ধ্য-বৈঠকে যেয়েই ডাক্তার বললেন,—হেডমাস্টারমশায়, আপনার হোমিওপ্যাথিতে কাজ হ'য়েছে। অনেকটা ভাল, মানে, গ্লুকোজ দিতে হয়নি, রাঁধতেও হয়নি—

পণ্ডিতমশায় বললেন,—হতেই হবে, এ প্রাকৃতিক ওষুধ, প্রকৃতির উপর কাজ করতেই হবে।

মানুবাবু বললেন,—অর্থাৎ হোমিওপ্যাথি হচ্ছে মহামায়ার অংশ—

মণ্টুবাবু বললেন,—হ্যাঁ, আর অ্যালোপ্যাথি হচ্ছে শুম্ভ-নিশুম্ভ।

পণ্ডিতমশায় বললেন,—তা নয়, শুম্ভ-নিশুম্ভ অর্থাৎ ঐ কলকারখানার একজন বড় সেনাপতি অর্থাৎ চণ্ডমুণ্ড-জাতীয়—অর্থাৎ সহচর, অর্থাৎ—

মানুবাবু বললেন,—অর্থাৎ বিজ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী অবদান।

পণ্ডিত বললেন,—আজকার কাগজে দেখলুম যক্ষ্মা-হাসপাতাল হচ্ছে দেশময়। তার সিল-বিক্রির জন্যে টিকিট এসেছে স্কুলে। ঐ টাকাগুলো বাজে খরচ না ক'রে যদি দেশের লোককে পেট ভরে খেতে দিত, তবে রোগটা হতেই পারতো না। গাছের গোড়া কেটে মাথায় জল ঢালা হচ্ছে। আপনাদের নগর শুষে নিল গাঁয়ের খাবার—তারা মরলো, আর নগর মরলো প্রকৃতি ছাড়া হয়ে যক্ষ্মায়।

মানুবাবু রেগে বললেন,—সে ত নয় ভারতবর্ষে, বিলেতে আমেরিকায় কি হয়?

—সেথা ত যাইনি, তবে যক্ষ্মা না হোক্ অন্য রোগ আছেই—আর এই যে চার্ব্বঙ্গী চপলাপাঙ্গী সাবির দল, এরা ত নেচে কুঁদে বেড়াচ্ছে পরমানন্দে—নীরোগ, নিঃশঙ্ক, স্বাধীন—

মণ্টুবাবু টিপ্পনী করলেন,—মানু কল বিক্রি করে দিয়ে, একশো' ঢেঁকি বসিয়ে দাও—একশো চার্ব্বাঙ্গী চপলাপাঙ্গী সাবিকে লাগাও কাজে—

ডাক্তার বাধা দিয়ে বললেন,—প্রসঙ্গটা ছেড়ে যাচ্ছেন। হেডমাস্টারের কাছে যে আমার পরাজয় ঘটল, এ সম্বন্ধে আলোচনা হবে।

হেডমাস্টার বললেন,—পরাজয় হয়নি, হবেও না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়ত এটা ভাল কাজ করে, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত ওটা। তাই বলে যদি সন্তান-প্রসবে গোলমাল হ'ত, তবে কি আর সারতো? সেটা সার্জ্জারীর ব্যাপার—

ডাক্তার বললেন,—এটা সালিশ-মধ্যস্থতার কথা নয়। সার্জ্জারী ভিন্ন জিনিষ, কিন্তু মেডিসিন নিয়ে এ পরাজয় কেন হ'ল?

মান্নবাবু বললেন,—পরাজয় কোথায়? আপনি হয়ত ঠিক করতে পারেন নি, অন্য ডাক্তার পারতেন।

—বড় বড় চিকিৎসকও দেখিয়েছি—

পণ্ডিত বললেন,—ওটা কিছু কাজের কথা নয়। আসল কথা প্রকৃতি,—ঐ ওষুধটা শ্রীমতী ডাক্তারের প্রকৃতিকে সাহায্য করেছে, আপনার ওষুধ বিরুদ্ধ হয়েছে। যেমন, কুইনাইন সকলেই খায়—কিন্তু একজন কুইনাইন খেলে সাংঘাতিক অবস্থা হয়—অর্থাৎ প্রকৃতি বুঝে ব্যাপার হয়—

হেডমাস্টার বললেন,—যেমন মাটিতে ধান পড়লে গাছ হয়, মরুভূমির বালিতে পড়লে খই হয়।

ডাক্তার বললেন,—সাবিকে জোর করে একটা ইন্‌জেকসন দিয়েছিলাম তাতে নিশ্চিত শয্যাশায়ী হওয়ার কথা, কিন্তু বেটী ঠিক কাজে এসেছে। এতটা সামলালে কি ক'রে—এই ত সমস্যা—

পণ্ডিত বললেন,—পঞ্চভূতের দেহ, পঞ্চভূতের মাঝেই আছে—আকাশ জল হাওয়া মাটি রোদ—কাজেই শক্তিহীন ওরা হয়নি—ব্রাত্যদোষ ওদের ঘটেনি জীবনে। প্রকৃতির থেকে যদি মানুষের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে প্রকৃতিহীন সে বাঁচে কি করে?

মণ্টুবাবু বললেন,—মান্নু কিছু বল—

—কি বলবো? সংস্কারের বিরুদ্ধে কোন যুক্তিই চলে না। যারা অন্যের ছোঁয়া খায় না, মানুষের দেওয়া জল খায় না—তাদের সঙ্গে তর্ক বৃথা।

পণ্ডিত বললেন,—সংস্কারহীন যারা তারাই যুক্তিহীন। সংস্কারও যেমন ব্যাধি, সংস্কারহীনতাও ব্যাধি। তবে এটা জানবেন মণ্টুবাবু, আমাদের জ্ঞাত জগতের বাইরেও একটা অজ্ঞাত অতীন্দ্রিয় জগৎ আছে, তার প্রভাব আমাদের জীবনের সর্ব্বত্র।

ডাক্তার বললেন,—অর্থাৎ? প্রকৃতি-প্রসূত মানুষ প্রকৃতি-চ্যুত হ'লেই সে পাতিত্য-দোষে দুষ্ট—

—যেমন ধরুন, আধ্যাত্মিক জগৎ। যেমন সাধু-সন্ন্যাসীর অনেক গুণাবলী শোনা যায়—বদ্রিনারায়ণে খালি গায়ে রয়েছে কত সাধু। এ শক্তি তাদের অর্জ্জিত, কিন্তু স্থূল যুক্তি দ্বারা তা বোধগম্য নয়। বহু বিভূতি দেখা যায় তাদের, কে তার ব্যাখ্যা দিতে পারে?

মান্নবাবু বললেন,—বুজরুকি, ম্যাজিক ওসব। শোনা কথা—গালগল্প। কেউ দেখেছেন কিছু—

হেডমাস্টার বললেন,—উ সব চলা যায়েগা—মাথাটাই চলে গেল শেষে।

চুটকী গল্পের অবতারণা শুনে সকলে নড়ে চড়ে বসলেন। গল্প চললো। এক সাধু, বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ। তাঁর কাছে এক দরিদ্র লোক ধর্ণা দিল অর্থ-লাভের আশায়। কিন্তু সাধুর ধ্যানভঙ্গ হয় দ্বাদশবর্ষ পরে। বারো বছর অপেক্ষা করার পরে সাধু চোখ খুললেন—লোকটি নিবেদন জানালো। সাধু বললেন—ঠারো। আবার চোখ বুজলেন বারো বছরের মত। লোকটি অপেক্ষা করতে করতে বুড়ো হ'তে চলেছে, ভাবছে এখন আর টাকা দিয়েই বা কি হবে! সাধুও চোখ মেলেন না—সে বিরক্ত হ'য়ে উঠল। এর মধ্যে সাধু চোখ খুলে বললেন,—কেয়া বেটা? ও বললে,—কি আর চাইব,—চাই আমার মাথা। সাধু বললেন,—ও হো যায়েগা। দেখতে দেখতে লোকটার সর্ব্বাঙ্গে ছোট-বড় মাথা ঝুলতে লাগলো—এ নিয়ে ঘরেই বা যায় কি করে? আবার বারো বছর দেরী করলে; সাধু চোখ চাইতেই বললে,—ঠাকুর, কি করলে! এ চেহারা নিয়ে ঘরে যাই কি করে? মাথাগুলো খুলে দাও— সাধু বললেন,—ও সব চলা যায়েগা। যাঃ, লোকটার নিজের মাথাটাও সেই সঙ্গে চলে গেল।

সকলে রোজকার মত হেসে উঠলেন। মণ্টুবাবু বললেন,—গল্পটা বুঝলে, মানু? বাক্‌সিদ্ধ সাধুটি তোমার বিজ্ঞান—আর অর্থকামী লোকটি হ'লে তুমি।

হেডমাস্টার মাথায় কম্ফোর্টার জড়াতে জড়াতে উঠে দাঁড়িয়ে ছড়িটা হাতে নিয়ে বললেন,—না মানুবাবু, এ একটা গল্প। এতে শ্লেষ-বিদ্রূপ নেই।

*

দিন যায়—

সাবি নিয়মিত কাজ করতে আসে। জগৎপুরের ডাঙায় হাসপাতাল চলছে,—জিপ-গাড়ী ধুলো উড়িয়ে যায় মাঝে মাঝে। তার পশ্চিমে পড়ে আছে তন্দ্রাচ্ছন্ন বিস্তৃত ভালকুড়ি আর তার কোলের অরণ্য,—তারই প্রান্তে ঘোড়ামারায় মাদল বাজে মহুয়ার মদের সঙ্গে। জীবন চলে একইভাবে— হাসপাতালের কর্ম্মময় বৈজ্ঞানিক জীবনের পাশে আরণ্য-শিশুগণের অজ্ঞাত জীবন। এই অরণ্যের নীরবতা, তার অজ্ঞাত বৈচিত্র্য ডাক্তারকে টেনে নিয়ে যায় মাঝে মাঝে ভালকুড়ির জঙ্গলে,—তিনি টোটা-ভরা বন্দুক কোলে করে বসে দেখেন—পাখীর প্রেম বিরহ বেদনা, শশক-শিশুর ক্ষিপ্রতা, তিতিরের চাতুর্য্য,—সাপের আনাগোনা। গাছের পাতার ঝিরঝির শব্দ,—অঙ্কুর,

পুষ্প, ফল। তিনি স্তব্ধ ধ্যানমগ্ন হয়ে দেখেন কি বিচিত্র এই অরণ্য জীবন। মাঝে মাঝে মানুষ আসে,—তারাও ওই বনের সঙ্গে একীভূত হ'য়ে গেছে জীবনে। তাদের আরণ্য হিংস্রতা, আরণ্য প্রেম-প্রীতি—

পশ্চিমা বাতাসের দিক ঘুরেছে—শীতান্তে মাঝে মাঝে দক্ষিণ থেকে দমকা গরম হাওয়া বইতে থাকে। গাছগুলি পাতা ছাড়তে আরম্ভ করেছে,—নতুন পাতা নিয়ে বসন্তের আগমনে নতুন পোষাক পরবে। পলাশবনে কুঁড়ি এসেছে,—পাহাড়ের কোলে কোলে সবুজ বনে আবির ছড়িয়ে দিয়েছে তারা। ঝরা পাতা বাতাসে উড়ে উড়ে মাঝে মাঝে স্তূপাকার হ'য়ে রয়েছে,—নীচু জায়গায় পড়ে রয়েছে। প'চে তারা ভরাট করবে গর্ত্তটা—

ডাক্তার মহুয়াগাছের তলায় ব'সে গাছ হেলান দিয়ে দেখেন—পৃথিবীর রং ফিরছে। সবুজ সুন্দর বনশ্রেণী তামাটে ধূসর হ'য়ে উঠছে ধীরে ধীরে। পাখীগুলো খড়কুটো জোগাড় করতে সুরু করছে—ময়াল সাপ বেরিয়ে রোদ পোহায় জঙ্গলের ফাঁকে। পাখীগুলো ঝাপ্‌টা-ঝাপ্‌টি করে তাদের স্ত্রীধন নিয়ে। লম্বা গলা নিয়ে বক এগিয়ে যায়—বন্য শেয়ালের গায়ে ঠোকর দেয়—শেয়াল শুয়ে পড়ে পরম আরামে। বক আঁটালু খুঁটে দেয়। বানরী বসে থাকে—সন্তান খেলা করে, গাছে ওঠে—বানর বসে বসে বানরীর উকুন মারে—

ডাক্তারের মনে হয়, এ খবরের কাগজের মত অন্তহীন মহাকাব্য, সমাপ্তিহীন ধারাবাহিক উপন্যাস। বনের পাতায় পাতায় তার দাগ কেটে চলেছে। এ ছাপার হরফে বাঁধা, সোনার জলে নাম-লেখা দুপুরের নিদ্রাসঙ্গী উপন্যাস নয়,—এ এক বর্ণ ও ভাবসিন্ধু।

ডাক্তার বন্দুক নিয়ে দেখছিলেন,—একটা ছাতার তার প্রণয়িনীকে ভুলাবার জন্যে কেমন পুচ্ছ ও পক্ষ বিস্তার করে নাচছে। ছাতারীটা বসে বসে দেখছে, আর উড়ে যাচ্ছে—

তিতির বেরিয়ে এল একজোড়া, ঘনচঞ্চু চুম্বনের মাঝে নিভৃতে কি যেন বললো, তার পরে তারা মিলিত হল অরণ্যের বনচ্ছায়ে। গলা ফুলিয়ে ফুলিয়ে কি যেন বলে ওরা,—বন-টিয়া কিচ্‌কিচ্‌ করে ওঠে। একটা বৃহৎ তিতির এসে তাড়া করে উচ্চপুচ্ছ তিতিরটিকে,—সে ভয়ে সঙ্কুচিত হয়। ডাক্তার হাসেন মনে মনে—ব্যভিচার—পরকীয়া,—স্ত্রী-তিতিরটি ভালমানুষের মত বড় তিতিরের সঙ্গ ধরে—

ডাক্তার বন্দুক তুলে ধরেন বড় তিতিরটিকে লক্ষ্য করে—ঘোড়া টিপবেন। পিছনে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেয়ে বন্দুক নামিয়ে ফিরে তাকান।

একটি নয়,—দুটি জীবের ঘননিশ্বাস বনভূমির নিস্তব্ধতার মাঝে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে—গভীর রাত্রের দেওয়াল-ঘড়ির শব্দের মত।

ডাক্তার চোখ দিয়ে খুঁজতে থাকেন,—এ যেন মানুষের দীর্ঘশ্বাস। নিঃশব্দ নির্জ্জন এই অরণ্যের দীর্ঘশ্বাস এ নয়। ডাক্তার ভয় পাননি,—প্রত্যক্ষ দিবালোক, —গাছের ছায়াগুলি লম্বা হয়ে পড়েছে পুবের দিকে। ডাক্তার দেখেন ভাল করে পাতার ফাঁক দিয়ে—একটু দূরে জঙ্গলের প্রান্তে বৃক্ষচ্ছায়ায় দুটি নরনারী—তাদের গভীর দীর্ঘশ্বাস বনভূমিকে ব্যথিত করে তুলেছে।

নারী কেঁদে বললে মৃদুকণ্ঠে,—তু ভালবাসলি কেনে? তুর ত বিয়া হইছে—

—মোর মন তুকে ভুলতে নারলে—তুকে ছাড়তে লারি—হেথা মোরা দুটি মিলবো—

—হ, লোকে কি বলবেক?

—হেথা ত বন রে, হেথা মনিষ আস্‌বেক নাই—

নারী বললে,—তু ভুল কেনে—ঘর করবি না—তুর তরী রইছে।

নারীর চোখে জল—

নর বললে,—ভুলতে লারি, তাইতো কাঁদতে লাগছি রে!

নরের চোখে জল।

পাণ্ডুর বনভূমি আর্দ্র হ'য়ে উঠেছে তাদের চোখের জলে।

নর অভিমানে চলে গেল—বনের ফাঁকে ফাঁকে জড়িত পদক্ষেপে—চোখ মুছতে মুছতে। নারী উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল সেই দিকে,—তার পর আঁচলে চোখ মুছে, বনভূমিকে সচকিত করে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

ডাক্তার ডাকলেন,—সাবি, শোন—

সাবি চম্‌কে ফিরে দাঁড়ালো—ম্লান হাসতে চেষ্টা করে বললে,—তু ডাক্তার হেথা রইছিস্ বটে—

—হ্যাঁ, এদিকে আয়।

সাবি ধীরে ধীরে উঠে এল।

—কোথা যাবি এখন?

—তুর ঘরকে কাজ করবেক—হোথা যাবেক বটে।

তার চোখের জল শুকায়নি তখনও। সে যাবে দৈনিন্দন কাজ করতে। দু'বেলা চার মাইল হেঁটে, তিন ঘণ্টা কাজ করে সে মাসে পায় পাঁচটাকা। রোগ-ব্যাধিকে জয় করেছে তাই ওরা।

—তোর সঙ্গে কে ছিল ?

—উ সাধু—

—সাধু কে ? ঐ সাধুর বৌ তরী ?

—হ্যাঁ বটে !

—ও কাঁদলে কেন ?

—উ মোকে ভালবাসলে,—মোকে সাঙ্গা করতে লারলে তাই কাঁদলেক।

—তুই কাঁদালি কেন ?

সাবি হেসে বললে,—উ কাঁদলেক বটে, তাই মু-ও কাঁদলেক।

—তুই ওকে ভালবাসিস না ?

—হু, ভালবাসছি ত! মোর ত মনিষ রইছে— সাবি একটু হাসলে। তার পর বললে,—মোরা ত ছোটলোক বটি, তু ডাক্তার ভদ্দরলোক উ জানছিস্ কেনে ? মু যাচ্ছি—

সাবি চলে গেল—

ডাক্তার আবার অরণ্যের বিচিত্র খেলা দেখতে সুরু করলেন—ভাবলেন অনেক কথা। আজ যেন প্রথম তাঁর মনে হ'ল, রমলাকে নিয়ে তাঁর জীবন বোধহয় ভরে ওঠেনি—রোগক্লিন্ন দেহ যেন তাঁর জীবনকে তৃপ্তি দিতে পারেনি।

বড় তিতিরটা ক্যাঁক ক্যাঁক করে তাড়া করলে অন্য একটা তিতিরকে। এই পাশবিক জবরদস্তিতে তিনি মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে বন্দুক তুলে ধরলেন। তিতিরটা থম্‌কে বুক পেতে দাঁড়ালো তার দিকে চেয়ে—

ডাক্তারের বন্দুক গর্জন করতেই তিতির ধুলায় লুটিয়ে পড়ল। ডাক্তার শিকার নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা দিলেন। শিকার করে মনটা যেন তাঁর আজ তৃপ্তি পেয়েছে এমনি একটা আনন্দে সাইকেলে উঠলেন।

*

দিনের পরে আসে রাত্রি। শুক্লপক্ষের পর কৃষ্ণপক্ষ—

শীতের পরে ভালকুড়ির অরণ্য, সবুজ প্রান্তর পাণ্ডুর রুক্ষ হ'য়ে উঠেছে। জগৎপুরের ডাঙার উপর দিয়ে ধুলোর ঝড় বয়ে যায়,—বৈশাখের অপরাহ্নে ভৈরব গর্জ্জনে আসে কালবৈশাখী। হাসপাতালের টিনের চালের উপর দামামা বাজিয়ে যায় বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা। রুক্ষ নিষ্ঠুর 'লু'-হাওয়ায় প্রান্তর ফেটে চৌচির হ'য়ে যায়। সাবি ১১৪° ডিগ্রী গরমেও নিয়মিত আসে, নিয়মিত কাজ করে যায়। গরম হাওয়ার ভয়ে যখন জগৎপুরের ডাঙায় দরজা-জানালা বন্ধ, তখন সাবি ঘোড়ামারা থেকে প্রান্তর পার হ'য়ে

খালি পায়ে আসে ডাক্তারের বাড়ীতে। সবার নাক দিয়ে রক্ত পড়ে,—লোকের পরামর্শ মত বিউলির ডাল আর তেঁতুলের অম্বল খেতে সুরু করেন ডাক্তার। রক্তপড়া বন্ধ হয়, কিন্তু মন বিদ্রোহ করে খাবার সময়। অপরাহ্নের রোদে বসে সাবি বাসন মাজে—ডাক্তার পাখা নিয়ে তখন বটতলায় মোড়া পেতে বসে হাওয়া খান। ডাক্তার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন,—সাবির দেহের কোন পরিবর্ত্তনই হয়নি—আর-একটি প্রাণী যে তার জঠরে বাড়ছে, তা যেন সে বোঝে না—জানে না।

সাবি বন থেকে একদিন পিয়াল দিয়ে গিয়েছিল হাটের দিনে—দাম নেয়নি। দামের কথা বললে, সে বলেছিল,—তুদের কত খেচ্ছি, মোরা গরীব, কি দেবেক তুদের—

নোটন হাসপাতালে এসে একমাস চিকিৎসা করিয়ে গেছে তার ব্যাধির—তার পর গ্রাম ছেড়ে কোথায় যেন সে গেছে কেউ জানে না—বা জানলেও, বলে না।

ডাক্তার বিকেলে পায়চারী করেন ডাঙার উপর। বৈশাখী-ঝড় পাতা জড়ো করেছে এখানে, ওখানে জড়ো করেছে একরাশ বালি। দমকা হাওয়ায় কাঁকর পর্য্যন্ত ছুটে ছুরির ফলার মত গায়ে লাগে—তাও তিনি দেখেছেন। তিনি বারান্দায় বসে বসে দেখেন, এই নিদারুণ গরমে বেলা দুটো পর্য্যন্ত ওরা সার নিয়ে মাঠে যায় জমিতে সার দিতে। ছাতা ওদের নেই—মাথায় গামছা বেঁধে গরুকে চালায়—গরু হাঁপিয়ে ওঠে, চলতে চায় না।

তার পর এসেছে বর্ষা।

দক্ষিণ-পুবের মাঠ থেকে ঘন নীল-কালো মেঘ উঠে আসে—বুক থেকে মধু ঝরে পড়ে তৃষিত পৃথিবীতে। রুক্ষ পাণ্ডুর প্রান্তর সবুজ হয়ে ওঠে—ওদের প্রাণসঞ্চার হ'য়েছে নতুন করে। জলস্রোত আপনার পথ করে চলে,—বৈশাখী ঝড়ের জমাকরা বালি ধুয়ে নিয়ে যায় নীচের দিকে।

সাবি আসে খুব ভোরে, কাজ সেরে দিয়ে মাঠে যায় ধান পুঁততে। সারাদিন মাঠে ধান পোঁতে। মুড়ি খেয়ে দিনটা কাটায়, সন্ধ্যার একটু আগে এসে চট্‌পট থালা-বাসন মেজে দিয়ে চলে যায় অন্ধকারে ঘোড়ামারায়—কোনদিন ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজে, কোনদিন ভিজা কাপড়েই আসে কাজ করতে—

সেদিন সকালে রিম্ রিম্ বৃষ্টি হচ্ছিল,—ডাক্তার আর রমলা বারান্দায় বসে মেদুর আকাশ আর আর্দ্র পৃথিবীকে দেখছিলেন,—জল বয়ে যাচ্ছে

ছাঁচ থেকে বেয়ে উঠান দিয়ে। ওঁরা দেখছিলেন পৃথিবীর রূপ, অর্চ্চনা পড়ছিল ঘরের স্বল্পালোকে।

সাবি আজ আসেনি, আসবার সময় চলে গেছে তার। এঁটো বাসন ঘরে পড়ে রয়েছে। ডাক্তার বললেন,—ব্যস্ত হ'য়ো না, বৃষ্টি থামলেই সাবি আসবে—

—বৃষ্টি-বাদল, ঝড়ে সে ত কোনদিন কামাই করে না— রমলা বললেন।

আর একপশলা বৃষ্টি এল, তাও চলে গেল টিনের চালে কাঁসর বাজিয়ে। সাবি আসেনি।

হঠাৎ টোকা মাথায় দিয়ে সাবির মতই একটি মেয়ে উঠানে এসে দাঁড়িয়ে বললে,—সাবি আসবেক নাই, তুদের কি কাজ দিবেক, দে কেনে?

রমলা বললেন,—তুই কে? তোর নাম কি?

—মোর নামটি তরী।

—সাবি তোর কে?

—উঃ গাঁয়ের কামিন বটি। উর ত কাল রাতকে ছওয়াল হইছে বটে—বেটাছওয়াল। উ আসতে লারবে। মু কাজ করবেক বদলি।

তরী কাজ করতে যাবে—ডাক্তার বললেন,—তুই ত সাধুর বৌ?

—হ্যাঁ বটে। মু ধান পুঁততে যাবেক, তাড়াতড়ি কাজ সারবেক বটি—

তরী তাড়াতাড়ি কাজ সারতে লাগল—ডাক্তার ছাতা মাথায় দিয়ে হাস-পাতালে গেলেন। রোগী তখনও আসেনি। ভিতরের রোগীদের তত্ত্ব নিলেন। তার পর মেঘমেদুর আকাশের দিকে চেয়ে ভাবলেন—সাবি কালও ধান পুঁতেছে, রাত্রে প্রসব করেছে,—হাসপাতাল ওরা তৈরী করেছে মেহনত দিয়ে, কিন্তু ওরা এখানে কিছুতেই আসবে না। জলে ভিজে, রোদে পুড়ে রোজই কাজ করেছে, সন্তান গর্ভে ধারণ ক'রে,—বন্য জানোয়ারের মত বনের মাঝেই প্রসব করেছে—নির্ব্বিঘ্নে! ছেলেটা কি বাঁচবে? বাঁশের চেঁচাড়ি দিয়ে হয়ত নাড়ী কেটেছে।

ডাক্তার তরীর কাছে রোজই প্রসূতি ও সন্তানের কুশল প্রশ্ন করেন, কিন্তু কোন অকুশলের সংবাদ না পেয়ে যেন বিব্রত বোধ করেন। এত অত্যাচার, এমন অস্বাস্থ্যকর ভাবে প্রসব যদি সবই কুশলে হয়, তবে এই হাসপাতালের ইমারত কিসের জন্যে?

তিনদিন বাদে ডাক্তার হাসপাতালে ছিলেন, হঠাৎ অর্চ্চনা ডাকতে এল—মা ডাকছেন শিগগির—

ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লেখা ফেলে উঠে গেলেন বাসায়। দূর থেকে শুনলেন একটা বচসা চলছে ভিতরে। বাসায় ঢুকে দেখেন, সাবি উঠানে দাঁড়িয়ে রমলার সঙ্গে কি যেন বলছে। ডাক্তার অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন,—সাবি, তুই এলি কি করে? তোর না ছেলে হ'য়েছে—

—হ, হইছে ত বটে,—আসবেক নাই কেনে, হেথা কাজ রইছে না—

—তরী কোথা?

—হ, উ কি সারা মাসটি বেগার দিবেক বটে! টাকা লিবেক নাই?

রমলা ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন,—সাবির আঁতুড় রয়েছে এখন—ওর জল দিয়ে কি করে ঘর-সংসার চলে, অথচ ও কাজ করবেই। তরী একমাস কাজ করলে তাকে মাহিনাটা দিতে হবে,—সেজন্যে তাকে তিনদিন মাত্র বেগার নিয়েছে।

ডাক্তার প্রশ্ন করলেন,—তরী কাজ করবে না?

—করবেক নাই কেনে? উ ত টাকাটি লিয়ে লিবে—মাসটি ত বেগার দিবেক নাই। দু'দিন দিলেক বটে—

ডাক্তার রমলার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। রমলা বললেন,—তা যাই বল, আঁতুড় যায়নি এখন—ওর জল দিয়ে কাজ করি কি করে?

ডাক্তার বললেন,—সাবি, তুই কাজ করবি না। তরীকে পাঠাবি—তোর মাইনে তুই পাবি, তরীকেও যা দিতে হয় দেব। একমাস ঘরে ছেলে মানুষ কর, তার পরে আসবি।

—দু'কামিনকে মাইনে দিবি কেনে?

—সে আমি দেব, তোর দেখতে হবে না। তরীকে পাঠাবি।

সাবি বাসন মেজে দিয়ে চলে গেল,—মধু জল দিয়ে ধুয়ে সেগুলো ঘরে তুলে দিল, সকালের মত জলও তুলে দিল। কিন্তু ডাক্তার আশ্চর্য্য হলেন,—প্রসবের তিনদিন পরে এসেছে কাজ করতে। ওরা মানুষ না পশু?

তারপরে একদিন সংবাদ পেলেন তরীর মুখে,—সাবি পরমানন্দে মাঠে মাঠে ধান পুঁতছে, ছেলেটাও ভালই আছে।

সন্ধ্যার পরে ঝড়-বাদলের দিনে কাঁকুড়গাছির দল আর আসেন না। ঝড়-বাদল, সাপখোপের ভয় আছে। ডাক্তার হাসপাতালের বারান্দায় বসে-বসে মাঝে মাঝে ভাবেন—সাবির কথা। এই শক্তি ওরা কোথা থেকে পায়? মনে মনে বিশ্লেষণ করেন, বনের পশুর ত হাসপাতাল নেই, তারাও প্রসব ক'রে বংশধারা বাঁচিয়ে রাখে—প্রকৃতির সঙ্গে থেকেই ওরা স্বাভাবিক শক্তি পায়।

সাবিরাও হয়ত তাই। মাঝে মাঝে মনে হয়, ওরা পশুই—বন্য পশুর জীবন। আবার মনে হয়,—ওরাই সুখী—রোগ-দুঃখকে ওরা জয় করেছে,—দুঃখ-বোধটাই দুঃখের কারণ, ওদের সে-বোধ জাগ্রত হয়নি, তাই ওরা হয়ত সুখী। সভ্য জীবনের সঙ্গে তুলনা করেন,—রমলা-সাবি, তিনি-সাধু, মানুবাবু-নকুড়,—কারা সুখী? মনে মনে বহু যুক্তি আসে,—পশুর আর সুখ-দুঃখ কি? আবার মনে হয়,—সত্য হয়ে যদি মানুষ কেবল অভাব আর দুঃখই আহরণ করে, তবে তারই বা সার্থকতা কি?

ডাক্তার ভাবেন,—ডাক্তারী বই পড়েন। জার্নালে প্রশ্ন পাঠান,—প্রবন্ধ লিখে পাঠান।

সেদিন একটা কল থেকে ফিরবার সময় দেখেন—সাবিদের মতই কতজন আইলের 'পর বসে মুড়ি খেয়ে পাশের জমি থেকে আঁচলা করে জল খেয়ে নিল,—অথচ আমাশা, উদরাময়, কলেরার জন্য কেউ হাসপাতালে ওষুধ নিতে আসেনি ওরা। মরেও যায়নি কেউ,—চৌকিদার হাসপাতালেই জন্ম-মৃত্যু লিখিয়ে দিয়ে যায়।

ডাক্তারের মস্তিষ্কে জীবনের জটিলতা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে—তিনি সমস্যাটিকে গুরুতর বলে মনে ক'রে যতই সমাধান কয়তে যান, জটিলতা ততই বেড়ে যায়। অবশেষে বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেন—

*

কয়েকদিন ঘন বর্ষার শেষে আকাশ পরিষ্কার হতে বোঝা গেল—শুক্লপক্ষ চলছে। ডাক্তার বাইরে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে হাসপাতালের সামনে বসে কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ একটা কলরব শুনে চেয়ে দেখেন,—কাঁকুড়-গাছির দল আসছেন।

ডাক্তার বললেন,—মধু, বেঞ্চি বের কর—

মধু লোহার বেঞ্চি দু'খানা বাইরে পেতে দিয়ে, চা করবার খবরটা দিতে গেল রমলাকে।

নিকটবর্ত্তী হ'য়ে হেডমাস্টারই প্রথম বললেন,—সংবাদ শুভ? পারিবারিক?

ডাক্তার বললেন,—না, পরিবারের উপর আপনার ঔষধের ক্রিয়া স্থায়ী হয়নি—পুনরায় প্রায় স্বস্থানেই যাওয়ার অবস্থা—

—বলেছি ত, অধিবাস সামলানো দায়। আরও উচ্চশক্তি দিতে হবে—

মণ্টুবাবু বেঞ্চিতে বসে বললেন,—বসুন বসুন সব। বহুবিধ সংবাদ আছে,—তার পুর্ব্বে আপনাদের সব সংবাদ বলুন।

ডাক্তার বললেন,—হাসপাতালে তিনজন রোগী আছে,—গড়ে পঞ্চাশ জন আউট-ডোর রোগী হয়। সাবি আঁতুড়ান্তে কাজে যোগদান করেছে—সুস্থ দেহে। বাসন্তীদেবী ভাল আছেন,—হাসপাতাল-স্টাফ সব সুস্থ সবল,—

—বাসন্তীদেবী ভাল আছেন ত? ব্যস্‌,—মানু বসো।— মণ্টুবাবু টিপ্পনী কাটলেন।

পণ্ডিতমশায় একপ্রান্তে বসলেন। তাঁর হাতে লণ্ঠন এবং লাঠি। ডাক্তার বললেন,—হঠাৎ স-দণ্ড হলেন কেন, পণ্ডিতমশায়?

পণ্ডিতমশায় বললেন,—স-লণ্ঠন-দণ্ড হবার হেতু এই যে, টর্চ্চলাইটের বাতিকে আমি বিশ্বাস করিনে,—আজকাল পথেঘাটে গেঁড়িভাঙা কেউটে ঘোরে, ঢ্যাম্‌না-চিতি আছে। লণ্ঠনের আলোকে ওরা ভয় করে, দণ্ডকেও করে—

মণ্টুবাবু বললেন,—মানু, কথা বলছ না কেন? বিপদ ত কেটে গেছে,—অথচ এমন মনমরা!

ডাক্তার বললে,—কি বিপদ, মানুবাবু? কি হয়েছিল?

মণ্টুবাবু বললেন,—সর্ব্বনাশ! শোনেননি? শিবপুরে ওর কাছারী-বাড়ীতে উনি দুপুরে ছিলেন, খুব বৃষ্টি হচ্ছিল,—হঠাৎ সেই ঘরেই বজ্রাঘাত। মানুবাবু ভিরমি খেলেও বেঁচে গেছেন বরাতজোরে—

ডাক্তার বললেন,—সত্যি মানুবাবু! খুব বেঁচেছেন, যা হোক! এতবড় খবরটা পাইনি!

মানুবাবু বললেন,—হ্যাঁ, খুব বেঁচে গেছি—

তিনি বজ্রপতনের বর্ণনাটা করলেন। ঘরের মাঝে ছাতাটা পুড়ে গেছে, ঘরে চাল পুড়ে গেছে—ইত্যাদি।

—এতদিন আপনারা কেউ ত আসেননি, ওদিকে কলেও বেরুইনি—খবরটাই পাইনি। যা হোক, এখন সুস্থ ত? কোন অসুখ বা অসুবিধে?

মণ্টুবাবু বললেন,—আমি চাষ-আবাদ নিয়ে ব্যস্ত—পণ্ডিতমশায় শিবপুর গেলেন,—হেডমাস্টার একা কি করে আসেন?

—পণ্ডিতমশায় শিবপুর গেলেন কেন?

মণ্টুবাবু বললেন,—বল না মানু—বল। লজ্জার কি আছে?

মানুবাবুকে নিরুত্তর দেখে ডাক্তার অবাক হলেন। মণ্টুবাবুর সামান্য ইঙ্গিতে যিনি আগুন হয়ে ওঠেন, তিনি আজ নির্ব্বাক। ডাক্তার বললেন,—বলুন না, মানুবাবু, ব্যাপার কি? পণ্ডিতমশায় শিবপুর যাবেন কেন?

মান্নুবাবু লজ্জিতভাবে বললেন,—বজ্রাঘাত খুব অমঙ্গল—সকলে বললে, চণ্ডীপাঠ ও স্বস্ত্যয়ন করতে। তাই পণ্ডিতমশায়কে নিয়ে গিয়েছিলাম চণ্ডীপাঠ করাতে—

—স্বস্ত্যয়ন কে করলে ?

—সে অন্য আর-একজন পুরোহিত করলেন।

—তবে পণ্ডিতমশায়কে অতদূর টেনে নিয়ে গেলেন কেন ?

মণ্টুবাবু বললেন,—পণ্ডিতমশায়, আপনি বলুন। আপনি কেন অতদূর গেলেন—মান্নুবাবু কত দক্ষিণা দিলেন।

পণ্ডিতমশায় বললেন,—কেন জানি না, সেই ভয়ানক বৃষ্টির মধ্যে মান্নুবাবুর জিদ—আমাকেই যেতে হবে চণ্ডীপাঠ করতে শিবপুর। সেই বৃষ্টিতে উনি গলায় গামছা দিয়ে, ভিজিয়ে পুড়িয়ে নিয়ে গেলেন। সারাদিন উপবাস। বার চারেক গায়ের জামা-কাপড় গায়ে শুকোলো। পরের দিন চণ্ডীপাঠ হ'ল,—স্বস্ত্যয়ন করলেন ওখানকার এক পণ্ডিত। পরদিন আসবো, কিন্তু সে-বৃষ্টিতে বেরোয় কার সাধ্য ? থাকতে হ'ল—

মণ্টুবাবু বললেন,—হ্যাঁ—সেদিন কি কথাবার্ত্তা হ'ল, বলুন না ঝট্ করে—

পণ্ডিতমশায় হাসলেন। বললেন,—দুপুরে খেয়ে গল্প হচ্ছে—ওদিকে বৃষ্টিও চলছে। একটু বিরক্তও হয়েছিলাম—খামকা স্কুল কামাই হচ্ছে। মান্নু-বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম,—ভাল পুরোহিতই ত ছিল, আমাকে টেনে আনলেন কেন ? উনি ত চণ্ডীপাঠ করতে পারতেন। মান্নুবাবু বললেন,—কেন জানি না। আপনাকে কোনদিনও আমাদের রাঁধা কোন জিনিষ খাওয়াতে পারিনি বলেই বোধ হয় মনে হ'ল—ওঁর মত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণে চণ্ডীপাঠ করলে হয়ত-বা আমার মঙ্গল হবে। আমি তার উত্তরে বললাম,—এখন ভেবে দেখুন মান্নুবাবু, ব্রাহ্মণের নিষ্ঠাটা তার নিজের জন্যে প্রয়োজন নেই—প্রয়োজন অন্যের জন্যে। সে নিজেকে ভোগ থেকে বঞ্চিত করে অন্যের জন্যে—এর মধ্যে ব্রাহ্মণ্য গর্ব্বও নেই, অন্যকে ছোট ভাববার প্রয়াসও নেই—

ডাক্তার প্রশ্ন করলেন,—মান্নুবাবু কি জবাব দিলেন ?

—মান্নুবাবু তার জবাব দেননি।

ডাক্তার উঠে বসে বললেন,—কিন্তু সে জবাব আজ দিতে হবে। নইলে পরিত্রাণ নেই। বলুন মান্নুবাবু—

মান্নুবাবু বললেন,—সাময়িক দুর্ব্বলতা মানুষের মাঝে আসে, বিপদে বা রোগে শোকে, তাই দুর্ম্মতি হয়—

হেডমাস্টার বললেন,—মানে, সাময়িক দুর্ব্বলতার চিকিৎসক রূপে তা হ'লে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের প্রয়োজন আছে এই কথা বলতে চান—যখন বেঁচে থাকতে হ'লে সাময়িক দুর্ব্বলতা আসবেই—চিকিৎসকও চাই তার।

মানুবাবু থতমত খেয়ে বললেন,—তা ঠিক নয়, তবে অনেক ব্রাহ্মণকেই অনাচার করতে দেখি, পণ্ডিতমশায়কে দেখিনি—তাই একটা ঝোঁক হ'ল। সেটা ঝোঁকই, বিচার করে ভেবে কিছু করিনি—

হেডমাস্টার বললেন,—এইবার মানুবাবু ভুল বকতে আরম্ভ করলেন।

ডাক্তার বললেন,—অর্থাৎ—চুট্‌কী গল্পের আঁচ পেয়েছেন তিনি।

হেডমাস্টার বললেন,—একজনের বাবা মারা যাওয়ার সময় প্রতিবেশিগণ উপস্থিত আছেন। মৃত্যুশয্যাশায়ী বাবা ছেলেকে বললেন,—দেখ বাবা, নটবর পালকে একশ টাকা দিয়েছি, সে পাঁচ টাকা সুদ দিয়েছে, আসল দেয়নি —বিপিনকে দশ মণ ধান দেড়িতে দিয়েছিলাম—সে ধান শোধ দেয়নি…। ছেলে বলছে,—আহা বাবা, একেবারে সজ্ঞানে মারা যাচ্ছেন! পুণ্যাত্মার শরীর। কিছুক্ষণ বাদে বাবা বলছেন,—হ্যাঁ, দেখ বাবা, পশুপতিবাবুর কাছ থেকে একশ টাকা সুদে এনেছিলাম, একটি পয়সাও দিতে পারিনি। ছেলে তখন কেঁদে উঠে বললেন,—আহা-হা, বাবা আমার এতক্ষণে ভুল বকতে সুরু করলেন!

একটা হাসির রোল উঠল। ডাক্তার বললেন,—থাক্ ও-কথা। মানুবাবু, সাবি সন্তান-প্রসবের তিনদিন পরে সেই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কাজ করতে এসেছিল। দেহের এতটুকু বৈক্লব্য ঘটেনি—

মানুবাবু বললেন,—ওরা ত বনের পশুর সামিল, ওরা আসবেই, এতে আর আশ্চর্য্য হওয়ার কি আছে?

হেডমাস্টার বললেন,—আশ্চর্য্য কিছু নেই, কিন্তু প্রশ্নটা থেকে যাচ্ছে—খাচ্ছি আমরা, স্বাস্থ্যটা ওদের। লেখাপড়া শিখছি আমরা, সততা সত্যবাদিতাটা ওদের, ওরা হাসপাতাল গেঁথেছে গতর দিয়ে, আমরা রোগা গতর নিয়ে হাসপাতালে ঢুকছি—

হেডমাস্টার লাঠি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পণ্ডিতমশায় বললেন,—ঘ্রা খাদনেচ। তিনি গল্প করলেন,—জনৈক বৈয়াকরণ বনের ধার দিয়ে যেতে লোকে বললে,—বনে বাঘ আছে, পণ্ডিতমশায়, অন্য রাস্তায় যান। পণ্ডিত বললেন,—বাঘ মানে ব্যাঘ্র। বি পূর্ব্বক আ পূর্ব্বক ঘ্রা ধাতু ড, অর্থাৎ বিশেষরূপে আঘ্রাণ করবে। ক্ষতি কি? তিনি যেতেই বাঘ এসে ধরলো।

তখন তিনি বললেন, হাঁ্যা—ঘ্রা খাদনেচ। কিন্তু তখন বুঝে আর লাভ কি? বাস্তবকে অস্বীকার করে পুঁথিগত বিদ্যার ফল ঐ 'খাদনেচ'।

কাঁকুড়গাছির দল রওনা দিলেন।

*

বৈশাখের পাণ্ডুর রুক্ষ প্রান্তর ভাদ্রের শেষে সবুজ-সুন্দর হ'য়ে গেছে। হাসপাতালের ডাঙায় বসে বসে ডাক্তার আর রমলা দেখেন চারিপাশে সবুজের প্লাবন। দমকা হাওয়া সমুদ্রের ঢেউএর মত সবুজের বনে গড়াতে-গড়াতে যায়। সাবিরা এই প্রান্তরকে সবুজ করেছে—বৃষ্টি-ঝড়, প্রসব-বেদনা কোনদিকে তাকায়নি,—প্রসবের পরেই ছুটেছে ধান পুঁততে মাঠে—এই শ্যামল শষ্প মুঞ্জরিত হবে, সোনার ধান ফলবে! রাণীগঞ্জের বাজারে যাবে,—দেশ-বিদেশে যাবে। সভ্য জগতের কারখানা চলবে এদেরই গাঁইতি-কাটা কয়লায় আর ধানের জোরে।

রমলা মাঝে মাঝে লাল রবারের চটি পায়ে দিয়ে একটু মাঠের দিকে যান—বাসন্তীদেবীও হয়ত যান। দু'চোখ ভরে ওঁরা মাঠের ধান দেখেন—বর্ষায় স্নান করে ভালকুড়ির জঙ্গল ঘননীল হ'য়ে উঠেছে। রমলা পৃথিবীর রূপকে মনে মনে তারিফ করেন—সাবি কাজ করে ফিরবার সময় হয়ত দেখা হয়। সে বলে,—মাঠকে যাবেক নাই মা, হোতা সাপ-খোপ রইছে না,—

রমলা বলেন—তুই ত রোজ এই পথে যাচ্ছিস্, তোর ভয় নেই?

—হ, মোরা ত জানছি, কোথা কোনটা রইছে—কেউটে ধাওয়া করলে পাথর মারব নাই?—সাবি হাসে, তারা নির্ভয়। সে চলে যায়,—হাঁটু-সমান ধানের জমির ভিতর দিয়ে ঘোড়ামারায়।

রমলা ফিরে আসেন—পাথরগুলো বৃষ্টির জলে দাঁত বের করে ভেসে উঠেছে, মাঝে মাঝে নালা হ'য়ে গেছে জল-নিকাশের—বৈশাখী ঝড়ে এরা বালি-ভর্ত্তি হ'য়ে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে—

পূজা এল,—শরতের জোছনায় উৎসব চলল চারদিন ধরে—মেলা হ'ল,—সাবিরা এসে সদলে ঠাকুর দেখে গেছে। পূজায় ডাক্তার একখানা লাল তাঁতের কাপড় দিয়েছিলেন সাবিকে,—সাবি এই উপহারে অবাক হয়ে খুশীতে হেসেছিল—এমন কাপড় পরেনি তারা জীবনে। তার ক্ষোভের মধ্যে, কাপড়খানা পাতলা হ'য়েছে—

ডাক্তার আর ভালকুড়িতে যাননি—সাহস হয়নি যেতে—

কাঁকুড়গাছির দল ভারি হয়েছে—পূজায় বিদেশাগত চাকুরে বাবুরা দু'চারজন আসতেন মানুবাবুদের সঙ্গে। দেশ-বিদেশের গল্প হ'ত,—পলিটিক্স হ'ত—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, অ্যাটম-বম হাইড্রোজেন বম হ'ত—

ডাক্তার সপত্নীক মাঝে মাঝে কাঁকুড়গাছি গেছেন বেড়াতে,—সকলে পূজার মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়িত করেছেন—কেউ কেউ পূজায় বড় মাছ ও নানাবিধ ফল-মিষ্টি পাঠিয়েছেন—এদেশে এটা রেওয়াজ—

কার্ত্তিক থেকেই শিরশিরে হাওয়া বইতে সুরু করেছে—প্রান্তর সোনালী ধানে হরিদবর্ণ। ধানের গাছ ফলভারে অবনত হ'য়েছে। আশু ধান কাটার সময় হ'য়েছে—এ বছর সুবৃষ্টিতে ভাল ফসল হ'য়েছে—সাবিদের মুখে হাসি ফুটেছে—

দিনের পর দিন গেছে এমনি করে—

সাবিদের বড় তাড়া পড়েছে কাজের—ধানকাটা লেগেছে। সাবি ভোরে আসে, কাজ করে দিয়ে চলে যায় ধান কাটতে। শীতপাণ্ডুর শুষ্ক প্রান্তর পশ্চিমের ঠাণ্ডা হাওয়ায় শিরশির করে—ভালকুড়ির সবুজ দেহ ধীরে ধীরে ফিকে জরদ রঙের পোষাক পরেছে—কিছুদিন পরে তামাটে রঙে দেহ সাজাবে—

মাঘের প্রথমে হৈমন্তিক ধান-কাটাও প্রায় শেষ হ'য়ে গেছে। সাবি একদিন রমলাকে হেসে বললে,—হ, দু'বিঘা জমিতে এককুড়ি দু'মণ ধান পেয়েছে তারা, আর ধান কেটে কুড়িয়ে পাঁচমণ পেয়েছে,—বছর চলে যেয়েও কিছু বাঁচবে। একবছরের জন্যে তারা নিশ্চিন্ত,—শুধু বনের ডালপাতা কিছু জোগাড় করতে পারলেই হয়।

কাঁকুড়গাছির দল কম্ফোর্টার মাথায় বেঁধে বেড়াতে আসেন। হেডমাস্টার তাঁর মতামত বলেন,—এই অ্যাটম-যুগে গ্রামে ফিরে যাওয়া ছাড়া সভ্য জগতের কোন গতি নেই—হয় সাবিদের সঙ্গে ঘোড়ামারায় বসবাস করতে হবে, ওদের হ'য়ে—না-হয় সমূলে ধ্বংস হতে হবে।

মানুবাবু প্রতিবাদ করেন,—সভ্য জগতে মানুষের স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং যেখানে গেছে, সেখান থেকে আর গ্রামে ফেরা চলে না—

পণ্ডিতমশায় বলেন,—যে সভ্যতার প্রারম্ভ লোভ থেকে, তা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হবে—

হেডমাস্টার বলেন,—সভ্যতাটা কি? জামা-কাপড় পরা, আর রেডিও-টি.ভি. ব্যবহার করা? হৃদয়ের বিস্তারই সভ্যতা,—যেখানে হৃদয় জড় হ'য়ে রইল সেখানে সভ্যতা কোথায়? সে সভ্যতার প্রয়োজন কি?

তিনি রেগে বলেন,—শিক্ষা দিলনা চরিত্র, সততা ; সমাজ দিলনা স্নেহ মমতা ভালবাসা সহানুভূতি ; মানুষকে আপনার করতে দিলনা রাজনীতি আর ধনবিজ্ঞান ;—দেহের স্বাস্থ্য হরণ করে দিল কেবল দুরারোগ্য রোগ আর অপটুতা,—সে কি সভ্যতা ? এটা নেশা, নেশার ঘোরে জগৎ চলেছে—চলবে, যতক্ষণ না নয়নজুলিতে লোটায়—

একই প্রশ্ন নানা রূপে পৌনঃপুনিক দশমিকের মত পুনরাবৃত্ত হ'য়ে আসে—

ডাক্তার গবেষণা করেন,—সমস্যার সমাধান পান না। ডাইরী লেখেন, নোট লেখেন—তা অকেজো হ'য়ে পড়ে থাকে টেবিলে।

মণ্টুবাবু কণ্ট্রাক্টরি করেন,—তিনি বলেন,—ভেবে ভেবে যদি মারাই যাই, তবে সে ভাবনায় দরকার কি ? ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। টাকা রোজগার করে খাও—তারপর ডাক পড়লে হাসিমুখে চলে যাও—

দিন যায়—জগৎপুরের ডাঙায় পৃথিবীর সমস্যা এসে যেন ঘনীভূত হ'য়ে ওঠে, তার পাশে সাবিরা ধান কাটে, গাড়োয়ান গাড়ী চালায়। তাদের সমস্যা একটি—সমাধান তাদের হাতের মুঠোয়। তারা ভাবে না,—ভাবতে শেখেনি—বেঁচে থাকে, মরে—জন্মায়—

*

রোদে বসে ডাক্তার চা-পান করছিলেন। পশ্চিমা হাওয়ায় হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। দরজা বন্ধ করে রমলা এসে বসলেন স্কার্ফ গায়ে দিয়ে চায়ের পেয়ালা হাতে করে। গায়ে রোদ লেগেছে—সকালের কবোষ্ণ রোদ, বেশ আরাম হ'য়েছে' চা'র বাটিতে চুমুক দিয়ে। বললেন,—আঃ, বাঁচলুম—

সাবি বাসন মাজছিল, উঠানের প্রান্তে বসে। পাশে তার ছেলেটাকে বসিয়ে রেখেছে, ঠাণ্ডা মাটিতে। গায়ে তার পুরোনো একখানা ছেঁড়া কাপড়ের অংশ, দু'ভাঁজ করে পিঠের দিকে ঘাড়ের উপর গিঁট দিয়ে বাঁধা। ঠাণ্ডা মাটিতে বসে সে কি-একটা হাতে নিয়ে দেখছে,—আর, একটা মাত্র দাঁত বের করে হাসছে।

ডাক্তার তাকিয়ে দেখছিলেন। ছেলেটা হামাগুড়ি দিতে শিখেছে একটু-একটু,—কাজেই কি একটা জিনিষের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে গিয়ে পড়ে গেল,—আবার উঠল,—আবার চললো। সেখানে রোদ নেই, ভিজা মাটি—একখানা লাল কাগজ ছিল, সেটাকে ধরে মুখে পুরে দিতে চেষ্টা করলো,—সাবি বলল,—হেই, উ খাবি না—

ছেলেটা ফিরে একবার হাসলো—

রমলা ডাক্তারের দৃষ্টি অনুসরণ করে ছেলেটার দিকে তাকালেন,—মায়ের জাত, মনে দয়া হ'ল। তিনি বললেন,—অতটুকু শিশুকে ঠাণ্ডা মাটিতে ছেড়ে দিয়েছিস্—একটা জামাও নেই! সর্দ্দি হবে যে?

সাবি বললে,—হ, মোদের ছেলে বটি—উর সর্দ্দি হবেক কেনে?

—ঠাণ্ডা লাগছে যে—সর্দ্দি হবে। জামা গায়ে দিয়ে দে।

—হ, জামা কোথা মিলবেক।

ডাক্তার বললেন,—জামা কোথায় পাবে ওরা?

রমলা বললেন,—দাঁড়া দেখছি; অর্চ্চনার একটা ছোট জামা আছে, কেটে দিলে হবে ওর গায়ে—

সাবি বললে,—হ, জামা কি হবেক? উ মাঠকে কাজ করবে, উ জামা গায়ে দিলে চলবেক কেনে? রোদ-জলে পুড় খেলে নাই ত, শক্ত হবেক নাই—

ডাক্তার বললেন,—জামা ত দিচ্ছে একটা, সেটা গায়ে দিয়ে দিবি—

—হ, তুদের ইচ্ছা হয় দে কেনে? উ বাবু হবেক ত, মাঠকে কাজ করবে কেমনে?

ডাক্তার বললেন,—থাক্, জামা দিয়ে দরকার নেই। ঠাণ্ডা মাটিতে আর রোদে ওদের মানুষ হতে দাও। দারিদ্র্যই ওদের আশীর্ব্বাদ হ'য়েছে—ওরা গরীব তাই সুখী। ছেলেটাও হাসছে—ওর ত কষ্ট নেই। আমরা আমাদের দেহের কথা ভেবে কাতর হচ্ছি—

রমলা বললেন,—একরত্তি ছেলে, একটু মায়া হয়না তোমার?

ডাক্তার হাসলেন—নোট-বইটা নিয়ে এসে কি যেন লিখলেন। তার পরে সেটাকে রেখে এসে বললেন,—আচ্ছা, আমি হাসপাতালে চললুম।

ডাক্তারের মনটা হঠাৎ যেন খুব প্রফুল্ল হ'য়ে গেল,—মনে হচ্ছে. এই সমস্যার যেন একটা সমাধান উঁকি মারছে অন্ধকার থেকে। একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে দিক্‌ভ্রষ্ট পথিকের লক্ষ্য হিসাবে—

ডাক্তার হাসপাতালে যেয়ে বসলেন, কিন্তু কাজে আজ মন বসছে না তাঁর। ছেলেটাকে দেখতে হবে—ওর জীবনের পরিণতির মাঝেই রয়েছে সমাধান। ডাক্তার নড়েচড়ে বসে ভেবে যান নানা কথা—পণ্ডিতমশায়ের মহামায়ার স্বরূপ এই বিশ্বপ্রকৃতি, তার ছোঁয়া যে পায় সেই অমর···

দু'চারদিন পরে একদিন সাবির আসতে দেরী হ'ল। সে এসে বিষণ্ণমনে বাসন মাজার কাজ করছিল—কাজেও যেন তার আগ্রহ নেই, মুখেও প্রসন্নতা নেই—

ডাক্তার প্রশ্ন করলেন,—তোর কি হয়েছে সাবি? অসুখ করেছে—

সাবি বললে,—না। মোর কি হবে? মা'র অসুখ করলেক—জ্বর হইছে, বুকে বেদনা হইছে বটে—শ্বাস লিতে লারছে—

—ক'দিন হ'ল?

—আজ দু'দিন।

—কোন ডাক্তার দেখছে? আমাকে বলিস্‌নি—

—ডাক্তার কুথাকে পাবেক,—ওষুধ কিনবেক কোথা?

ডাক্তার বললেন,—তা কেন? হাসপাতালে নিয়ে আয়—ওষুধ-পথ্যি সব এখানে পাবে। একখানা গাড়ী করে নিয়ে আসবি—এক্ষুনি নিয়ে আয়, ভর্ত্তি করে নিচ্ছি।

সাবি বললে,—উ হাসপাতালকে আসবেক নাই।

—কেন? এখানে যত্ন হবে, আমি আছি—

—মু ত সব বললেক, তা উ আসবেক নাই।

—ওষুধ-পত্তর কিছু দিয়েছিস্?

—হ, উ শেকড়-বাকড় দিলেক, তেল মালিশ করলেক—জ্বর ত ছাড়লেক নাই, বেথাটাও মরলেক নাই।

ডাক্তার বললেন,—হাসপাতালে আসবে না? কিছুতেই না?

—না, উকে কত বল্‌লেক।

ডাক্তার বললেন,—আচ্ছা, তুই যা, হাসপাতাল সেরে আমি ওষুধপত্র নিয়ে যাবো—ওসব রোগ দু'একটা ইন্‌জেকশনেই ভাল হয়ে যাবে—

সাবি উঠে এসে ডাক্তারের সামনে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে,—ঘরকে ত টাকা লাই, তুকে কি দেবেক?

—কিছু দিতে হবে না, ওষুধও হাসপাতালেরই নিয়ে যাবো।

সাবি খুশী হয়ে বললে,—হ, তু যাবি—মা গেলে, মোর কেউ নেই—ডাক্তার! নকুড় ত মনিষ নয়, রস খেয়ে হাঙ্গামা করছে বটে! উ মনিষ লয়—

পরক্ষণেই সাবির মুখ অন্ধকার হয়ে গেল—মা'র মৃত্যু হ'লে পৃথিবীতে আপনার বলে তার কেউ আর থাকবে না। সে আবার কাজে গেল।

ডাক্তার হাসপাতালে গেলেন। হাসপাতালের কাজের ফাঁকে ফাঁকে

ভাবছিলেন—একটা মহা সুযোগ এসেছে সাবির মায়ের চিকিৎসার ভিতর দিয়ে—হয়ত ওদের হাসপাতাল-ভীতি যাবে, হয়ত ওরা আসবে এই হাসপাতালে—ওরাই গায়ে খেটে এই ইমারত তৈরি করেছে। অন্যদিকে এই বন্য মানুষের দেহে বিজ্ঞান-প্রসূত এই নতুন ঔষধের ক্রিয়াও দেখা যাবে। ডাক্তার মনে মনে সুযোগটা পেয়ে খুশী হয়েছিলেন।

হাসপাতালের পরেই ডাক্তার ওষুধপত্র বেঁধে নিয়ে রওনা দিলেন ঘোড়ামারায়—

ঘোড়ামারা গ্রামে ডাক্তারের আগমন সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল। গ্রামের দু'চারজন লোক, মহিম মোড়ল সকলেই উপস্থিত ছিল। ডাক্তার সাইকেল থেকে নামতেই, দু'চারজন ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানালে। মহিম মোড়ল সামনেই ছিল, ডাক্তার বললেন,—কেমন, রোগীর অবস্থা কেমন ?

মহিম মোড়ল বললে,—ভালটি ত দেখছি না, ডাক্তার, লাড়িটা কেমন চন্‌চন্‌ করতে লাগছে—নিউমনি হলেক বটি—কঠিন বেমার—

ডাক্তার বললেন,—ও-নিউমনি আজকাল কিছু না, নতুন ওষুধ বেরিয়েছে—দেখতে দেখতে সেরে যাবে। চল্‌ দেখি—

ঘরের একপ্রান্তে খড়ের গাদার উপর একটা পুরানো কাঁথা পাতা, সাবির মা তার উপর শুয়ে,—গায়ে আর একখানা নোংরা কাঁথা। ঘরের মাঝে স্বল্পান্ধকার,—ঘরে কোথাও লেপ-তোষক নেই, এই দুরন্ত শীতে এক কাঁথা আর হয়ত একটা তিনটাকার কম্বল দিয়েই ওরা রাত কাটায়।

ডাক্তার সাবির মাকে প্রশ্ন করলেন,—এখন কেমন আছ ?

—ভাল লয়, উ ডাক এইয়েছে বটে, এবার চলবেক—

ডাক্তার বললেন,—এ কঠিন রোগ নয়, একটু ওষুধ দিলেই সেরে যাবে। ভয়ের কিচ্ছু নেই—

ডাক্তার নাড়ী দেখলেন,—যন্ত্র দিয়ে বুক দেখলেন, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দেখলেন। গভীর অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করলেন। নিউমোনিয়াই বটে, বাম ফুস্‌ফুস ভরে গেছে। ডান ফুসফুস আক্রান্ত হয়েছে।

ডাক্তার বললেন,—এমন কিছু নয়, নতুন ওষুধ বেরিয়েছে—তিন-চারদিনেই ভাল হয়ে যাবে—

সাবির মা চোখ মেলে বললে,—উ ভাল হবেক নাই। মোর দেহে ত কিছু লাই রে ডাক্তার, জারা জারা হইছেন বটে—অষুধ কি করবেক ?

—হাসপাতালে চল,—ওষুধ-পথ্যি, সেবা-যত্ন কোন অসুবিধে নেই, কোন ভয় নেই, আমি সর্ব্বদা দেখবো—দু'দিনে সেরে হেঁটে বাড়ী আসবে—

সাবির মা ম্লান হাসলো। তার পর বুকের বেদনার স্থানটা চেপে ধরে বললে,—হু, হাসপাতালকে যাবেক নাই—মরি ত হেথাই মরবেক—

—মরবে কেন? মরবার রোগ এ নয়, এসব রোগে আজকাল মানুষ মরে না—

সাবির মা হেসে বললে,—তু বাঁচাবি? হাঁসপাতালকে গেলে—

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বাঁচাবো—

—হু, প্রাণটো দিতে পারিস্, এত্তে বড় ডাক্তার কোথা? মোর দেহে ত সাড় লাই—

—না থাক্, দু'দিনে সাড় এসে যাবে—

—হু, সাড় দিবেক! চোখ লাই দেখতে লারছি, কানে শুনতে লারছি, দাঁত লাই খেতে লারছি—সাড় দিবেক তু ডাক্তার?

—বুড়ো হ'লে ত দাঁত চোখ একটু দুর্ব্বল হয়-ই, তাতে লোক মরে না—

—বাঁচবেক কেনে? দেহটো যদি খাট্‌তে লারলে ত বাঁচবেক কেনে বল? উ-সব অষুধ মু খাবেক লাই—

ডাক্তার বললেন,—ওষুধ না খেলে রোগ ভাল হয়?

সাবির মা পাশ ফিরে শুয়ে বললে,—কোন লাভটো রইছে? ভাঙ্গা দেহটো লিয়ে বাঁচবার সখ লাই--

ডাক্তার আর একবার তাকে হাসপাতালে যাওয়ার কথা বললেন। সাবির মা বললে—সে হাসপাতালেও যাবে না, ওষুধও খাবে না। এই জীর্ণ দেহ নিয়ে সে বেঁচে থাকতে চায় না।

ডাক্তার আলো জ্বালাতে বললেন। দিবালোকে লম্পের আলোয় তিনি সিরিঞ্জে পেনিসিলিন ভরলেন; সাবির মাকে বললেন,—এদিকে শোও, ওষুধ দিয়ে দি'—

সাবির মা চোখ মেলে চেয়ে দেখলে। হেসে বললে,—তু ছুচ দিবি বটে! দে কেনে। হেথা যখন এইয়েছিস্—দে। মু বাঁচবেক নাই।

ডাক্তার নিরুত্তরে ইন্‌জেকশন করলেন। তার পর স্থানটা মাসাজ করে দিতে দিতে বললেন,—বাঁচবে না কেন? কিছু হয়নি তোমার।

সাবির মা বললেন,—বাঁচবেক কেনে? কাজ করতে লারছি—উ ত মরারই সামিল বটি। বসে বসে সাবির ভাত খাবেক কেনে?

ডাক্তার বললেন,—তা দু'চারদিন বেঁচে নাতিটাকে বড়সড় ক'রে তার পর যাবে—এখনই কি ?

সাবির মা তবুও বললে,—হ, লাতি মানুষ করবেক ? মরতে ত হবেকই, চিরদিন ত বাঁচাতে লারবি—

—চিরদিন কে আর বাঁচে—

—হ, তবে ডাঁটো থাকতে, গেলেই ভাল—উ সাবির সংসার সাবি করবেক।

ডাক্তার বাইরে এসে দুটো ওষুধ তৈরি করে সাবিকে সেবন-প্রণালী বুঝিয়ে দিয়ে বললেন,—কাল আবার আসবো। বিকেলে খবর দিবি, সকালে খবর দিবি,—যদি দরকার হয় আবার আসবো, কোন ভয় নেই।

সাবি প্রশ্ন করলে,—মা বাঁচবেক ডাক্তার ?

—কেন বাঁচবে না ? মরবার রোগ হয়নি কিছু—

সাবি অনেকটা সান্ত্বনা পেয়ে বললে,—হ, মু অষুধ সব ঠিক খাওয়াবেক, খবর দেবেক—

মহিম ঘোড়ল প্রশ্ন করলে,—ভাল বটি, ডাক্তারবাবু—

—হ্যাঁ, খারাপ কিছু নয়, দু'চারটে ইন্‌জেকশন দিলেই ভাল হবে—

—নাড়ীটো কেমন ছাড়-ছাড় করছে ডাক্তারবাবু,—উ ত ভাল লয়।

—ও সেরে যাবে। এই ওষুধের কাজটা দেখ না।

ডাক্তার সকলকে আশ্বাস দিয়ে সাইকেলে উঠলেন। মনে মনে হাসলেন, —পেনিসিলিনের যুগে নিউমোনিয়ায় লোক মরবে কেন ?

*

নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে ডাক্তার ঘোড়ামারার মাঠ পার হ'য়ে জগৎপুরের ডাঙায় উঠছেন। পিছন থেকে পশ্চিমা হাওয়া তাঁকে ঠেলছে, ডাঙার উঠতে কষ্ট হচ্ছেনা তেমন। পিছনে স্তিমিতি স্তব্ধিত ভালকুড়ির বিচিত্র বনশ্রেণী। পাণ্ডুর মাঠ—জমির ধানকাটা হ'য়ে গেছে, তার মুথোগুলো সারিবদ্ধভাবে একটা দাবার ছকের মত মনে হচ্ছে।

ডাক্তার রোমন্থন করছিলেন মনে মনে—সাবির মা বাঁচতে চায় না। এ পর্য্যন্ত যত রোগী দেখেছেন, সকলেরই বাঁচবার একটা অদম্য আগ্রহ। দুই হাতে পৃথিবীকে তারা প্রাণপণ বলে আঁকড়ে ধরে থাকে, মৃত্যু তাদের ছিনিয়ে নিয়ে যায়—তারা হা-হা করে কেঁদে ওঠে, আত্মীয়-স্বজন কেঁদে ওঠে। জীবনের সঞ্চয়কে ফেলে যেতে তারা চায় না,—তাই কাঁদে। সাবির মা বলেছে,—দাঁত-চোখ নেই, জরাজীর্ণ দেহ—কাজ করবার শক্তি নেই—কাজেই সে বাঁচতে

চায় না। বার্দ্ধক্যের কর্ম্মহীন জীবন, দুর্ব্বল অশক্ত দেহ দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠেছে বলেই সে মৃত্যুকে চায় ত্রাতা হিসাবে। সে বাঁচতে চায় না—পৃথিবীতে হয়ত তার সঞ্চয় নেই—তাই! মৃত্যুর মাঝে জীবনের দৈন্যকে নিঃশেষিত করে দিতে চায়। দেহ ওদের সম্বল। নিঃসম্বল হয়ে ওরা বাঁচতে চায় না—চিরদিন যখন বাঁচা চলে না, তখন ডাঁটো থাকতে মরাই ভাল।

ডাক্তার সাইকেল করতে করতে মনে মনে সংকল্প করলেন,—যত শ্রমই হোক্, ওকে বাঁচাতেই হবে। বেঁচে উঠলে নিশ্চয়ই ও সুন্দর পৃথিবী—আর তার সংসার ফেলে যেতে চাইবে না। ওরা রোগ জয় করেছে, জীবনকে জয় করেছে—মৃত্যুকে জয় করতে তিনি দেবেন না। তা হ'লে এই হাসপাতালে —তাঁর শিক্ষা সব ব্যর্থ হ'য়ে যায়। এ পরাজয়কে তিনি স্বীকার করবেন না।

ডাক্তার হাসপাতালে ঢুকতেই একটি ভদ্রলোক নমস্কার করে বললেন,—ডাক্তারবাবু, এক্ষুণি একবার যেতে হবে—বাবার বড় অসুখ।

—কোথায়?

—এই কাঁকুড়গাছি। রামেশ্বর ঘোষ আমার নাম,—কোলিয়ারীর রাস্তার পাশে মুদি-দোকানের সামনে আমাদের বাড়ী। আমার সাইকেল আছে, সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি।

—আপনি যান। আমি একটু চা খেয়ে যাচ্ছি। ওষুধের দোকান ত আছে ওখানে?

—হ্যাঁ। আমি বাড়ীর সামনেই থাকবো—

ডাক্তার বাসায় ঢুকলেন। রমলা বললেন,—আবার বেরুবে নাকি?

—হ্যাঁ, জরুরী ডাক। একটু চা দাও।

রমলা চা করতে গেলেন।

ডাক্তার তাঁর ব্যাগ খুলে কয়েকটা ওষুধ আর ইন্‌জেকশনের অ্যাম্পুল নিলেন। বারান্দায় বসে বললেন,—সাবির মার নিউমোনিয়া হ'য়েছে। দেখে এলাম। কিছুতেই হাসপাতালে আসতে চায় না। বলে, বেঁচে থেকে কি হবে?

রমলা বললেন,—এইরকম কলে এত ছোটাছুটি—

—ওটা কর্ত্তব্যের কল, রমলা! ওরা অসহায়, ওদের কেউ নেই। হাসপাতালে আসতে হয়ত ভয় পায়—ওষুধের পয়সা নেই—মরতেও ভয় নেই।

ডাক্তার চা খেতে খেতে ভাবছিলেন অনেক কথা। চা খেয়ে আবার সাইকেলে উঠলেন—কাঁকুড়গাছি যাবেন।

কাঁকুড়গাছি পৌঁছতে দেরী হ'ল না। রামেশ্বর ঘোষ মুদী-দোকান থেকে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল। তিনি রোগীর পাশে বসে পরীক্ষা করলেন। রোগীর বয়স বছর ষাট-পঁয়ষট্টি হবে—জ্বর, বুকে ব্যথা। কাস্‌তে অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে।

ডাক্তার পরীক্ষা করলেন। তার পর বললেন,—একটা কাগজ দিন—

বৃদ্ধ দশরথ ঘোষ সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন,—কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

—ভালই, বুকে একটু সর্দ্দি বসেছে তাই বেদনা হয়েছে।

—এ-যাত্রা কি বাঁচবো?

—কেন বাঁচবেন না? এমন জটিল অসুখ কিছু নয়—

—জটিল হ'তে কতক্ষণ! নানা রোগ রয়েছে শরীরে—

—কি কি রোগ আছে?

—পূর্ব্বে প্রস্রাবের দোষ হ'য়েছিল একবার, মাঝে মাঝে কাসি আমার হয়ই। শ্লেষ্মা প্রবল—

ডাক্তার একটু থেমে বললেন,—তাতেই বা ভয়ের কি আছে?

—যদি অসুখটা খারাপ দিকে যায়?

ডাক্তার রামেশ্বরের আনীত ওষুধ সিরিঞ্জে ভরতে ভরতে বললেন,—বয়স কত হ'ল?

—এই পঁয়ষট্টি হবে।

—সংসারে কে কে আছে?

ঐ দুই ছেলে,—বড় ছেলে আপনার আশীর্ব্বাদে ভাল চাকুরিই করে, আর রাম বাড়ীতে জমিজমা দেখে আর কোলিয়ারীতেও একটু কাজ করে। নাতিপুতি সবই আছে—

ডাক্তার বললেন,—তবে আর খারাপ দিকে গেলেই বা ক্ষতি কি? অবশ্য যাবে না—কিন্তু···

দশরথ ঘোষ বিষণ্ণভাবে বললেন,—আপনি জানেন না, ডাক্তারবাবু। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, কত কষ্টে এই জমিজায়গাটুকু করেছি—ওরা ছেলে-মানুষ এখনও বুঝে খেতে শেখেনি—

ডাক্তার ইন্‌জেকশন করলেন। ঘোষমশায় বললেন,—ভাল হবো ত এবার?

—হবেন বৈকি!

—কি হয়েছে আমার?

—নিউমোনিয়া। সামান্যই ধরেছে—

ঘোষমশায় বিমর্ষভাবে বললেন,—আমার যে আরো একবার নিউমোনিয়া হ'য়েছিল—শুনি যে, দু'বার হলে বাঁচে না। এখনো জমিজমার মামলা মেটেনি—কি হবে ডাক্তারবাবু?

—সেরে যাবে—পেনিসিলিনের যুগে নিউমোনিয়ায় রোগী মরে না।

ঘোষমশায় অনেকটা ভরসা পেয়ে চুপ করলেন। ডাক্তার রামেশ্বরকে ওষুধ-পথ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে সাইকেলে উঠলেন। রামেশ্বর জিজ্ঞাসা করলো,—আজ্ঞে—ফী?

—চার টাকা—

—আজ্ঞে, আমরা রাজেনবাবুকে দু'টাকা দি'—

—তাঁকে ডাকলেই পারতেন।

—রামেশ্বর দৌড়ে ঘরে গিয়ে চার টাকা নিয়ে এসে দিল। ডাক্তার পকেটে ফেলে সাইকেলে উঠলেন। ডাক্তারের মনটা অকারণে আবার বিষণ্ণ হ'য়ে উঠলো। ঘোষমশায়ের বেঁচে থাকবার কি আগ্রহ! জমিজমা, সংসার ছেড়ে তাঁর আত্মা কিছুতেই মুক্তি চায় না। জীর্ণ দেহকে ভর করে চিরদিন তা ভোগ করতে চায়। এই বাঁচবার আগ্রহ যেন তাঁর কাছে হাস্যকর মনে হ'ল। যাওয়ার সময় হ'য়েছে—জীবনের কাজ শেষ, তথাপি এই মোহান্ধকারের প্রতি কি আসক্তি! এই রোগীটা মরে গেলেই যেন তিনি স্বস্তি পান মনে-মনে—

ডাক্তার বাসায় এলেন একটায়। রামেশ্বর ফী দিয়েছে তিনটা একটাকার নোট আর দু'টো আধুলি—রমলার হাতে দিতেই রমলা বললেন,—এটা যে একেবারে সিসের আধুলি—একটু দেখেও নিতে পারো না?

ডাক্তার বললেন,—দু'টাকা ফী দিতে চেয়েছিল, শেষে দরদস্তুর করে সাড়ে তিনটাকা দিয়েছে।— ডাক্তার হেসে উঠে বললেন,—বাথরুমে জল আছে ত?

—হ্যাঁ, চান করে নাও—বেলা হ'য়েছে,—

*

সাবি বিকেলে যথাসময়ে কাজ করতে এল—

ডাক্তার প্রশ্ন করলেন,—তোর মা কেমন রে সাবি?

সাবি বলল,—মু কি জানছি, জরও ছাড়লেক নাই, বেথাটাও মরলেক নাই—

—একটুও কমেনি?

—না। মহিম জেঠা ত বলছে—ভাল লয়—

—তোর মহিম জেঠা ডাক্তার কিনা ?

সাবি বললে,—উ নাড়ী ধরতে জানছে বটে—উ যা বলবেক তা হবেকৃই—

—তোর মা হাসপাতালে আসতে চায়না কেন ?

—উ বলছে, মরবেকৃই এবার, হাসপাতালকে তাই আসবেক না।

—মরবে জানতে পেরেছে কেমন করে ?

—বলছে,—মু কি জানছি কেনে ?

ডাক্তার রমলাকে বললেন,—একটু চা স্টোভে করে দাও ত,—

—কোথায় যাবে ?

—ঘোড়ামারায়,—দেখি ওর মা ভাল হয়েছে কিনা।

—খামকা যাবে কেন ?

—কেস্‌টা নিয়ে একটা জিদ পড়েছে—ওকে বাঁচাতেই হবে। বাঁচতে ও চায় না,—ও বলছে মরবেই, দেখি বাঁচানো যায় কিনা ?

সাবি বললে,—তু যাবি ডাক্তার ?

—হ্যাঁ—আর একবার দেখে আসি—

ডাক্তার চা খেয়ে সাইকেলে উঠলেন। ঘোড়ামারায় যখন এসে পৌঁছলেন তখন বেশ বেলা আছে—নকুড় উঠানে বসে চুটি খাচ্ছে, সাবির ছেলেটা উঠানে খেলা করছে। ঘরের মাঝে বুড়ী সাবির-মা মাঝে মাঝে উঃ-আঃ করছে—

নকুড় ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে তাঁকে ঘরে নিয়ে গেল। ডাক্তার ভাল করে যন্ত্র দিয়ে দেখলেন,—চারলাখ পেনিসিলিন বিশেষ কার্য্যকরী হয়নি, তবে রোগ আর বাড়তে পারেনি। তিনি পুনরায় চারলাখ একটা ইন্‌জেকশন দিয়ে হার্টটা ভাল করে দেখলেন। হার্টে কোন দুর্ব্বলতা নেই—

বাইরে এসে নকুড়কে বললেন,—কাল সকাল পর্য্যন্ত অনেক ভাল হ'য়ে যাবে—ভাবনা নেই—

সংবাদ পেয়ে মহিম এসেছিল। সে বললে,—ভাল ত বলছিস্, ডাক্তার,—নাড়ীটো চম্ চম্ করছে কেনে !

ডাক্তার বললেন,—কাল সকালে আর চম্ চম্ করবে না। জ্বর আছে তাই চম্ চম্ করছে—

ডাক্তার সাইকেলে উঠলেন,—রোগী সম্বন্ধে কোন ভাবনা তাঁর নাই। সাবির মা জীবনকে কি করে তুচ্ছ করে যায় সেটা দেখবেন তিনি।

সন্ধ্যার পর কাঁকুড়গাছির দল এলেন।

ডাক্তার প্রথমটা ছিলেন না, একটু পরে এলেন।

মানুবাবু বললেন,—খুব ব্যস্ত, বহু কল ছিল বুঝি আজ? কাঁকুড়গাছির দশরথ ঘোষকেও দেখতে গিয়েছিলেন কেন?

—হ্যাঁ, ব্যস্ত,—তবে কলে নয়। দু'বার ঘোড়ামারা গেছি সাবির মাকে দেখতে এই—কিছুতেই হাসপাতালে আসবে না—ওষুধও খাবে না। ইন্‌জেকশন নেবে না—বলে, বাঁচবে না। কেমন বাঁচবে না তাই দেখবো! সামান্য নিউমোনিয়া—

পণ্ডিত প্রশ্ন করলেন,—রোগী বলছে বাঁচবে না—তবে তাকে বাঁচানো ত কঠিন—

—হ্যাঁ, রোগীর হতাশ ভাবটা ভাল নয়,—তবুও পেনিসিলিনের যুগ—দেখাই যাক্ না—

হেডমাস্টার বললেন,—বাঁচতে চায় না কেন?

ডাক্তার বললেন,—তার চোখ নেই, দাঁত নেই, দেহটা জারা-জারা হ'য়েছে—তবে আর বেঁচে কি হবে? কাজ যখন করতে পারবে না আর?

হেডমাস্টার বললেন,—ঠিকই,—ওরা কাজ করে—কর্ম্মহীন জীবন নিয়ে পরের ভার হ'য়ে বাঁচবে কেন? আর নখদন্তহীন হয়ে বেঁচেই বা তার লাভ কি?

ডাক্তার বললেন,—দশরথ ঘোষ বাঁচবার জন্যে কি উৎসুক! এখনও মামলা শেষ হয়নি, জমিজমা কয়েক বিঘা নিষ্কণ্টক হয়নি—

হেডমাস্টার বললেন,—ওরা কাজ করে। ওদের জীবনের কোন সঞ্চয় নেই তাই আকর্ষণও নেই,—আমাদের জীবনে সঞ্চয় আছে তাই আকর্ষণ আছে। মৃত্যুকে তাই আমরা ভয় করি, ওরা করে না—

ডাক্তার বললেন,—একটা অচল আধুলি দিয়েছে ওরা—

মানুবাবু বললেন,—অচল চালানোর এর চেয়ে ভাল জায়গা ত আর নেই। ঘোষেরা তা ভালভাবেই জানে—

—তা জানি, আর ডাকবে না তাও জানি। রোগের নামটা জেনে নিয়েছে, এখন গ্রামের কোয়াক্ নিবারণই পেনিসিলিন ঠুকবে।

হেডমাস্টার বললেন,—বেঁচেও যাবে—এখনও বহু ভোগান্তি ওর বাকী আছে হয়ত জীবনে।

মণ্টুবাবু বললেন,—আপনার হোমিওপ্যাথি চালালে খরচা হ'ত না—ঘোষেরা এইটুকু বুঝলে না।

প্রসঙ্গান্তরে কথা চলল। ডাক্তার বিমনাভাবে বসে রইলেন—

পরদিন সাবি আসতেই ডাক্তার প্রশ্ন করলেন,—তোর মা কেমন আছে?

সাবি বললে—জ্বরটা কমেছে বটে, বেথাটাও মরেছে—কিন্তু সাড় নাই কেনে? কথাটি বলছে না—নড়ছে না। বেঘোরে রইছে কেনে?

ডাক্তার বললেন,—অমন হয়। জ্বরটা ছাড়বে তাই দুর্ব্বল হয়েছে—

—মোর মনে ত ভাল লাগছে নাই!

—ও কিছু না। কিছু ভয় নেই—

—তু একবারটি যাবি না ডাক্তার?—অষুধ দিলি ত শেষটো দেখ কেনে?

ডাক্তার বললেন,—যাবো, হাসপাতালের পরে।

রমলার পরিহাস উপেক্ষা করে ডাক্তার হাসপাতালের পর ঘোড়ামারায় গেলেন। রোগীকে পরীক্ষা করে দেখলেন—বুক প্রায় পরিষ্কার হ'য়ে গেছে, সামান্য জ্বর তখনও আছে। তিনি আর-একটা পেনিসিলিন দিয়ে চাইতেই মহিম জিজ্ঞাসা করলো,—ভাল বটি ডাক্তারবাবু?

—হ্যাঁ, অনেক ভাল। বেদনা কমে গেছে, জ্বরও কম—

—সাড় নেই কেনে?

—দুর্ব্বল হ'য়েছে একটু, জ্বরটা ছাড়বে এক্ষুনি—

—নাড়ীটো দ্যাখ্ কেনে—মনে ত ভাল লয় না—

ডাক্তার নাড়ী দেখলেন—হার্টটা ভাল করে দেখলেন। হার্টটা যেন সামান্য বিকল। আবার দেখলেন—হার্টটা দুর্ব্বল হ'য়েছে—শব্দটা ঠিক যেমন হওয়া উচিত তেমন নয়।

তিনি প্রতিষেধক-রূপে কয়েক ফোঁটা কোরামিন খাইয়ে দিলেন এবং অন্যান্য দুই-একটি ওষুধ দিয়ে বেরিয়ে এলেন। মনে মনে তাঁর সন্দেহ হ'য়েছে—হঠাৎ হার্ট এমন দুর্ব্বল হওয়ার কারণ কি?

উঠানে সাইকেলে উঠবার সময় মহিম বললে,—মোর ত ওকে ভাল লাগছে নাই—উ রাত টিকবে নাই।

ডাক্তার ধমক দিলেন,—বাঁচবে না কেন? কি হয়েছে?

—হ,—ভগমান ত ডাক দিলেক ডাক্তার, তু কি করবি? বিনা পয়সায়

এলি, অষুধ দিলি—ভগমান তোর ভাল করবেক। মোরা গরীব, মোদের কিছুই নাই—সাবির কপাল ভাল বটি!

ডাক্তার বিরক্ত হয়ে সাইকেলে উঠলেন।

*

সাবি সেদিন সকাল-সকালই কাজ করতে এল। নিজেই বললে,—ডাক্তার, মনটি কেমন করছে বটে! সাড় নাই,—মহিম জেঠা বলছে, লাড়ীটা ছাড়ছে—তু যাবি না?

রমলা বিরক্ত হয়েছিলেন। সাবির আবদার ক্রমশঃ বাড়ছে, দু'বেলা দেখতে যেতে হবে। এ যেন তার দাবি।

সাবি বললে,—সকাল সকাল ফিরবেক, মোর কপালে কি রইছে বটে! তাড়াতাড়ি কাম করবেক—

সাবি ঝট্‌পট্ কাজ করে দিয়ে বেলা থাকতেই চলে গেল। ডাক্তার চা খাচ্ছিলেন; রমলা বললেন,—আবার ঘোড়ামারা যাবে নাকি? সাবির আবদার কত! দু'বেলা যেতে হবে দেখতে?

ডাক্তার বললেন,—ওরা ত ডাকতে সাহস পায়নি, আমিই ত স্বেচ্ছায় গিয়েছি। সহজ সরল ভাবে তাই মনের কথা বলেছে।

—এখন যাবে তা হ'লে?

—হ্যাঁ, বসেই ত আছি। ওবেলা সন্দেহ হ'ল,—মনে হয় হার্ট সিঙ্ক করবে। কিন্তু আশ্চর্য্য, এত করেও বাঁচাতে পারবো না? দুরারোগ্য রোগে মরলে দুঃখ নেই, সাধারণ কেস্—গোড়ায় ধরা পড়েছে—

ডাক্তার চা খেয়ে, বাছা-বাছা ইন্‌জেকশন পকেটে নিয়ে সাইকেলে উঠলেন।

পশ্চিমের সূর্য্য লাল হয়ে ভালকুড়ির মাথায় অস্ত যাচ্ছে। রক্তিম আকাশ অরণ্যের শ্যামলতাকে তাম্রাভ করে দিয়েছে—পাণ্ডুর প্রান্তর আরক্তিম হ'য়ে উঠেছে। পশ্চিমের হাওয়ায় ধুলো উঠে মাঝে মাঝে ঘূর্ণির সৃষ্টি হ'চ্ছে কাঁদোড়ের পাশে। ডাক্তারের সাইকেল জগৎপুরের ডাঙা থেকে গড় গড় করে নামছে নীচুতে—তিনি চুপ করে বসে আছেন—

বনের পাশ দিয়ে পায়ে-চলা পথ ধরে তিনি ঘোড়ামারায় চললেন। শালিক ঘুঘু নির্জ্জন রাস্তা থেকে উড়ে পালালো তাঁর সাইকেলের সন্ সন্ শব্দে। সেয়াকুল পেকে রয়েছে রক্তলাল হ'য়ে পথের পাশে—টুনটুনি ঠুকরে খেতে চেষ্টা করছে—

ডাক্তার সাবির উঠানের প্রান্তে অশ্বত্থগাছে সাইকেল রেখে চেয়ে দেখলেন,—লোক-সমাগম হ'য়েছে—হয়ত রোগীর অবস্থা ভাল নয়।

সাবি নিঃশব্দে তাকে ঘরে নিয়ে গেল,—ঘরের কোণে প্রদীপ জ্বলছে। মহিম পিছন পিছন ঘরে ঢুকলো। নকুড় বসে রইল দাওয়ায়—

মহিম বলল,—নাড়ীটা ছাড়তে লেগেছে মন্‌কে লয়—

ডাক্তার নাড়ী দেখলেন। স্পন্দন অনিয়মিত—হার্টে স্টেথিস্কোপ বসিয়ে দেখলেন—হার্ট ধীরে ধীরে সিঙ্ক করছে যেন। বুক পরিষ্কার হ'য়ে গেছে—জ্বর নেই। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে—

তিনি তাড়াতাড়ি কোরামিন ইন্‌জেক্‌শন তৈরি করে ইন্‌জেকশন করলেন। নাড়ী সতেজ হ'ল,—হার্ট চলতে লাগল লুব-ডুব—লুব-ডুব—

সাবি মায়ের পাশে বসে আছে নিঃশব্দে—পাথরের মত। মহিম নাড়ী দেখল একবার—হাতখানা নিঃশব্দে রেখে দিল। ডাক্তার তার মুখের দিকে চাইলেন। মহিম বললে,—হ, অষুধটার তেজ বটে! কিন্তু ধাত লাই—ওয়া থাক্‌বেক লাই—

সাবির মা হঠাৎ চোখ মেলে চাইল। ঘরের মাঝে সাবিকে দেখলে, মহিমকে দেখলে—তার পরে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল। ধীরে ধীরে বললে,—হ, ডাক্তার, খুব করলেক বটে!

ডাক্তার বললেন,—কেমন মনে হচ্ছে?

সাবির মা দন্তহীন মুখে একটু হাসল। তার পর ধীরে ধীরে বললে,—হ অষুধ ত প্রাণটো দিবেক লাই—ওয়াতে কি হবেক?

—কিছু না। ভাল হয়ে যাবে—

সে আবার হাসল। বললে,—জারা-জারা দেহটোকে খোঁচাখুঁচি করছিস্ কেনে ডাক্তার? ওয়াকে ছেড়ে দে কেনে? আবার আসবেক,—ধান পুঁতবেক, জঙ্গলে পাতা ভাঙ্গবেক, কাঁকুড়গাছি হাট্‌কে যাবেক—এ দেহটো কোন কাজকে লাগবে বল কেনে?

সাবির মা চোখ বুজল—ক্লান্তিবশতঃ। এই কয়েকটা কথা বলতেই যেন তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেছে। সাবি ডাকলে,—মা, মা রে—তু কথা বল কেনে—

সাবির মা কথা বলল না—গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস থেকে থেকে যেন নিল।

ডাক্তার তাড়াতাড়ি হাত ধরে নাড়ী পরীক্ষা করলেন,—অনিয়মিত স্পন্দন মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে।

ডাক্তার তাড়াতাড়ি আর-একটা ইন্‌জেকশন তৈরি করলেন। মহিম নাড়ীটা দেখে হাতখানা আস্তে আস্তে বিছানার প্রান্তে রেখে দিল।

ডাক্তার ইন্‌জেকশন করলেন। সিরিঞ্জের নিডিল তুলে নিয়ে তাকে বাক্সে ভরলেন। পুনরায় নাড়ীটা ধরে বসলেন। স্পন্দন স্তিমিত হয়ে এসেছে,—বেগবান নাড়ী মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে—

ডাক্তার চেয়ে রইলেন সাবির মায়ের মুখের দিকে।

মুখের মাঝে ফেনা সঞ্চিত হয়েছে, নাকের মধ্যে একটা তরল পদার্থ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা জন্মাচ্ছে—নাড়ীটা স্পন্দিত হচ্ছে অতি মন্থরগতিতে—থেকে থেকে—

হঠাৎ নাড়ীটা থেমে গেল—ছুপ্ ছুপ্ ক'রে—চিরতরে নিশ্চল হ'য়ে গেল।

ডাক্তার হাতখানা বুকের উপর ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মহিম হেঁকে ভগবানের নাম শোনালো—উঠোনের লোকগুলো হরিধ্বনি দিয়ে উঠল মহিমের কণ্ঠকে অনুসরণ করে।

সাবি কেঁদে উঠল,—মা রে, তু কোথাকে গেলি রে! মাটি আমার লাইরে—ও মা—কোথাকে গেলি— সাবি আছড়ে পড়ল মায়ের বুকের উপর।

ডাক্তার ওষুধ ও সিরিঞ্জের বাক্স পকেটে পুরে অশ্বত্থতলায় সাইকেলের কাছে এসে দাঁড়ালেন। চারিপাশে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে—গৃহপ্রাঙ্গণ অরণ্য আকাশ ঘনান্ধকারে অবলুপ্ত। ডাক্তারের চোখদুটো ঝাপসা হয়ে এসেছে অশ্রুর প্রলেপে—তিনি ক্ষণিক দাঁড়িয়ে রইলেন নির্ব্বাক হয়ে।

সাবি কাঁদছে তারস্বরে—মা কোথা গেলি রে!···

*

চারিপাশে গভীর অন্ধকার। চোখ ভ'রে বার বার জল আসছে ডাক্তারের—পথ দেখতে পাচ্ছেন না। একটু থেমে, চোখ মুছে অন্ধকারের মাঝে অস্পষ্ট সাদা রেখায় পায়ে-চলা পথটা দেখতে পেলেন—সাইকেলে চড়তে সাহস হ'ল না—ঠেলে ঠেলে এগুতে লাগলেন জগৎপুরের ডাঙার দিকে।

ভালকুড়ির পাশের ঘন বনশ্রেণীর পাশ দিয়ে রাস্তাটি এসে পড়েছে জগৎপুরের রাস্তায়। আকাশের গায়ে ঘনকৃষ্ণ কালো ভালকুড়ি আর তার অরণ্য স্তব্ধ ও সংকুচিত হ'য়ে রয়েছে। নিঃশব্দ—নির্জ্জন—মৃতের মত জড়—

পাখীর শব্দ নেই, শ্বাপদের পথ-চলার শব্দ নেই, ঝিঁঝি-পোকার ডাক নেই—ডাক্তারের পায়ের শব্দ আর সাইকেলের চাকার খসখস শব্দ বনের স্তব্ধ

আত্মাকে যেন সচকিত করে দিচ্ছে বার বার। গভীর নির্জ্জনতার মাঝে নিজের পায়ের শব্দেই নিজের ভয় হয়—পিছনে সাবি কাঁদছে।

ডাক্তার ভাবছিলেন—তিনি ডাক্তার, কত রোগী তার হাতে মরেছে, কত রোগী হাসপাতালে মরতে দেখেছেন,—আজ তাঁর চোখদুটি কেন বার বার অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠছে? সাবির মা তার কেউ নয়—সাবির মা মৃত্যুকে জয় করে গেছে, সেই সঙ্গে তাঁকে নিঃশেষে পরাজিত করে গেছে। তাঁর ডাক্তারী জীবনে এমন পরাজয় ঘটেনি কখনও—এই পরাজয়ের কলঙ্ক-টিকা দিয়ে সে চলে গেছে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে—

ক্ষোভে দুঃখে পরাজয়ে ডাক্তারের চোখে জল আসছিল—সমস্ত বিদ্যা শক্তি দিয়েও তিনি অমোঘ মৃত্যুকে প্রতিহত করতে পারলেন না—দেহে সাড় নেই, এই কথাটাই সত্য হ'ল? এত ওষুধ, এত শ্রম—এর কোন মূল্য নেই—

ও বলে গেল,—ও আবার ঘুরে আসবে, ভালকুড়িতে পাতা ভাঙবে, কাঁকুড়গাছির হাটে যাবে। মৃত্যুকে ওরা চিনেছে জীবনের প্রভাত-রূপে,—ওরা জীর্ণ দেহকে ত্যাগ করতে চায় নতুন দেহের আশায়—এই বিশ্বাস নিয়ে ওরা হাসিমুখে মরে—

ডাক্তারের চোখ আবার ঝাপসা হয়ে আসে। এতবড় পরাজয় তাঁর জীবনে ঘটেনি—ঘোড়ামারার নির্জ্জন গৃহকোণে আজ সাশ্রুনেত্রে স্বীকার করতে হয়েছে তাঁর পরাজয়!

ওরা তৈরি করেছে হাসপাতালের ইমারত, কিন্তু ওরা আশ্রয় পায়নি সেখানে—প্রয়োজনও হয়নি।

ডাক্তার দেখলেন তিনি জগৎপুরের রাস্তায় এসে পৌঁছেচেন—এখন সাইকেলে উঠা যাবে—আকাশে অগণ্য তারা, মাঠের মাঝে পথটিকে সাদা রেখায় প্রতিভাত করেছে—

তিনি পিছন দিকে চাইলেন—

আকাশের কোলে স্তিমিত ভালকুড়ির শীর্ষদেশ ঘন কালিমার মত আঁকা—তার পাশে ঘন বনশ্রেণী নিবিড় কালো রেখায় আলোকোজ্জ্বল আকাশের দিকে চেয়ে আছে। স্তব্ধ—নিঃশব্দ—নির্জ্জন।

ওই কালিমার তলদেশে তিনি দেখেছেন জীবনের খেলা—প্রেম-বিরহ, দ্বন্দ, মিলন। পাখী, শ্বাপদ, জন্তু-জানোয়ার, নরনারী ওই অন্ধকারে এসে ভীড় করে, চলে যায় আবার। বন্দুক কোলের উপর রেখে অরণ্যের এই মহাকাব্যের রস তিনি ভোগ করেছেন দিনের পর দিন। মাঝে মাঝে তাঁর

বন্দুক গর্জ্জন ক'রে অরণ্যভূমিকে কম্পিত করে দিয়েছে—তার পর আবার চলেছে সেই নিঃশব্দ জীবনস্রোত—

সাবি ওখানে বলেছিল,—তিনি মনিব, তাঁর কথা সে মানবে, কিন্তু ঘরে রয়েছে তার জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মত স্ত্রী—তার কি হবে? লোকে তাঁকে নিন্দা করবে···সাধু একদিন কেঁদেছিল এই বনের গহনে—সাবিও চোখের জল মুছেছিল—

একদিন সাবি, সাধু, তিনি, রমলা সকলেই যাবেন—সাবির মা'র মত। হাহাকার করে উঠবে তারাই, যারা পড়ে থাকবে পিছনে।

সাবির মা নিঃশেষে পরাজিত করে দিয়ে গেছে তাঁকে—তাঁর বিদ্যাকে, তাঁর বৈজ্ঞানিক ওষুধপত্রকে—মৃত্যুকে জয় করে চলে গেছে—হয়ত ওই অগণিত তারার মাঝে! হয়ত আর কোথায়ও···

একটা পাখী অদূরে—টিউ-টিউ করে উঠলো—পাহাড়ের টিলার উপর থেকে।

ডাক্তার চম্‌কে উঠলেন—

একবার ফিরে তাকালেন ঘোড়ামারার দিকে—একটা প্রদীপের আলো দেখা যায়। সাবি তারস্বরে কাঁদছে—মা রে, তু কোথা গেলি রে! মোর যে কেউ আর নেই রে—

ডাক্তার সাইকেলে উঠে জোর প্যাডেল করলেন—চড়াই উঠতে হবে জগৎপুরের ডাঙায় যেতে—

ডাক্তার নিঃশব্দে সাইকেল রেখে, হাত-পা ধুয়ে বারান্দার চেয়ারে বসলেন। রমলা বললো,—রাত হ'ল যে—

—হ্যাঁ, অন্ধকারে সাইকেলে আর উঠলাম না—

—রমলা চা এনে দিলেন—ডাক্তার নিঃশব্দে চা খেতে লাগলেন।

রমলা বললেন,—কি হ'ল? অমন দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছে?

ডাক্তার বিমনাভাবে বললেন, —কিছু না—

—কি বল না? এমন ত দেখিনা কোনদিন—

—সাবির মা মরে গেল—

—হঠাৎ?

—হ্যাঁ হার্ট সিঙ্ক করলো, কিছুতেই রোধ করা গেল না—

—তাতে তোমার দুঃখ কি?

—আমি ডাক্তার,—কত রোগী মরে, দুঃখের আবার কি আছে—তবে, হারিয়ে দিয়ে গেল তাই—

মধু এসে খবর দিল—কাঁকুড়গাছির দল এসেছে অনেকক্ষণ।

ডাক্তার—উঠলেন।

আফিস-ঘরে আড্ডা চলছিল। ডাক্তার এসে ঝুপ্ করে তাঁর চেয়ারটায় বসে পড়লেন। পণ্ডিতমশায় বলছিলেন মানুবাবুকে,—"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুব জন্ম মৃতস্য চ—তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি"। কিন্তু আশ্চর্য্য কি জানেন মানুবাবু—এ কথা সকলেই জানি, তথাপি সামান্য স্বার্থ নিয়ে মনোবেদনার অন্ত নেই। কাল চলে যাব জেনেও, অন্যের মনে বেদনা দি',—মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও সে-কথা ভাবতে শিউরে উঠি। একেই বলে মোহ—মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতা—

হেডমাস্টার ডাক্তারের ম্লানমুখের দিকে চেয়ে বললেন,—কি হয়েছে ডাক্তারবাবু? মনটা যেন বিক্ষিপ্ত—ভাল নেই—

ডাক্তারের চোখদুটো হঠাৎ চিক্‌চিক্ করে উঠলো জলে। তিনি বললেন,—কিছু না, সাবির মা মারা গেছে—কিছুতেই বাঁচাতে পারলাম না—

—তাতে দুঃখ কি? সব রোগীই কি বাঁচে?

ডাক্তার সংক্ষেপে বললেন,—জানি। আমি ডাক্তার—বহু রুগী মরে আমাদের হাতে,—বহু মরেছে, মরবে—

ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে সকলে চুপ করে গেলেন—তিনি আজ সত্যই অত্যন্ত বিচলিত।

পণ্ডিতমশায় বললেন,—ডাক্তারবাবু, আপনি যেন তবুও খুব বিচলিত হয়েছেন মনে হচ্ছে—

ডাক্তারের চোখদুটো আবার যেন জলে ভরে উঠল,—তিনি থেমে থেমে সংযতভাবে বললেন,—সাবির মা মরেছে,—আমার কেউ নয়, কিন্তু ওরা রোগ-ব্যাধি, লোভ-মোহকে জয় করেছিল কাজ দিয়ে—কিন্তু আজ সে-বুড়ী যে মৃত্যুকে জয় করে চলে গেল, আর সেই সঙ্গে আমাকে নিঃশেষে পরাজিত করে দিয়ে গেছে—

ডাক্তার আবার বললেন,—বলেছিলাম বাঁচাবই, কিন্তু পারিনি। তাই মনটায় পরাজয়ের গ্লানি জমে উঠেছে। জারা-জারা দেহটাকে খোঁচাতে সে বারণ করলে; বললে,—সে আবার নতুন দেহ নিয়ে এসে ধান পুঁতবে, পাতা ভাঙবে, কাঁকুড়গাছির হাটে আসবে—

পণ্ডিতমশায় বললেন,—সে ত আনন্দের কথা, ওরা মৃত্যুকে জয় করেছে সংস্কার দিয়ে—শিক্ষা দিয়ে নয়,—জীবনকে জয় করেছে কর্ম্ম দিয়ে, আরাম দিয়ে ব্যাধিগ্রস্ত করেনি—ওরা ত ভাগ্যবান। আপনি দুঃখ করছেন কেন?

ডাক্তার চুপ করে বসে রইলেন—চোখ দিয়ে তাঁর জল গড়িয়ে পড়ল দু'ফোঁটা। সকলে নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন সেইদিকে। ডাক্তার ক্লান্ত ভিজা কণ্ঠে বললেন,—আমরা নিঃশেষে পরাজিত হ'য়েছি, মানুবাবু! দশরথ ঘোষ কি বেঁচে আছে?

মানুবাবু বললেন,—না, মরবার আগে তার কি আকুতি, কি কান্না—দেখলে চোখ ফেটে জল আসে। ছেলেপুলে, জমিজমা ছেড়ে যেন প্রাণটা কিছুতেই যেতে চায় না। কি অসহায় চাহনি—

ডাক্তার সাশ্রুনেত্রে চুপ করলেন—দূরের অন্ধকারের পানে চেয়ে কি যেন ভেবে চললেন আপন মনে।

কাঁকুড়গাছির দল একপায়ে দুইপায়ে বেরিয়ে পড়লেন হাসপাতাল থেকে।

পণ্ডিতমশায় আপন মনে বললেন,—মা করুণাময়ী!

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

ঃ ওরা কাজ করে ঃ

উদ্ধত বিজ্ঞান-যুগে শহর শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে তরতর করে। সিমেণ্ট পীচে তৈরী হ'চ্ছে শহর, ঝরঝরে তকৃতকে—সেখানে ধরণীর ধূলিকণার লেশমাত্র নেই। সেখানে বাস করে সভ্য মানুষ—আরামে, আনন্দে, বিলাসব্যসনে দিন কাটায়। পায়ে লাগে না ধূলো, গায়ে লাগে না ঝড় বৃষ্টি রোদ। ওরা সভ্য—

আর একদল লোক বাস করে পাহাড়ে, গ্রামে—ধুলোকাদা মাখে, ঝড়বৃষ্টি রোদে ওরা কাজ করে নগরে প্রান্তরে। ওরা অসভ্য কুলিমজুর।

লেখক নিবীড়ভাবে অনুভব করেছেন এদের জীবনধারা ;—আধুনিক সভ্যসমাজ আজ সভ্যতার পরিচ্ছদে কোথায় এসেছে, সেখানের জীবনের সত্য ধর্ম্ম এবং অর্থ কোথায় তা পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

সাহিত্যিক

আধুনিক-যুগ সভ্যতা, অগ্রগতি আর দ্রুতগতির যুগ। আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষই সৃষ্টি করেছে এই যুগ-সভ্যতা মহান্ মানবত্বের আদর্শবোধে। সমাজ-জীবনে, ব্যক্তি-জীবনে বিবর্ত্তন এনেছে, সংস্কার করেছে জীর্ণ পুরাতন সমাজের ধর্ম্ম ও নীতি। কিন্তু আজকের মানুষ এই সভ্যতার অন্তরালে আর স্বার্থপরতার প্রভাবে ব্যাহত করেছে এই তথাকথিত অগ্রগতির পথ, পরন্তু সৃষ্টি করেছে সভ্যতার নামান্তরে হীন আত্মকেন্দ্রিকতা, হারিয়ে ফেলেছে মানবত্বের সংবেদনশীল স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্মপ্রকাশ।

এই বিবর্ত্তনের প্রভাবে মানব সমাজে কী অনুপ্রবেশ করলো আর কতখানি বঞ্চিত হল সেই পটভূমিকায় প্রবীণ সাহিত্যিকের তথ্যপূর্ণ এই "সাহিত্যিক" উপন্যাসটি পাঠক-সাধারণের মনে অভিনব চিন্তা আলোকপাত করেছে।